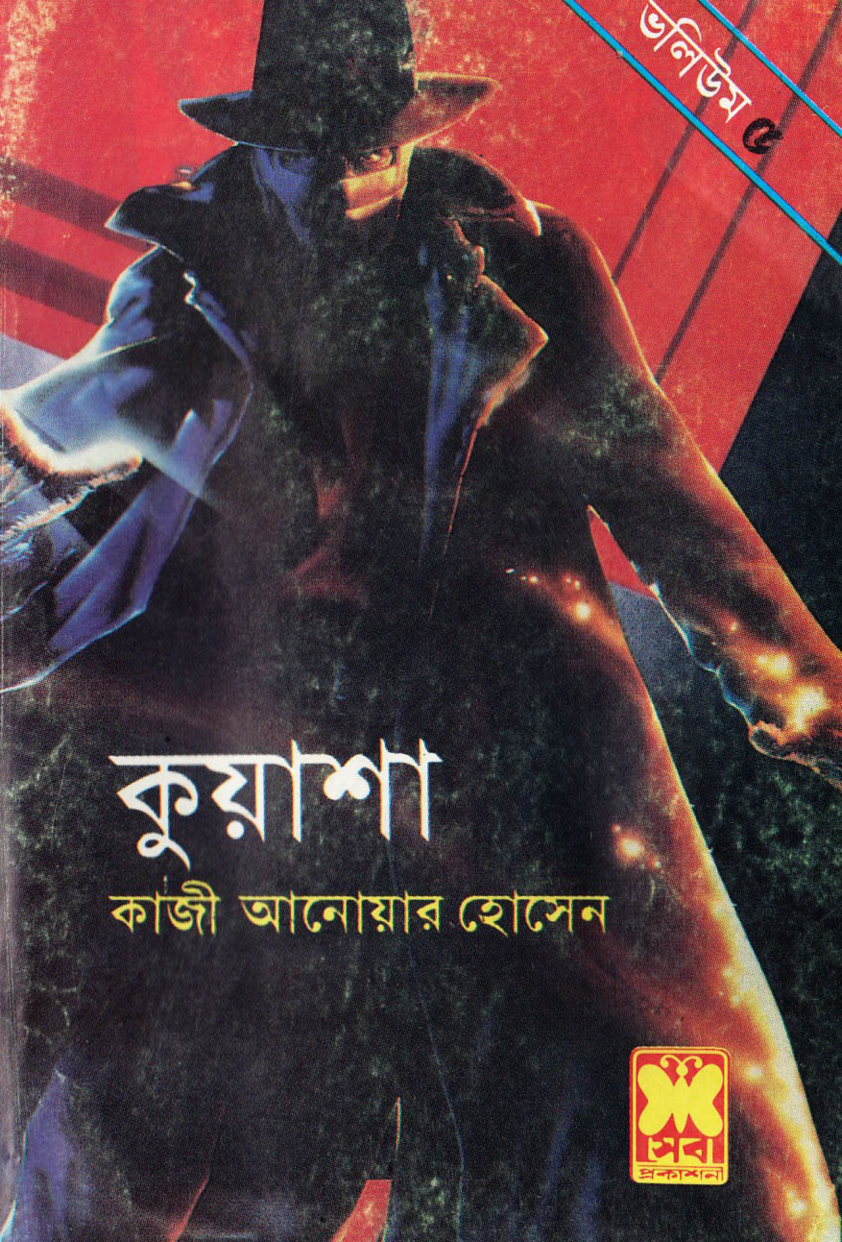
ভলিউম ৫
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-1095-7
প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৯২
প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ
মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২
শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-5
KUASHA SERIES: 13, 14, 15
By: Qazi Anwar Husain

কুয়াশা ১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

এক

চোত্-বোশেখের মাস। বেলা আন্দাজ দুটো। পুলিস কনস্টেবল হিকমত খান বাড়ি ফিরছিল ছাতা মাথায় ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে এবার ঢাকায়। অসহ্য গরম সইতে না পেরে দু'একজন লোক প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে, খবরের কাগজে দেখা যায়।

হিকমত খান ছাতা মাথায় হাঁটছিল। ছাতা থাকলে হবে কি, রোদের প্রখর ঝাঁঝ শরীরকে যেন ঝলসে দিতে চাইছে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। কাজকর্ম থাক্লেও সহজে মানুষ ঘর ছেড়ে বের হবে না এমন দিনে। একটা কুকুর-বিড়ালেরও দেখা পাওয়া ভার। শুধু মাঝে মাঝে এক আধটা রিক্সা বা মোটর গাড়ি দুপুরের নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো পাশ কাটিয়ে।

হিকমত খানের সর্বশরীর ঘামে ভিজে গেছে। তেষ্টা পাচ্ছে ভীষণ। এদিক-ওদিক তাকালো সে, রাস্তার আশপাশে কোনো হোটেলের সন্ধানে। কিন্তু এদিকটায় হোটেল নেই তেমন, যেখানে এক গ্লাস পানি খাওয়া যেতে পারে। বড় একটা অভিজাত হোটেল আছে বটে। হোটেল আফলাতুন। কিন্তু হোটেলটা তিনতলা এবং শুধু পানি পান করার জন্যে উপস্থিত হওয়া নিঃসন্দেহে অসঙ্গত।

কাছাকাছিই এসে পড়েছিল হিকমত খান। হোটেলটার সামনেই কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। প্রাইভেট গাড়ি। গাড়িগুলোর বিশ-পঁচিশ গজ দূরে একটা ডাস্টবিন দেখতে পেলো হিকমত খান। হোটেলের বয়-বেয়ারারা উচ্ছিষ্ট খাদ্য ফেলে গেছে একরাশ। যেমন ফেলে গেছে ঠিক তেমনি আছে। একটা কুকুর বা একটা কাকও কাছ ঘেঁষেনি। হিকমত খান দেখতে পেলো বেশ খানিকটা দূর থেকে একটা কুকুর ছায়ায় বসে ডাস্টবিনটার দিকেই তাকিয়ে আছে। কিন্তু ছায়া ছেড়ে রোদের অসহ্য উত্তাপকে মেনে নিতে পারবে না বলে কুকুরটা অভুক্ত থাকবে স্থির করেছে। সত্যি, দাবানল জ্বলছে যেন চারদিকে!

এক গ্লাস পানি পাওয়া দুষ্কর ভেবে হিকমত খান বাড়ি ফিরে তৃষ্ণা নিবারণ করবে ঠিক করলো। মনস্থির করে আরো দ্রুতগতিতে হাঁটতে যাচ্ছিলো সে, এমন সময় হোটেলের সামনে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠে থমকে দাঁড়াতে হলো।

পাশাপাশি অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটায়। নানারকম বিদেশী কোম্পানির গাড়ি। হিকমত খান পলকের জন্যে দেখতে পেলো, একটা ওপেল রেকর্ড এবং একটা টয়োটা করোনার মধ্যবর্তী ফাঁকটা থেকে একজন ইউরোপিয়ান মানুষ পলকের জন্যে উঁকি মেরে চারপাশটা দেখে নিলো। বিদেশী লোকটা মাথা তুলেই হিকমত খানকে দেখতে পেয়েছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে আবার লুকিয়ে পড়ার জন্যে টুপ করে যথাস্থানে বসে পড়েছে।

তিন সেকেণ্ড অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হিকমত খান। তারপর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দ্রুত পা ফেলে এগোতে লাগলো গাড়িগুলোর দিকে।

পাঁচ কদম এগোবার পরই আবার থমকে দাঁড়াতে হলো হিকমত খানকে। ইউরোপিয়ান লোকটা হঠাৎ তড়াক করে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কায়েদ-এ-আযম কলেজের দিকে দৌড়ুতে শুরু করলো প্রাণপণে।

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল হিকমত খান। তারপরই সে ছুটতে শুরু করলো ইউরোপিয়ানটার পিছু পিছু। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই হিকমত খান তাকালো ওপেল রেকর্ড এবং টয়োটার মধ্যবর্তী জায়গাটায়। তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। গাড়ি দুটোর মাঝখানে দেখা গেল একটা লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বুকে তার আমূল বিদ্ধ একটি ছোরা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোকটার আশপাশ। নিহত লোকটাও যে ইউরোপিয়ান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘটনার আকস্মিকতায় নার্ভাস হয়ে পড়লো না হিকমত খান। পঁচিশ বছর চাকরি করছে সে পুলিস বিভাগে। ঘটনাটার গুরুত্ব সে ঠিকই অনুধাবন করতে পারলো। ফলে হাতের ছাতাটা ফেলে দিয়ে প্রাণপণে আততায়ীর পিছু ধাওয়া করলো সে। কিন্তু নিরাশার কথা হলো ইউরোপিয়ানটা তখন বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। প্রায় নির্জন রাস্তা। কেউ বাধা দেবারও নেই। প্রায় যুবকই বলতে হবে ইউরোপিয়ানটাকে। তাছাড়া তার দৌড় দেবার ভঙ্গি এবং গতি দেখে মনে না হয়ে যায় না যে লোকটা একজন ওস্তাদ রানার। তা সত্ত্বেও কনস্টেবল হিকমত খান বুটজুতোর উচ্চকিত শব্দ তুলে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে বিদেশীটাকে পাকড়াও করার জন্যে।

হিকমত খান স্থির-প্রতিজ্ঞ যে, আততায়ীকে সে ধরবেই। কায়েদ-এ-আযম কলেজকে বাঁয়ে রেখে মোড় ঘুরছে যখন সে, তখন বিদেশীটা মাত্র বিশ গজ এগিয়ে আছে। ঠিক এমনি সময় পিছন থেকে একটা গাড়ির যান্ত্রিক শব্দ পাওয়া গেল।

তীব্র বেগে একটা নতুন চকচকে কালো ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেড রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটে আসছে। শব্দ পেয়ে মাঝ রাস্তা ছেড়ে একপাশে সরে এসে দৌড়ুতে লাগলো হিকমত খান। পরক্ষণেই গাড়িটা সাঁ করে ছুটে গেল হিকমত খানের প্রায় গা ঘেঁষেই। মাঝ রাস্তা থেকে সরে আসতে যদি মুহূর্ত মাত্র

বিলম্ব ঘটতো তবে নির্ঘাৎ চাপা পড়তো সে। ড্রাইভারের বেপরোয়া মতিগতি দেখে মুখ খারাপ করে একটা পুলিসি গাল দিয়ে কটমট করে চাইলো হিকমত খান, এমন সময় সে দেখলো গাড়িটা পলায়নরত ইউরোপিয়ানটার কাছে গিয়েই আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় খুলে গেল গাড়িটার দরজা। পলায়নরত ইউরোপিয়ানটা মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করে উঠে পড়লো গাড়িতে। হিকমত খান তখন গাড়িটার দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ব্যর্থতাই বরণ করে নিতে হলো তাকে। আরও দু'পা এগোতে না এগোতে গাড়ির দরজা জোরালো শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ছুটতে শুরু করলো প্রায় লাফ দিয়ে, বেপরোয়া গতিতে।

পুলিস কনস্টেবল হিকমত খান ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে পড়লো স্থাণুবৎ। হাঁপাতে লাগলো সে জোরে জোরে। দেখতে না দেখতে চোখের আড়াল হয়ে গেল ফোক্স-ওয়াগেন। ততক্ষণ এ-দোকান ও-দোকান থেকে কিছু কিছু লোক নেমে দাঁড়িয়েছে রাস্তার উপর।

অযথা সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে হিকমত খান সামনের একটা ডাক্তারখানা থেকে পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানালো সম্পূর্ণ ঘটনাটা। তারপর বড়কর্তার আদেশ অনুযায়ী হোটেল আফলাতুনের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো আবার।

ফেলে যাওয়া ছাতাটা রাস্তার মাঝখানে ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। তুলে নিলো সেটা হিকমত খান। দ্রুত পায়ে এগোলো হোটেলের পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে।

কিন্তু কই! কোথায়! কোথায় গেল লাশটা? গাড়ি দুটোর মাঝখানে ছোরা বিদ্ধ লাশটার চিহ্নমাত্র নেই! ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটা। কালো পিচের উপর শুধু খানিকটা জমাট বাঁধা রক্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে ঘটনাটার। হিকমত খান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

দুই

ঢং ঢং!

গভীর, নিস্তব্ধ রাত। আকাশে চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে। লিয়াকত অ্যাভিনিউয়ের কাছাকাছি একটা গির্জা থেকে এইমাত্র রাত দুটো বাজার সময় সঙ্কেত শোনা গেল।

চারদিকে নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বুড়িগঙ্গার বুকে একটা লঞ্চের ভটভট শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। এখন আর তাও শোনা যাচ্ছে না। শুধুই নিস্তব্ধতা চারদিকে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। নিস্তব্ধতা আর নির্জনতা।

'ঘেউ ঘেউ! ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ...'

আচমকা চারপাশের নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়েখুঁড়ে শান্তিময় পরিবেশটাকে বীভৎস করে তুললো একটা কুকুর। ঘেউ ঘেউ! ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ...। ভয়ার্ত, বিস্মিত, পরাজিত কণ্ঠে ডেকে উঠলো কুকুরটা। ডেকে উঠলো এবং প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছন হটতে লাগলো এক পা দু'পা করে। উত্তেজিত, সাবধানী কণ্ঠে চারদিক সচকিত করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলো কর্তব্যপরায়ণ জানোয়ারটা। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিলো না।

পিছন হটছে কুকুরটা। উত্তেজনায় কাঁপছে। রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে গেল কাঁপতে কাঁপতে। সমানে ককিয়ে চলেছে সে এখনও সামনের একটা লাইটপোস্টের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অদ্ভুত একটা ভয়াল জানোয়ারকে হেঁটে যেতে দেখতে পাচ্ছে সে।

মূর্তিমান বিভীষিকা একটা! হেঁটে যাচ্ছে গম্ভীর চালে। কোনদিকে যেন তাকাবার ফুরসত নেই তার। হুবহু একজন মানুষের আকৃতি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সেটা রাস্তার উপর দিয়ে। গড়নে ঠিক একজন মানুষের সমান হবে। টেনিসবলের মতো বড় বড় টকটকে লাল দুটো চোখ ঠিক কপালের দু'পাশে বসানো। জ্বলছে। মাথাটা হুবহু একজন মানুষেরই মতো। কখনো চাঁদের, কখনো লাইটপোস্টের আলো পড়ে চকচক করছে মাথাটা। ইস্পাতের চেয়েও শক্ত এবং ট্রিট রেডের মতো রঙ নেড়া মাথাটার। সমস্ত শরীরটার রঙই ঐ রকম। শরীরের যে অংশেই আলো পড়ছে সেই অংশটাই চকচক করে উঠছে আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে। হাত দুটো গড়ন অনুযায়ী একজন মানুষের চেয়ে দু'গুণ মোটা। দুটো হাতই ঝুলে রয়েছে দু'পাশে। একটা হাত খালি, অপর হাতে একটা বিদঘুটে যন্ত্র। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে লৌহমানব। স্বাভাবিক মানুষের মতো হাঁটছে না সে। হাঁটু দুটো তার ভাঁজ হচ্ছে না পা ফেলবার সময়।

নিঃশব্দ পায়ে নবাবপুর রোডের দিকে হেঁটে যাচ্ছে লৌহমানব। নির্জন ফাঁকা রাস্তা। ভীত কুকুরটা এখনও ডাকছে দূরে সরে গিয়ে। ভয় পেয়েছে জানোয়ারটা। জীবনে এরকম বিদঘুটে জীব সে আর দেখেনি। তার চোদ্দপুরুষও শোনেনি এরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা!

ছায়ায় হারিয়ে গেল লৌহমানব। এরকম প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে। আবার আলোয় এসে পড়াতে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। নিঃশব্দ, দ্রুত, লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে সে ক্রমশ। নবাবপুর রোডে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে সে। এমন সময় দু'জন টহলধারী পুলিস টহল দিতে দিতে একটা সরু গলি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

পুলিস দুজন বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই লৌহমানবকে চোখের সামনে দেখে দুরুদুরু বুকে পিছিয়ে গেল দু'পা। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল দু'জন।

পুরোপুরি ইস্পাতের তৈরি একটা অদ্ভুত যন্ত্র-মানব হেঁটে যাচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো লৌহমানব পুলিস দু'জনের দিকে। কিছু বললো না। আবার ঘাড় সোজা করে হেঁটে যেতে লাগলো নিজ পথে গম্ভীর চালে। এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন। একটা অদ্ভুত গল্প। একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

বেশ ক'পা এগিয়ে গেল লৌহমানব। এমন সময় একজন কনস্টেবল সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু অপরজন বাধা দিলো তাকে। কাঁপা একটা হাতে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে অসম্ভব কাঁপা কাঁপা পায়ে ছুটলো সে লৌহমানবের দিকে। অন্য হাতে সে পলায়ন-ইচ্ছু সঙ্গীটার পিঠের জামার একটা অংশ খামচে ধরে রাখলো সাহস সঞ্চয়ের জন্যে।

ঠকঠক করে কাঁপছে লোকটার পা দুটো। দু'হাঁটুতে ঠকাঠক বাড়ি লাগছে সশব্দে। অপর সঙ্গীটি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার পালাবার প্রয়াস দেখলে বোঝা যায় মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে ভীষণভাবে। কিন্তু ছাড়া পাচ্ছে না সে কিছুতেই।

উঁচিয়ে ধরা লাঠিটা নিয়ে লৌহমানবের ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটি। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে লাঠিটা সজোরে বসিয়ে দিলো সে লৌহমানবের ঠিক ঘাড়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল পুলিসি ডাণ্ডাটা। লৌহমানব আরও একবার পিছন ফিরে তাকালো শুধু। প্রাণ নিয়ে পলায়নরত পুলিস দু'জনকে দেখে নিয়ে আবার সে হেঁটে চললো। গন্তব্যস্থান আর বেশি দূরে নয় তার। এই নবাবপুর রোডেরই একটি হোটেলে ঢুকবে সে।

গভীর রাত। দুটো বেজে পনেরো মিনিট।

বুড়িগঙ্গার বুকে নোঙর করা একটা বড়সড় লঞ্চ দাঁড়িয়ে রয়েছে। লঞ্চটার দ্বিতলস্থ একটা কেবিনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত দেখা গেল একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধক কুয়াশাকে।

কুয়াশার স্ব-আবিষ্কৃত লঞ্চটা দেখতে সাধারণ একটা লঞ্চের চেয়ে কোনো অংশে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। কিন্তু দেখতে যাই হোক, ভিতরে এর এলাহি কাণ্ডের সমাবেশ। নিউক্লিয়ার জেনারেটর-এ চলে এটা। সুপার সাবমেরিন স্টকে আছে এর লিকুইড হাইড্রোজেন ব্যাটারি এবং প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন। অনির্দিষ্টকাল গভীরতম জলদেশে অবস্থানে সক্ষম এটি। কুয়াশা কর্তৃক আবিষ্কৃত অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সাজানো গোছানো লঞ্চটি। আলট্রা মডার্ণ এর অভ্যন্তরভাগ। যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হয় জরাজীর্ণ রোগগ্রস্ত থুত্থুরে বুড়ো একটা। তিনতলা।

একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে

কুয়াশা। সামনেই টেলিভিশন। টেলিভিশন স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে একটা ছবি। ছবিটা আমাদের পূর্ব-পরিচিত লৌহমানবের। নবাবপুর রোডের উপর একটা হোটেলের বন্ধ গেটের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে লৌহমানব।

লৌহমানবের হাতের যন্ত্রটা আসলে একটা ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র-একটা ব্যাটারিচালিত লেসার গান। এবং লৌহমানব আসলে কুয়াশার নব আবিষ্কৃত একটা বৈজ্ঞানিক সাফল্য-রোবট।

একটা কাঠের বোর্ডের উপর স্থাপিত টেলিভিশনটি। বোর্ডটায় অসংখ্য সুইচ। ঝুঁকে পড়ে খটাখট শব্দ তুলে তিনটে সুইচ টিপে দিলো কুয়াশা। অমনি ট্র্যান্সমিটার কাজ শুরু করে দিলো। ভিশনের পর্দায় দেখা গেল কুয়াশার নির্দেশে লৌহমানব তার হাতের ভয়ঙ্কর যন্ত্রটি তুলে ধরেছে হোটেলের বন্ধ দরজার দিকে মুখ করে।

অস্ত্রটা যেইমাত্র তুলে ধরেছে অমনি এক ঝলক চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল মারণরশ্মি বের হয়ে গেল নল দিয়ে। এক কণা সময়ের মধ্যে অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন। দরজাটা আর নেই!

অত্যাশ্চর্য মারণরশ্মির এ এক অবিশ্বাস্য কেরামতি। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো কুয়াশার ঠোঁটে। তার আবিষ্কার মূল্যহীন নয়। এতো দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে কাজ করে এই লেসার-গান যে, কেউ তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। মারণরশ্মির জাদু-শক্তিতে হোটেলের লোহার গেটটা দেখতে না দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খানিকটা ছাই এবং খানিকটা তরল লোহা দেখা যাচ্ছে ফাঁকা জায়গাটায়। কুয়াশা আবার একটা সুইচ টিপলো।

লৌহমানব ঢুকে পড়লো হোটেলের ভিতর। তারপর নিঃশব্দ পদক্ষেপে হাঁটতে লাগলো করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে নির্বাধায়।

নিঃশব্দে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লৌহমানব। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো হোটেলের সব ক'টা প্রাণী। কিন্তু আচমকা একটা কাণ্ড ঘটলো। লৌহমানবের পায়ের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলো একজন বেয়ারা গাঢ় ঘুম থেকে। করিডরের এক পাশে ঘুমিয়েছিল বেচারা। জেগেই লৌহমানবকে দেখতে পেলো সে। অমনি গলা চেরা তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে চারদিক সচকিত করে তুললো লোকটা। তার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে আরো দু'জন বেয়ারার ঘুম ভেঙে গেছে। প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরেই পাল্লা দিয়ে চেঁচাতে লাগলো তারা। তারপর সত্যিসত্যি যখন লৌহমানবকে দেখতে পেলো তখন চোখ কপালে উঠলো তাদের। 'বাবাগো' 'মা গো' 'ভূত ভূত' ইত্যাদি রকম শব্দ বের হতে লাগলো তাদের গলা চিরে কর্ণবিদারী শব্দে।

নির্বাধায় একতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করলো লৌহমানব। বেয়ারাগুলোর শোরগোল শুনে একবার সে শুধু থমকে দাঁড়ালো কি

ভেবে যেন, তারপর গ্রাহ্য না করে উঠে যেতে লাগলো উপরের দিকে।

দেখতে না দেখতে একতলার সবকটা রুমের দরজা খুলে গেল। দোতলায়ও সকলে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো বিস্মিত হয়ে। কিসের শব্দ হচ্ছে? এই রাত দুপুরে কারা হঠাৎ এমন ভাবে চিৎকার জুড়ে দিলো? ডাকাত পড়লো নাকি হোটেলে? লৌহমানব তখন সিঁড়ি টপকে টপকে তিনতলার দিকে উঠছে। ঠিক এমনি সময় দোতলারও সবকটা দরজা খুলে গেল একে একে। লাঠিসোটা, দা, বন্দুক ইত্যাদি হাতে নিয়ে সন্দিহানদৃষ্টিতে দুরুদুরু বুকে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো সকলে।

একতলার মানুষগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে উঠে এলো হোটেল ম্যানেজার দোতলায়। সকলে মিলে এবার গিয়ে দাঁড়ালো সিঁড়িমুখে। লৌহমানব তখনও তিনতলায় উঠছে গম্ভীর চালে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

ছুটে গেল ম্যানেজার নিজের কেবিনে। বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে চলে এলো আবার সিঁড়ির কাছে। লৌহমানব ততক্ষণে তিনতলায় উঠে গেছে প্রায় সবকটা সিঁড়ি অতিক্রম করে।

'গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!'

পরপর তিনবার গুলি করলো ম্যানেজার লৌহমানবকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। দুটো গুলি গিয়ে লাগলো লৌহমানবের পিঠে, অপরটি ঠিক ঘাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় আঘাত করলো। কিন্তু প্রতিটি গুলিই ঠন্‌ঠন্‌ করে ছিটকে পড়লো সিঁড়ির ধাপে। লৌহমানবের শরীরে বিদ্ধ হলো না।

তিনতলায় উঠে করিডর ধরে হাঁটতে লাগলো লৌহমানব। অনেকগুলো রুম ছাড়িয়ে আঠারো নম্বর রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

লৌহমানবকে দাঁড় করিয়ে রেখে কি যেন ভাবলো একটু কুয়াশা। তারপর একটা সুইচ টিপলো সে। লৌহমানব আঠারো নম্বর দরজার গায়ে টোকা মারলো ঠক্‌ঠক্‌ করে।

খুললো না দরজা। তিনতলার কোনো রুমেরই দরজা খোলেনি কেউ। এদিকে একতলা এবং দোতলার সব লোক একসঙ্গে জমায়েত হয়ে মহাশোরগোল শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ হোটেল থেকে বের হয়ে পড়েছে লৌহমানবের আওতা থেকে পালাবার জন্যে। কেউ আবার রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। হোটেল ম্যানেজার তার সহকারীদের নিয়ে দোতলার সিঁড়িমুখে দাঁড়িয়ে তিনতলার বোর্ডারদের উদ্দেশে কি যেন বলছে চিৎকার করে।

রেডিওটা জোর করে দিলো কুয়াশা। শোনা যাচ্ছে এখন ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর। চিৎকার করে বলছে সে তিনতলার উদ্দেশে, 'আপনারা কেউ দরজা খুলবেন না! মঙ্গলগ্রহ থেকে একটা ভয়ঙ্কর জীব এসে ঢুকে পড়েছে হোটেলে।

তিনতলায় উঠে গেছে সে। দরজা-জানালা বন্ধ করে ফেলুন, খুললে প্রাণ যাবে- খবরদার!'

লৌহমানব কুয়াশার নির্দেশে আবার লেসার গানটা তুলে ধরলো আঠারো নম্বর রুমের বন্ধ দরজার দিকে। এবারও পলকের মধ্যে মারণরশ্মি পুড়িয়ে ফেললো কাঠের দরজা। লৌহমানব রুমের ভিতর প্রবেশ করলো দৃঢ় পদক্ষেপে।

ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অপরদিকের দরজাটা দেখা যাচ্ছে খোলা। সেই খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। দুজনেই ইউরোপিয়ান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভয়ে, উত্তেজনায় ঠকঠক্ করে কাঁপছে তারা। কুয়াশা পরপর আরো দুটো সুইচ টিপলো। তারপর নিচু স্বরে কি যেন বললো মুখের সামনে একটা মাউথপিস তুলে ধরে। লৌহমানবের কণ্ঠ হতে অস্বাভাবিক স্বর ঘরময় গমগম করে উঠলো, 'কুয়াশা জানে টোমরা কে। টোমাডের শক্তি সম্পর্কেও কুয়াশার কোনো সণ্ডেহ্ নেই। কিন্টু কুয়াশা অন্যায়-অপরাঢের ঘোর শত্রু। টাই টার জার্মান যে বনঢুটিকে টোমরা খুন করেছো, টার বডলা কুয়াশা নেবে। আমি টোমাডেরকে ধরে নিয়ে যেটে এসেছি।'

যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা কটি বলেই এগোতে লাগলো লৌহমানব।

জার্মান দু'জন তখন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লৌহমানবের দিকে। লৌহমানবকে এগোতে দেখেই সরে গেল তারা দরজার কাছ থেকে। লৌহমানব দরজা অতিক্রম করলো। দরজার এপাশে লম্বা মতো একটা ব্যালকনি শুধু। এখান থেকে অন্য কোথাও পালানো অসম্ভব।

'ঠা ঠা, ঠা ঠা ঠা…'

দরজা অতিক্রম করতেই দু'দুটো সাব-মেশিনগান গর্জে উঠলো লৌহমানবের দিকে মুখ করে। জার্মান দুজন বেপরোয়াভাবে গুলি করছে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে।

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…'

যান্ত্রিক হাসিতে ভেঙে পড়লো লৌহমানব। একটি গুলিও বিদ্ধ হচ্ছে না তার শরীরে। লৌহমানব এগোতেই থাকলো শিকার ধরার মতো দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে। আচমকা থেমে গেল গুলিবর্ষণ। ব্যালকনির রেলিঙের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে লোক দুজন। স্থির প্রতিজ্ঞা জ্বলছে তাদের দুজনেরই চোখে, 'প্রাণ দেবো কিন্তু ধরা দেবো না'।

লৌহমানব ধরে ফেললো বলে লোক দুজনকে, ঠিক এমন সময় জার্মান দুজন নির্বিকার ভঙ্গিতে একই সঙ্গে লাফিয়ে পড়লো তিনতলার উপর থেকে। শূন্যে পাক খেতে খেতে সশব্দে শক্ত রাস্তার উপর গিয়ে পড়লো দু'জনই। সঙ্গে সঙ্গে ছাতুছানা হয়ে গেল। ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়-এই শিক্ষাই পেয়েছে ওরা দলপতির কাছ থেকে। কে ওদের দলপতি? কি তার উদ্দেশ্য?

ব্যাপারটা টেলিভিশনে স্বচক্ষে দেখতে দেখতে চমকে উঠলো কুয়াশা। এটাতো সে চায়নি। সে চেয়েছিল লোক দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে জরুরী কিছু তথ্য জেনে নেবে শুধু। কিন্তু এ কি হয়ে গেল! ধরা দিলো না ওরা। কে জানতো ধরা দেবার চেয়ে মৃত্যুবরণ করে ফাঁকি দেবে এই ছিলো ওদের প্রতিজ্ঞা!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়লো কুয়াশা। মানুষ খুন করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে শহীদের কাছে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও সেই মানুষ খুনই হয়ে গেল ঘটনাচক্রে। শহীদ যখন ব্যাপারটা জানতে পারবে তখন সে কি ভাববে কে জানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কুয়াশা। তারপর টেলিভিশনের দিকে দৃষ্টি ফেলেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো সে। হোটেলের একতলা এবং দোতলার সব লোক উঠে এসেছে তিনতলার সিঁড়িমুখে। লোহার ডাণ্ডা, বন্দুক, রিভলভার, দা, ভোজালি ইত্যাদি ভয়ানক সব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সকলেই।

সুইচ টিপলো কুয়াশা। লৌহমানব ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর আঠারো নম্বর রুম পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো নিঃশব্দ পায়ে।

লৌহমানবকে রুম থেকে বের হতে দেখেই ফায়ারিং শুরু হয়ে গেছে। রিভলভার বন্দুক দুটোই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু লৌহমানব সিঁড়ির দিকে দু'পা এগোতেই হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল একটা। হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে জলপ্রপাত বয়ে গেল যেন। মুহূর্তের মধ্যে সব জঞ্জাল সাফ হয়ে গেল। লৌহমানবের ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। দৃঢ় পায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলায় নামলো সে। দোতলা থেকে নামলো একতলায়। তারপর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত কি যেন ভাবলো, পরমুহূর্তেই ঠিক যেদিক দিয়ে এসেছিল সে সেদিকেই হাঁটতে লাগলো দ্রুত পদক্ষেপে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে থানা হেডকোয়ার্টারে জরুরী সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ফোন করে দেয়া হয়েছে।

লৌহমানব তার নির্দিষ্ট পথে হাঁটতে থাকে, পিছন পিছন রাইফেল এবং রিভলভারধারী কিছুসংখ্যক অসমসাহসী লোক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ধাওয়া করে তাকে। ঠিক এমনি সময় মি. সিম্পসন এক গাড়ি আমর্ড ফোর্স নিয়ে হাজির হন হোটেলের সামনে।

হোটেল ম্যানেজারের মুখে সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে নেন মি. সিম্পসন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তারপর ছুটতে থাকেন সদলবলে লৌহমানবের উদ্দেশে।

সামান্য কিছু দূর গিয়েই লৌহমানবের দেখা পান মি. সিম্পসন। চিৎকার করে আদেশ করেন তিনি গোলাগুলি ছোঁড়া বন্ধ করতে। লৌহমানব হেঁটে যাচ্ছিলো মাঝ রাস্তা ধরে। মি. সিম্পসনের গলা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় একবার। পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে সে। তারপর আবার শুরু করে

হাঁটা।

বুড়িগঙ্গার তীরে পৌঁছে গেছে লৌহমানব। মি. সিম্পসন এখনো পিছু ছাড়েননি তার। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে রিভলভার বাগিয়ে দলবল নিয়ে অনুসরণ করে চলেছেন তিনি নাছোড়বান্দার মতো। লৌহমানব লঞ্চঘাটে এসে দাঁড়ালো। তারপর ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলো পানির দিকে।

লঞ্চঘাটের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে পানিতে নেমে পড়লো লৌহমানব। মি. সিম্পসন এতক্ষণে লঞ্চঘাটের উপরে এসে দাঁড়ালেন। লৌহমানবকে পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তবে কি পানির অতলতলেই এর বাসা? ভেবে কোনোই কূল পেলেন না মি. সিম্পসন। সিঁড়ির ধাপ কটা অতিক্রম করে এবার তিনি ও তার দলবলও এগিয়ে চললেন পানির দিকে।

লৌহমানব ঘুরে দাঁড়ালো এমন সময়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো মি. সিম্পসনকে। চোখ দুটো দাউ দাউ করে জ্বলছে যেন তার। হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়িয়ে লৌহমানব তার হাতটা ঊরুর কাছে নিয়ে গেল। কি যেন করলো সে। খুট করে শব্দ হয়ে ফাঁক হয়ে গেল খানিকটা জায়গা।

থমকে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। লৌহমানব ঊরুর ফাঁকটা থেকে বের করে আনলো লম্বা মতো একটা রিভলভার। মি. সিম্পসন এবং তার দলবলের দিকে তাক করলো সে রিভলভারটা। ঝটিতে শুয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন লৌহমানবের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে। চিৎকার করে শুয়ে পড়তে আদেশ দিলেন আর সকলকেও। কিন্তু কোনো লাভই হলো না তাতে। লৌহমানবের হাতে ধরা রিভলভার থেকে এক পশলা লিকুইড ক্লোরোফর্ম স্প্রে হয়ে গেল হিস হিস শব্দ করে। তারপর লৌহমানব ঘুরে দাঁড়ালো।

লৌহমানব এবার নির্বিঘ্নে হেঁটে চললো ক্রমশ গভীর পানির দিকে। পেছনে আর কেউ ধাওয়া করছে না তার। মি. সিম্পসন এবং তার দলবল আধঘন্টার জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েছেন লঞ্চঘাটের শেষ সিঁড়িটার উপর।

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো কুয়াশার ঠোঁটে। তার সবকটা আবিষ্কারই কাজে লাগছে প্রয়োজনের সময়।

তিন

সেদিনই বেলা আন্দাজ দশটা থেকে দশ-বারোটা নৌকাকে বুড়িগঙ্গার কূলে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। নৌকাগুলো লঞ্চঘাটের আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলো সারাটা বেলা। বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় একটা ছাড়া অপর

নৌকাগুলোকে আর দেখা গেল না সেই জায়গায়। নৌকাগুলো অদৃশ্য হবার আধঘন্টা পর তিনজন কুলি এসে দাঁড়ালো লঞ্চঘাটে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত তিনজন কুলি আসলে আমাদের পূর্ব পরিচিত মি. সিম্পসন, শখের ডিটেকটিভ শহীদ খান এবং তার সহকারী কামাল ব্যতীত আর কেউ নয়। বিশেষ কারণবশতঃ কুলির ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে ওদেরকে। শহীদের এখানে আসার কারণ হলো এই যে, গতরাত তিনটের সময় মি. সিম্পসন তাকে ফোন করেছিলেন। লৌহমানবের প্রায় অলৌকিক কাহিনী সবিস্তারে বলে শহীদের সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। সে কারণেই ওদের আগমন ঘটেছে এই অদ্ভুত ছদ্মবেশে বুড়িগঙ্গার কূলে।

মি. সিম্পসন আগেই ইনফর্মার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লঞ্চঘাটে। তেমন সন্দেহজনক কোনো কিছু নজরে পড়লেই খবর পাঠাবার নির্দেশ ছিলো তাদের উপর। সারাদিন ঘুর ঘুর করেও সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি তাদের। বিকেল পাঁচটার সময় ফিরে গিয়ে মি. সিম্পসনকে রিপোর্ট দিয়েছে তারা। সঙ্গে সঙ্গে মি. সিম্পসন ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেন। শহীদ এবং কামালকে ফোন করে ডেকে এনে কুলির ছদ্মবেশ ধারণ করে অফিস থেকে বের হয়ে সোজা লঞ্চঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁর ধারণা ইনফর্মাররা যেখানে সন্দেহজনক কিছু পায়নি সেখানে তিনি নিজে উপস্থিত হলে অনেক কিছু পেতে পারেন। সঙ্গে শহীদ খান থাকলে তো কথাই নেই।

যাই হোক, সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শুধুই এদিক ওদিক ঘুরেফিরে কাটলো। সন্দেহজনক তেমন কিছু নজরে না পড়লেও বিশেষ একটা লঞ্চের দিকে বারবার ওদের তিনজনের দৃষ্টি পড়ছিল। তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিলো না লঞ্চটার। আকারেও খুব একটা দশাসই নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, অন্যান্য অসংখ্য লঞ্চে যেমন লোকজন উঠছে নামছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটিতে তেমন কিছুর চিহ্নমাত্রও নেই।

অসংখ্য লঞ্চের সঙ্গে বেশ খানিকটা দূরে নোঙর করা হয়েছে লঞ্চটা। ঝরুড়মার্কাই বলা যায়। এক হাজার একশত বৎসর একদিন বয়েস হবে লঞ্চটার- জং ধরা, নড়বড়ে। লঞ্চটায় কেউ উঠছেও না, নামছেও না। কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না ভিতর থেকে। জনপ্রাণীর সাড়ামাত্র নেই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শহীদ, মি. সিম্পসন ও কামাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তকিয়ে ছিল লঞ্চটার দিকেই। এমন সময় অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য দেখা গেল লঞ্চটার উপরের ডেকে। দৃশ্যটা দেখে প্রথম মুহূর্তেই হতবাক হয়ে গেলেন মি. সিম্পসন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে শহীদের দিকে তাকালেন তিনি। উত্তেজনায়, অবিশ্বাসে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে তাঁর কুয়াশাকে লঞ্চটার উপরের ডেকে পায়চারি করে বেড়াতে দেখে।

'অবিশ্বাস্য শহীদ! কুয়াশা! তবে কি কুয়াশাই হোটেলে লৌহমানব পাঠিয়ে ইউরোপিয়ান দুজনকে খুন করিয়েছে? লৌহমানব কি তবে কুয়াশারই তৈরি?'

মি. সিম্পসনের কথা শুনে মৃদু হাসলো শহীদ। বললো, 'কুয়াশা খুন করিয়েছে বলে বিশ্বাস করি না আমি, মি. সিম্পসন। তবে লৌহমানব যে কুয়াশার দ্বারাই আবিষ্কার করা সম্ভব এ আমি জানি। আপনার মুখ থেকে সব শুনে আমার ধারণাই হয়ে গিয়েছিল কুয়াশা ছাড়া আর কেউ লৌহমানব পাঠাতে পারে না।'

'কিভাবে বুঝলি তুই?' প্রশ্ন করলো কামাল।

'অনুমান।'

কথাটা বলে মি. সিম্পসনের উদ্দেশে পাশ ফিরে তাকালো শহীদ। কিন্তু মি. সিম্পসন তখন ঘাটের শেষ ধাপে নেমে গিয়ে একটা নৌকার মাঝির সঙ্গে কি যেন আলাপ করছেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে।

মি. সিম্পসনের ব্যগ্রতা দেখে আশ্চর্য হলো না শহীদ। কুয়াশাকে হাতের নাগালে পেয়ে হাতের মুঠোর ভিতর কে না আনতে চায়। বিশেষত, মি. সিম্পসনের মতো কুয়াশার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হলে তো কথাই নেই।

কামালকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামলো শহীদ। মি. সিম্পসনের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই তাড়া লাগালেন তিনি, 'নৌকায় ওঠো শহীদ, জলদি!'

প্রস্তুত হয়েই এসেছেন মি. সিম্পসন। তিনি যদিও জানতেন না যে এবারও কুয়াশা এই অবিশ্বাস্য ঘটনার নায়ক, তবে প্রতিপক্ষকে তিনি মহা-শক্তিশালী ধরেই নিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি গতরাতের অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরায় বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। অজ্ঞাত প্রতিপক্ষকে মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারেননি। ভয় মিশ্রিত একটা শ্রদ্ধাবোধ তখনই জন্মে গিয়েছিল তাঁর শত্রুর প্রতি। সুতরাং তিনি জানতেন, এই শত্রুকে কাবু করতে হলে পাড়া মাত করে হৈহৈ শব্দে হাজির হলে চলবে না। শক্তি নয়, বুদ্ধিবলই প্রয়োজন এই শত্রুকে ঘায়েল করতে।

'লঞ্চের পিছন দিক দিয়ে ওপরে উঠবো আমরা।'

নৌকায় চড়ে বসে ফিসফিস করে বললেন মি. সিম্পসন শহীদ ও কামালকে লক্ষ্য করে। লঞ্চের দিক থেকে একমুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরাননি তিনি। কুয়াশা এখনও আপন মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে তার লঞ্চের ডেকে।

ছেড়ে দিলো মাঝি নৌকা।

'টেরও পাবে না বাছাধন, আমরা উঠে পড়বো লঞ্চে। উঠেই আক্রমণ করতে হবে। সময় দিলে হাজার রকমের কারসাজি শুরু করে দেবে কুয়াশা দেখতে না দেখতে। সেই লৌহমানবটাকে যাতে কাজে লাগাতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। তা না হলে সব মাটি।'

অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। কথাগুলো বলতে বলতে শহীদের দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন একবার। পরক্ষণেই লঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ডেক

থেকে কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'কি ব্যাপার, শহীদ! কুয়াশা কি দেখতে পেয়েছে আমাদের?'

কামাল বললো, 'অসম্ভব, মি. সিম্পসন। অতদূর থেকে দেখলেও চিনতে পারবে না কুয়াশা আমাদেরকে। তাছাড়া কি রকম অন্ধকার দেখছেন না, কুয়াশার চোখ তো আর অন্ধকারেও জ্বলে না।'

সকলের অজান্তে শহীদ লক্ষ্য করে দেখছিল একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অন্ততঃ তার কাছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হলো। কুয়াশার লঞ্চের আশপাশে অন্য একটা লঞ্চের আলো পড়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সেই আলোতে শহীদ দেখলো কুয়াশার লঞ্চের চারপাশের পানিতে অদ্ভুত একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে। অস্বাভাবিক উথলে উথলে উঠছে পানি। পানির নিচে দারুণ একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। শহীদের মতো কামালও লক্ষ্য করলো ব্যাপারটা। অবাক বিস্ময়ে তাকালো কামাল শহীদের দিকে।

'চিড়িয়া ভাগ্‌লবা হে,' ঠাট্টা করে বললো শহীদ।

'তার মানে!' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ আবার বললো, 'কুয়াশা বোধহয় পালালো মি. সিম্পসন।'

'অসম্ভব! সে আমাদেরকে দেখতেই পায়নি। দেখতে পেলেও এই অন্ধকারে চিনতে পারবে কিভাবে শুনি?'

ঠোঁট টিপে হাসলো শহীদ অন্ধকারে। মুখে বললো, 'তাই তো! চলুন তবে চেষ্টা করে দেখা যাক।'

মাঝিকে নির্দেশ দেয়া হলো নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে ঠিক লঞ্চটার পিছন দিককার গায়ে ভিড়তে। যথাযথ আদেশ পালন করলো মাঝি। অতি সন্তর্পণে ভিড়লো নৌকোটা লঞ্চের গায়ে। কোনো শব্দ নেই লঞ্চে। ফিসফিস করে মি. সিম্পসন বললেন, 'বুঝতে পারেনি কুয়াশা। তা না হলে বাধা দিতো। অন্তত মইটা এভাবে আমাদের জন্যে ঝুলিয়ে রাখতো না।'

ঠিকই। একটা কাঠের মই রাখা ছিলো জায়গাটায়। দেরি না করে কোমরে লুকিয়ে রাখা রিভলভারটা বের করলেন মি. সিম্পসন। দেখাদেখি কামালও হাত দিলো তার নিজের কোমরে রিভলভার বের করার জন্যে। মি. সিম্পসন ততক্ষণে মই বেয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন।

প্রথমেই তিনতলার ডেকের উপর গিয়ে পৌঁছলো ওরা। তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়লো অন্ধকারে। ডেকের উপর তো কোনো আলো ছিলোই না, একটি মাত্র কেবিন থেকেও কোনো আলোর আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছিলো না। শহীদ ও কামালের আগেই দোতলায় নেমে গেলেন মি. সিম্পসন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নামলো কামাল ও শহীদ। নেই। কেউ নেই। তিনতলার মতো দোতলাতেও কোনো জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। চিহ্নও নেই। নিরাশার ছায়া ফুটে উঠলো মি.

সিম্পসনের কপালে। স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি দোতলার শেষ কেবিনটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে না পেয়ে। এমন সময় কামালকে সেই কেবিনে ঢুকতে দেখলেন মি. সিম্পসন।

'কুয়াশা পালিয়েছে মি. সিম্পসন,' নিরাশ কণ্ঠে বললো কামাল। 'শহীদের কথাই সত্যি হলো।'

কামালের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডেক থেকে শহীদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি বাইরে বের হয়ে আসুন, মি. সিম্পসন।'

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কামাল ও মি. সিম্পসন। শহীদের গলায় এমন একটা জরুরী ভঙ্গি ছিলো যে দুজনই যুগপৎ চমকে উঠলো প্রায়।

'কুয়াশাকে দেখতে চান?' ওরা বাইরে বের হয়ে আসতেই মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করলো শহীদ।

বোকার মতো তাকালো কামাল শহীদের দিকে। মুখ দিয়ে কথা বের হলো না তার।

'ঐ দেখুন, ডান দিকের দুটো লঞ্চ ছাড়িয়ে তিন নম্বর লঞ্চটার ডেকের উপরে কুয়াশা পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।'

ব্যস্ত-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকালো ওরা ডান দিকে।

নির্দিষ্ট লঞ্চটা মৃদু মৃদু দুলছে ঢেউ লেগে। খুব একটা বড়সড় লঞ্চ এটাও নয়। তবে নতুন তা দেখলেই বোঝা যায়। নীল এবং হাল্কা সবুজ রঙে ঝকমক করছে লঞ্চটা আলোর প্রতিফলনে। ঐ দিকটা আলোর প্রাচুর্যে স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। সম্পূর্ণ লঞ্চটাতেই অন্য লঞ্চ থেকে আলো এসে পড়েছে। তাছাড়া ডেকে তো উজ্জ্বল আলোর ছড়াছড়ি। ডেকের সেই আলোয় দেখা গেল বিলাসী পদক্ষেপে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ধুরন্ধর কুয়াশা আপন মনে। মুখে তার অস্পষ্ট হাসির রেখা।

কি আশ্চর্য! এও কি বাস্তবে সম্ভব?

'এ কি করে সম্ভব হলো, শহীদ?' বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

'স্বপ্ন দেখছি না তো?' শুকনো গলায় জানতে চাইলো কামাল।

'স্বপ্ন নয়, বাস্তবেও এটা সম্ভব। অনেকের বেলায় সম্ভব না হলেও কুয়াশার বেলায় অসম্ভবও নির্ঘাৎ সম্ভব। তা না হলে কুয়াশা আমাদেরই মতো একজন বুদ্ধিপ্রধান মানুষ হতো, কালজয়ী প্রতিভাবান বলতাম না। বলতাম কি?'

'তা বলতাম না,' মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলেন মি. সিম্পসন শহীদের কথা। 'সত্যি, কুয়াশার তুলনা এককথায় মেলা অসম্ভব। কিন্তু শুধু যদি সে অসামাজিক কাজগুলো থেকে নিজেকে…'

কুয়াশা ততক্ষণে আর ডেকের উপরে নেই। মি. সিম্পসনকে বাধা দিয়ে

কামাল বললো, 'গল্প পরে করলেও চলবে মি. সিম্পসন, ভুলে যাবেন না যে আমরা কুয়াশাকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই! চলো চলো!' চিংড়ি মাছের মতো লাফিয়ে উঠলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'কুয়াশাকে তার প্রাপ্য সাজা পেতেই হবে।'

মই বেয়ে নৌকায় নেমে এলো ওরা। সেই নির্দিষ্ট লঞ্চের দিকে দাঁড় বাইতে বললো মাঝিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল নৌকা লঞ্চটার পাশে। এখানেও মই পাওয়া গেল একটা। দারুণ উত্তেজনায় মি. সিম্পসন এবং কামাল একটা জিনিস লক্ষ্য করতে বেমালুম ভুলে গেল। কিন্তু শহীদের দৃষ্টি এড়ালো না ব্যাপারটা। এই লঞ্চটারও আশপাশে প্রথমবারের মতো পানির ভিতর দারুণ তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

মই বেয়ে উপরে উঠলো ওরা বিনাবাক্যব্যয়ে। উদ্যত রিভলভার হাতে ডেক ধরে একটা কেবিনের দিকে হাঁটতে লাগলো গুটিগুটি। এমন সময় শহীদের হাস্যময় কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো ওরা, 'কুয়াশাকে এভাবে ধরা যাবে না, মি. সিম্পসন। ঐ দেখুন, কলা দেখিয়ে প্রথম লঞ্চটাতেই ফিরে গিয়ে আবার পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সে।'

ধীরে ধীরে ঘাড় বাঁকিয়ে দূরের লঞ্চটার দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন। সোজাসুজি না তাকিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো কামাল।

হাসতে হাসতে শহীদ বললো, 'বলুন, এখন কি করবেন?'

কঠিন হয়ে উঠেছে মি. সিম্পসনের মুখ। নাজেহাল হবারও একটা সীমা-পরিসীমা আছে। এমন বিদঘুটে নাকানি-চোবানি খেলে কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে।

'শেষ পর্যন্ত দেখবো আজ আমি। আবার যাবো আমরা ঐ লঞ্চে,' মইয়ের দিকে ফিরতে ফিরতে কথা কটি বলেন মি. সিম্পসন। অগত্যা শহীদ ও কামালও তাঁর পিছু নেয়।

নৌকার উপর বস্তা চাপা দেয়া একটা সাব-মেশিনগান বের করে নিলেন মি. সিম্পসন। আর মাত্র দশ-বারো গজ দূরে লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে। এবার আর পালাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কুয়াশার। আপন মনে ডেকের উপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সে এখনও। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বিস্মিত হলো শহীদ। কুয়াশা এমন নির্বিকার কেন।

মাত্র পাঁচ গজ থাকতে হাঁক ছাড়লেন মি. সিম্পসন কুয়াশার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'পালাবার চেষ্টা কোরো না, কুয়াশা। তাহলে আজ আর তোমার রক্ষা নেই।'

ধীরে ধীরে ফিরলো কুয়াশা ওদের দিকে। হাসছে উদারভাবে। ঠিক এমনি সময় রেলিঙের উপর একটা লৌহমানবের ছায়া দেখা গেল। চমকে উঠলেন মি.

সিম্পসন। লৌহমানব রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার উঁচিয়ে ধরা একটা লেসার গান।

'সাবঢান, মিস্টার ছিমছন। হৈ চৈ করলে বিপড ঘটবে বলে ডিচ্ছি। ভিজে বেড়ালের মটো ওপরে উঠে পড়ুন টাড়াটাড়ি। ডশ পর্যন্ত গুণবো আমি-এক, ডুই, টিন, চার...

ভিজে বেড়ালের মতো নয়, হিংস্র বাঘের মতো ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন মি. সিম্পসন। টিপে দিলেন হাতের সাব-মেশিনগান।

'ঠা, ঠা, ঠা ঠা ঠা...'

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,' যান্ত্রিক শব্দে বিকট হাসি বের হলো লৌহমানবের গলা দিয়ে। তারপর আবার গুনতে শুরু করলো সে, 'সাট, আট...

'উঠে পড়ুন মি. সিম্পসন,' বিচলিত কণ্ঠে বললো কামাল।

'তাই তো! আর তো কোনো উপায় দেখছি না।'

দারুণ ক্রোধে গজর গজর করতে করতে মই বেয়ে লঞ্চের উপর উঠতে শুরু করলেন মি. সিম্পসন। তার পিছন পিছন শহীদ ও কামালও উঠতে লাগলো লৌহমানবের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি রেখে। অদ্ভুত মাথা কুয়াশার। কি ভয়ঙ্কর যান্ত্রিক মানুষ তৈরি করেছে সে!

মি. সিম্পসন আগে আগে, তার পিছনে লৌহমানব এগোতে লাগলো ডেক ধরে। দশ কদম এগোবার পর কি মনে করে পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালেন। কেউ নেই তার পিছনে। শহীদ ও কামালও নেই। মিনিটখানেক থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন মি. সিম্পসন। একবার ভাবলেন-এই সুযোগ, পালিয়ে যাই এই ফাঁকে। তারপর ভাবলেন, না। দেখা যাক না কি হয়। সুযোগ পেয়েও তো যেতে পারি কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে।

যেদিক যাচ্ছিলেন সেদিকেই হাঁটতে শুরু করলেন মি. সিম্পসন। ডেকের উপর আলোটা এখন নিভে গেছে। অদূরেই দেখা যাচ্ছে একটা কেবিন। দরজা খোলা কেবিনটার। উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাইরে। মি. সিম্পসন পা টিপে টিপে সেদিকেই এগোলেন কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে।

নিঃশব্দ পায়ে আলোকিত কেবিনটার দিকে এগোতে লাগলেন মি. সিম্পসন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন চুপিচুপি। ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই আশায় আনন্দে শিরশির করে উঠলো তার সর্বশরীর-কুয়াশা!

বিশাল পিঠ দেখা যাচ্ছে কুয়াশার। পিছন ফিরে বসে রয়েছে। সামনে সম্ভবত একটা টেবিল। টেবিলটার উপর ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে কি যেন করছে সে। কোনদিকে যেন খেয়াল নেই এতটুকু।

মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কুয়াশাকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। শহীদ ও

কামালের কথা মনে পড়লো তাঁর। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও দেখতে পেলেন না তাদের তিনি। কিন্তু শহীদদের কথা তখন তাঁর ভাবনা নয়। কুয়াশাকে এরকম আনমনায় পেয়ে কিভাবে এবার হাতের মুঠোর ভিতর আনা যায় সেই দুশ্চিন্তাতেই উতলা হয়ে উঠেছে তাঁর মন। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর মাথায়। ফিরে যাবেন তিনি। লঞ্চের নিচেই নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে ইনফর্মার। তাকে দিয়ে খবর পাঠাবেন অদূরেই জলপুলিসকে। কুয়াশা এখনও জানতে পারেনি যে সে ধরা পড়ে গেছে। লৌহমানবের হাতে সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করছে সে। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই জলপুলিসকে সঙ্গে নিয়ে ঘেরাও করে ফেলবেন তিনি কুয়াশার লঞ্চ। পালাবার আর কোনো পথ থাকবে না কুয়াশার।

যেই ভাবা সেই কাজ। মি. সিম্পসন নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিতে সবসময় বিপরীত ঘটে এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। মি. সিম্পসন যেইমাত্র ঘুরে দাঁড়ালেন অমনি দরজার পাশ থেকে বের হয়ে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালো একটা লৌহমানব।

প্রস্তরমূর্তির মতো থমকে গেলেন মি. সিম্পসন। তারপরই লৌহমানবের আগুনের মতো জ্বলন্ত দু'টো চোখ লক্ষ্য করে সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের ট্রিগার টিপে দিলেন পরপর দু'বার। কিন্তু হা হতোহস্মি! একটা গুলিও বের হলো না রিভলভারের নল থেকে। বেরোবেই বা কিভাবে। মি. সিম্পসনের অজান্তে লৌহমানব তার রিভলভার বের করে নিয়ে গুলিগুলো ফেলে দিয়ে আবার যত্নের সঙ্গে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল।

চার

সোজা কুয়াশার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়বেন ঠিক করলেন মি. সিম্পসন। তৈরি হয়ে লাফ দেবেন এমন সময় অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল কুয়াশার।

'ধীরে, মিস্টার ধীরে! লাফ দিলেই প্রচণ্ড আঘাত খাবেন শুধু শুধু। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখুন একবার, লৌহমানব কেমন নিঃশব্দে আপনার পিছনে এসে ল্যাং মারার জন্যে তৈরি হয়ে রয়েছে।'

চমকে উঠলেন মি. সিম্পসন। আশ্চর্য, কুয়াশা তেমনি পিছন ফিরে বসে রয়েছে তার চেয়ারে। অথচ মি. সিম্পসন যে লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের উপর পড়তে যাচ্ছিলেন তা ঠিক বুঝতে পেরেছে। চকিতে পিছন ফিরে তাকালেন মি. সিম্পসন। দেখলেন লৌহমানব তার পায়ের ভিতর আলগোছে একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকারভাবে। শুধু বলের মতো দুটো আগুনের পিণ্ড তার দিকে তাকিয়ে

আছে জ্বলজ্বল করে।

'ভিতরে ঢুকুন, মি. সিম্পসন।'

আহ্বান জানালো কুয়াশা। প্রচণ্ড ক্রোধে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মি. সিম্পসন। এমন সময় অপরদিকের দরজা দিয়ে শহীদ ও কামালকে নিয়ে একটা লৌহমানব কেবিনের ভিতর প্রবেশ করলো দেখতে পেলেন তিনি।

'এসো শহীদ, কথা আছে তোমাদের সঙ্গে আমার,' শহীদের উদ্দেশ্যে বললো কথাটা কুয়াশা।

মি. সিম্পসন ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'জানতে পারি কি, আমাদেরকে এভাবে ধরে আনার কারণ কি?'

হেসে ফেললো কুয়াশা। বললো, 'কারণ আছে, মি. সিম্পসন। দাঁড়িয়ে কেন শহীদ, বসো তোমরা। আপনিও ভিতরে এসে বসুন, মি. সিম্পসন।'

অগত্যা নিরুপায় মি. সিম্পসন কেবিনের ভিতর ঢুকে সামনের একটা চেয়ারে বসলেন ধীরে ধীরে। শহীদ ও কামালও বসেছে ইতিমধ্যে। লৌহমানব চলে গেছে একসময় কেবিন ছেড়ে। কুয়াশা শুরু করলো তার কথা।

'আমি জানি, গতরাতের লৌহমানব রহস্য ভেদ করার জন্যে আবার আমার পিছনে লেগেছেন মি. সিম্পসন। যদিও লৌহমানব যে আমারই সৃষ্টি তা তিনি আগে জানতে পারেননি। হ্যাঁ, লৌহমানব আমারই সৃষ্টি। প্রচণ্ড ক্ষমতা এই লৌহমানবের। হেন কাজ নেই যা এর দ্বারা সম্ভব নয়। একে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো কাজে লাগিয়েছি আমি। লেসার রশ্মি, যাকে মারণরশ্মি বলা হয়, তা এর হাতের অস্ত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়। যে কোনো পদার্থেই এই রশ্মি ফেললে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু ধোঁয়া উঠবে নামমাত্র। আগুন ধরবারও ভয় নেই। এর শরীরে অটোমেটিক টিভি-ক্যামেরা ফিট করা আছে। ওয়্যারলেস, টেপ-রেকর্ডার, ক্লোরোফর্ম স্প্রেযুক্ত একধরনের রিভলভার ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়েছি একে আমি।'

একমুহূর্ত থেমে শহীদের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করলো কুয়াশা, 'গতরাতের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে একটা গল্প শোনাতে হয় তোমাদেরকে। গল্পটা গল্প নয়, বাস্তব সত্য। সত্য, এবং অবিশ্বাস্য এক কাহিনী সেটা। শোনো-

'গত মাসের পনেরো তারিখে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে অজ্ঞাতনামা একজন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের চিঠি আসে আমার কাছে। অদ্ভুত একটা চিঠি! পুরো ঠিকানা নেই, বক্তব্যও সরল নয়, জার্মান ভাষায় মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা। যার সারমর্ম হলো, "মানবের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গিত-প্রাণ সংগ্রামী এক বৈজ্ঞানিক আমি। মহাশূন্যে রাজত্ব করার ক্ষমতা অর্জন করেছি। এক্ষণে শত্রু কর্তৃক বিপদগ্রস্ত। আপনার সাহায্য একান্ত এবং জরুরী ভাবে কাম্য। যেভাবেই হোক

আমি জেনেছি আপনিও একজন উৎসর্গিত-প্রাণ সংগ্রামী বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান জগতে আপনি যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তার প্রমাণ আমার হাতে আছে। দোহাই আপনার, আমাকে সাহায্য করুন।"

একমুহূর্ত থেমে কি যেন ভাবলো কুয়াশা। তারপর আবার শুরু করলো, 'এবং শুধু এই চিঠিটাই নয়, এরপর গত পঁচিশ ও একত্রিশ তারিখে একটা একটা করে দুটো চিঠি আসে আমার কাছে সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে লেখা হয়েছে চিঠিগুলো। পরবর্তী চিঠি দুটিরও বক্তব্য প্রায় এক।'

গভীর মনোযোগে শুনছিল ওরা কুয়াশার কথা। কুয়াশা থামতে শহীদ প্রশ্ন করলো, 'দক্ষিণ আমেরিকার পেরু তো একটা দেশ। চিঠিতে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম বা শহরের উল্লেখ নেই কেন? পুরো ঠিকানা না দেবার কি কারণ থাকতে পারে?'

কুয়াশা বললো, 'প্রথমে সেটা আমার কাছে একটা রহস্যই ছিলো বটে। তবে আগেই আমি ধারণা করেছিলাম যে, বৃদ্ধ হয়তো নিজের পুরো ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক। তিনি হয়তো দেশান্তর হয়ে ছদ্মবেশে বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত আছেন।'

শহীদ বললো, 'তা হওয়া অসম্ভব নয়। বৃদ্ধ তো জার্মান ভাষায় চিঠি লিখেছেন। তার মানে তিনি জার্মান, কিন্তু তাহলে পেরুতে থাকবেন কেন?'

কুয়াশা বললো, 'হ্যাঁ, পরে আমি সব জানতে পেরেছি। প্রথমে তো আমি বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম এই ভেবে যে, কিভাবে সাহায্য করবো তাঁকে। ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। এমন সময় হঠাৎ, এই মাসের সাত তারিখে, অর্থাৎ গত পরশুদিন, একজন জার্মান যুবক আমার সঙ্গে এসে দেখা করলো। যুবকটি আসলে সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরই ছেলে।'

কথার মাঝে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো কামাল। শহীদ তার আগেই জানতে চাইলো, 'তারপর?'

কুয়াশা বলে চললো, 'যুবকটি আমার সঙ্গে দেখা করে বললো যে, সে পেরু থেকে এসেছে। তার বাবা তাকে পাঠিয়েছে আমার সর্বশক্তি নিয়ে আমি যেন তার সঙ্গে পেরুতে গিয়ে উপস্থিত হই। তার বাবা নাকি যে কোনো মুহূর্তে শত্রু কর্তৃক নিহত হবার আশঙ্কা করছেন। এবং তিনি নিহত হলে মানব সমাজের যে অপরিসীম ক্ষতি হবে তা হাজার মাথা কুটলেও পূরণ হবে না। যুবকটির সঙ্গে এই পর্যন্তই আলাপ হয়েছিল আমার। সে হোটেল আফলাতুনে থাকছিল ঢাকায় এসে অবধি।'

কুয়াশা মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে থামলো একটু। তারপর বললো, 'আপনি তো জানেন, মি. সিম্পসন, যে গতকাল দুপুর দুটোর দিকে হোটেল আফলাতুনের সামনে একজন জার্মানকে হত্যা করে দু'জন জার্মান পালিয়ে গিয়েছিল?'

যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নাড়লেন মি. সিম্পসন।

'নিহত ঐ জার্মানটিই সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ছেলে। গতকাল দুপুর ঠিক দুটোর সময় আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসার কথা ছিলো তার। সোয়া দুটো বেজে যাবার পরও তাকে আসতে না দেখে বিচলিত হয়ে পড়ি আমি। কেননা সুদূর পেরু থেকেই তাকে শত্রুরা অনুসরণ করে আসছে একথা সে আমাকে জানিয়েছিল। তাকে আমি আমার আতিথ্য গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধও করেছিলাম। তার নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করা হতো তাতে। কিন্তু রাজি হয়নি সে। কেন জানি নিজের সম্পর্কে ওভার-শিওর ছিলো যুবকটি। রাজি হয়নি সে আমার কথায়। যাই হোক, তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমিই রওনা হয়ে যাই হোটেল আফলাতুনের উদ্দেশে। হোটেলে পৌঁছে গাড়ি পার্ক করার সময় তার মৃতদেহ দেখতে পাই আমি।'

কুয়াশাকে বাধা দিয়ে মি. সিম্পসন বলে ওঠেন, 'আর যার যা স্বভাব, অমনি বাহাদুরি ফলাবার জন্যে মৃতদেহটা গাপ করে দিলে! এদিকে তার ফলে কি বিচ্ছিরি ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে...'

মৃদু হেসে কুয়াশা বলতে শুরু করলো আবার, 'মৃতদেহটার সদগতি করার সময় প্রতিজ্ঞা করি আমি যে, বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে আমার প্রাণ দিয়ে হলেও আমি সাহায্য করবো। এবং তাঁর শত্রুপক্ষকে আমার শক্তির পরিচয় না দেখিয়ে ক্ষান্ত হবো না।'

'কুয়াশা, তুমি একটা পিশাচ! তোমার শক্তির পরিচয় দেবার দরকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মানুষকে নির্বিকারভাবে তিনতলার ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেললে, কেমন?'

কুয়াশার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'না! ওদেরকে ছাদ থেকে ফেলে দেবার কোনো ইচ্ছা আমার ছিলো না। আসলে নরহত্যাকে এখন আমি ঘৃণা করি। একথা আর কেউ না জানলেও শহীদ ভালভাবেই জানে। খুনী জার্মান দু'জনকে আমি শুধু বলপূর্বক আমার চোখের সামনে ধরে আনতে চেয়েছিলাম। কয়েকটা জরুরী তথ্য আদায় করবার জন্যেই এই প্ল্যান করেছিলাম আমি। আর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে আমি সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর একথা শত্রুদেরকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ভাবিনি এ শত্রু সাধারণ শত্রু নয়। ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যুকে এরা শ্রেয় জ্ঞান করে তা আমার জানা ছিলো না।'

কথা শেষ করে চিন্তিত মুখে বসে রইলো কুয়াশা। কেউ কোনো কথা বললো না। হঠাৎ একসময় মি. সিম্পসন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সকলের অজান্তে।

কিছুক্ষণ পর শহীদ বললো, 'কুয়াশা, তুমি তাহলে দক্ষিণ আমেরিকায় যাচ্ছো?'

যেন বহুদূর থেকে কুয়াশার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হ্যাঁ, যেতে হবে আমাকে।

যেতেই হবে।'

পিক পিক, পিক পিক পিক, পিক পিক...

কুয়াশার কথা শেষ হতেই ঘরের একদিকের কোণ থেকে অদ্ভুত শব্দে একটা ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠলো। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা সোফা ছেড়ে। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল কেবিনের যেদিকটায় কালো ভারী একটা পর্দা টাঙানো রয়েছে সেদিকটায়।

কিছু বুঝতে না পেরে শহীদ ও কামালও চমকে উঠেছিল। কুয়াশাকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে উঠে দাঁড়ালো ওরাও। ওদের দুজনের মনেই প্রশ্ন- কোনো বিপদ ঘটলো নাকি?

পাঁচ

'এদিকে এসো, শহীদ।'

কালো পর্দার ভিতর ঢুকেই ডাকলো কুয়াশা শহীদকে। এগিয়ে গেল ওরা। পর্দার ওপারে গিয়েই বিস্মিত হয়ে পড়লো শহীদ বিরাটাকার একটা কমপিউটার-কাম-ট্র্যান্সমিটার যন্ত্র দেখে। মানুষ সমান উঁচু হবে যন্ত্রটা। অদ্ভুত সব কলকব্জা তার। বিভিন্ন রঙের কাঁচ, কাঁটা; অদ্ভুত সব সঙ্কেতলিপি, নাম্বার, সুইচ।

কুয়াশা বললো, 'মহাশূন্যের শব্দ তরঙ্গ ট্র্যান্সমিট করে এই যন্ত্র। আমার আরও একটি আবিষ্কার এটি। সৌরজগৎ ছাড়িয়ে তো দূরের কথা, চাঁদ মঙ্গলগ্রহ প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই বললেই চলে। এখনো আমরা জানি না সঠিকভাবে যে, আমাদের মতো আর কোনো জীব সৌরজগতে বা বিশাল মহাশূন্যের অন্য কোনো জগতে আছে কিনা। আমি তা জানতে আগ্রহী। একটু আগে যে ওয়ার্নিং বেল শুনতে পেলে সেটার অর্থ মহাশূন্যের শব্দতরঙ্গ রেকর্ড হয়ে গেছে এই যন্ত্রের ভিতর রাখা টেপ্‌রেকর্ডারে।'

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো শহীদ, 'এটার কার্য ক্ষেত্রের আওতা কতদূর কুয়াশা?'

'অনেক, শহীদ। আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়েও এর কার্যসীমা প্রসারিত। রেকর্ড করা শব্দ তরঙ্গ শুনবার পর বলা সম্ভব শব্দটা কতদূর থেকে এসেছে। শুনবে তুমি?'

অবাক বিস্ময়ে কামাল মাথা নেড়ে বললো, 'শুনবো বৈকি!'

মুগ্ধ নেত্রে দেখছিল শহীদ কুয়াশাকে। প্রতিভাধর এই মানুষটির প্রতি তার শ্রদ্ধা আকাশপ্রমাণ হয়ে উঠলো। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে কুয়াশার দিকে। সুইচ অন করে দিয়ে চালু করে দিলো কুয়াশা যন্ত্রটা।

যন্ত্রটা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-ও-ও-ও শোঁ-ও-ও-ও করে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাবার মতো শব্দ হতে লাগলো প্রায় একমিনিট ধরে। তারপর অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপারের সূচনা হলো। হঠাৎ যন্ত্রটা থেকে একটা মনুষ্য কণ্ঠের ঘড়ঘড়ে বাজখাঁই শব্দ পাওয়া গেল।

বিদ্যুৎবেগে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো কুয়াশা শহীদের দিকে।

'আশ্চর্য!'

কুয়াশাকে বিমূঢ় হতে দেখে শহীদ প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা?'

'বিশ্বাস করতে পারছি না আমি, শহীদ! শুনতে পাচ্ছো না মানুষের কণ্ঠ? মহাশূন্য থেকে মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসছে, এও কি সম্ভব!'

'তার মানে!'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না যেন শহীদ, 'মহাশূন্য থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর! কি বলছো তুমি, কুয়াশা?'

'শুনতে পাচ্ছো না, শহীদ, বিদেশী ভাষায়, খুব সম্ভব ফ্রেঞ্চ ভাষায় কে যেন কি বলছে?'

শহীদ বললো, 'শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা মহাশূন্য থেকে ভেসে আসতে পারে কিভাবে?'

শহীদের কথা শেষ হতে ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো কুয়াশা। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। সিধে হয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা আবার।

বললো, 'কোনো রকম গোলযোগ নেই, শহীদ, যন্ত্রে। কণ্ঠস্বরটা মঙ্গলগ্রহ থেকেই ভেসে আসছে। এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'বলো কি!'

ইতিমধ্যে তিনবার একই ভাষায় উচ্চারিত একই শব্দ-তরঙ্গ ভেসে আসার পর অন্য একটা ভাষায় এখন শব্দ-তরঙ্গ ভেসে আসছে।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। সকলের মুখেই অবিশ্বাস দানা বেঁধে রয়েছে। এমন সময় হঠাৎ জার্মান ভাষায় শব্দ-তরঙ্গ ভেসে আসতে শুরু করলো ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে। একবার চকিতে শহীদের দিকে তাকিয়েই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলো কুয়াশা মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত জার্মান ভাষায় মনুষ্যকণ্ঠের বক্তব্য।

পরপর তিনবার সেই একই শব্দমালা ভেসে এলো যন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর বন্ধ হয়ে গেল টেপ-রেকর্ডার।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে কুয়াশা। ঘেমে উঠেছে সে কেবিনে দু'দুটো এয়ারকুলার থাকা সত্ত্বেও। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে শহীদের দিকে তাকালো একসময়। তারপর বললো, 'জার্মান ভাষায় যা শুনলাম তার অনুবাদ দাঁড়ায়, "আমি বৈজ্ঞানিক কিছক্স বলছি। মঙ্গলগ্রহ থেকে এই সংবাদ কুয়াশা নামক

বৈজ্ঞানিকের সমীপে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে আমি ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন। সাজামো আমার ঠিকানা।"

'কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে কুয়াশা?' কুয়াশার অনুবাদ শেষ হতেই শহীদ অবাক-বিস্ময়ে জানতে চাইলো।

কুয়াশা বললো, 'ঠিক বলতে পারছি না। সম্ভবত কোনো স্পেস ক্রাফ্ট তৈরি করে তাতে টেপ-রেকর্ডার ফিট করে মঙ্গলগ্রহে পাঠানো হয়েছে সেটা। সেখান থেকে টেপ-রেকর্ডার খবরটা ছড়িয়েছে, আর আমার যন্ত্র সেটা ধরেছে।'

তিনজনই একটা সোফায় গিয়ে বসলো এবার। শহীদ বললো, 'তুমি তাহলে খুব শিগগিরই রওনা হচ্ছো?'

'হ্যাঁ, শহীদ। বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাশালী এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হতে। আমাকে যেতেই হবে এবার।'

হঠাৎ কি মনে করে শহীদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো কুয়াশা। তারপর আবেগ-জড়িত আন্তরিক কণ্ঠে শহীদকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, 'যাবে, শহীদ, তোমরাও যাবে আমার সঙ্গে? চলো না, দেখে আসি আশ্চর্য একটা মানুষকে। কৌতূহল হচ্ছে না তোমাদের? একজন বুড়ো মানুষ কি জানি কি ভয়ানক বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্যে হা-পিত্যেস করে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে । তাঁকে কি সাহায্য করা মহত্ত্বের কাজ নয়, শহীদ?'

কুয়াশা থামতে কি বলবে ভেবে পেলো না শহীদ।

'এসো না, শহীদ, আমরা সবরকমের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে, ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে যাই? এসো না, আমরা সবাই মিলেমিশে পৃথিবীটাকে সুন্দর এবং পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করি? অনেক কিছু করার সাধ হয় আমার, শহীদ। অনেক কৌতূহল আমার। সাগরের নিচে কি অফুরন্ত সম্পদ, কি অসীম রহস্য! মহাশূন্যে কি অবিশ্বাস্য বিস্ময়! অথচ কোনো কিছুরই তো খবর রাখি না আমরা। কিন্তু সব জানতে চাই আমি! সব রহস্যের মীমাংসা, সব কৌতূহলের নিবৃত্তি না করতে পারলে জন্ম সার্থক হবে কেন। সব জানবো আমি, সব জানবো। এসো না, শহীদ তোমরা, সব ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে এসো না আমরা একজোট হয়ে বেরিয়ে পড়ি পৃথিবীর পথে? বিজ্ঞান সাধনার জন্যে আমি আর নরহত্যা করবো না। তোমরাও আর আমার পিছু পিছু ছুটবে না। আমিও আর কোনো সীমা লঙ্ঘন করবো না। চমৎকার হবে না কি সেটা? শহীদ, কামাল, তোমরা কি বুঝতে পারছো না আমার কথা? তোমাদের সাহায্য আমার দরকার।'

'পারছি, বন্ধু!'

কুয়াশার আবেগ-মিশ্রিত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলো না শহীদ। উঠে দাঁড়ালো সে। কামালও অভিভূত হয়ে পড়েছে আশাতীত। এক মুহূর্তে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব

কেটে গেছে তার। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে-ও। কুয়াশার প্রসারিত হাতখানা সজোরে ধরলো চেপে দুজনে। শহীদ বললো, 'উত্তম প্রস্তাব, বন্ধু! তোমার সান্নিধ্য পেয়ে আমরা ধন্য হলাম।'

উজ্জ্বল হেসে কুয়াশা বললো, 'ধন্যবাদ, শহীদ। ধন্যবাদ, কামাল। আগামী পরশুদিন যাত্রা শুরু করবো তাহলে আমরা, কি বলো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো ওরা।

'মহুয়া হয়তো যেতে চাইবে। অনেকদিন সে বাইরে কোথাও যায়নি সম্ভবত। যেতে চাইলে আপত্তি কোরো না তুমি। গফুর তো তার দাদামণিকে ছেড়ে স্বর্গেও থাকতে রাজি হবে না। আর লীনা?'

কুয়াশার প্রশ্নের উত্তর দিলো কামাল, 'লীনার সামনে পরীক্ষা। ওকে বোর্ডিংয়েই থাকতে হবে।'

'মি. সিম্পসনকে দেখছি না যে!' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে শহীদ।

কুয়াশা বলে, 'মি. সিম্পসন অনেকক্ষণ হলো কেবিন থেকে বের হয়ে গেছেন। কেবিন থেকে বের হয়েছেন বটে, কিন্তু লঞ্চ ছেড়ে কোথাও যাবার পথ পাননি তিনি। উনি ভেবেছিলেন লঞ্চ থেকে পালিয়ে গিয়ে পুলিস ফোর্স নিয়ে এসে আমাকে গ্রেফতার করবেন। কিন্তু আমার লঞ্চ এখন সাবমেরিনে রূপান্তরিত হয়ে পানির নিচ দিয়ে ছুটছে।'

'বুঝলাম না তো!' শহীদ প্রশ্ন করলো।

কুয়াশা হাসতে হাসতে বললো, 'তোমরা যে আমাকে একবার এই লঞ্চে আর একবার অন্য একটা লঞ্চে পায়চারি করে বেড়াতে দেখেছিলে সে ব্যাপারটার রহস্য কি জানো? রহস্যটা হলো এই যে, যে দুটো লঞ্চে আমাকে তোমরা দেখেছিলে সে দুটো মোটেই লঞ্চ নয়। খোলস মাত্র। শুধু খোলসটা রেখে সাবমেরিন নিয়ে অন্য একটা খোলসে আশ্রয় নিয়েছিলাম আসলে আমি। এখন বুঝতে পেরেছো তো?'

হাসতে হাসতে কামাল বললো, 'ওরে বাপ্‌রে!'

কামালের কথা শেষ হতেই মি. সিম্পসনকে দেখা গেল দরজার সামনে। নিরুপায় হয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। কুয়াশা বললো, 'আমরা এখন শীতলক্ষা নদীতে আছি, মি. সিম্পসন। পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌছে দেবো আপনাদেরকে সদরঘাটে। দেরি করিয়ে দেবার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

হাঁড়িপানা মুখ করে একটা চেয়ার দখল করে বসলেন মি. সিম্পসন একটি কথাও উচ্চারণ না করে। শহীদ ও কামাল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসলো নিঃশব্দে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা সোফা ছেড়ে। পকেট থেকে একটা সাধারণ লাইটার বের করে মি. সিম্পসনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। লাইটারটা মি. সিম্পসনের হাতে দিয়ে বললো, 'আপনাকে সামান্য একটা উপহার দিতে চাই, মি.

সিম্পসন। গ্রহণ করলে বাধিত হবো।'

হাতে নিয়ে একবার লাইটারটার দিকে আর একবার কুয়াশার মুখের দিকে বার কয়েক পালা করে তাকালেন মি. সিম্পসন। তারপর সেটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে কুয়াশার দিকে বাড়িয়ে ধরে গম্ভীর চালে বলে উঠলেন, 'ধন্যবাদ। এরকম লাইটার বাজারে অনেক কিনতে পাওয়া যায়।'

'না, যায় না। বাজারে এরকম লাইটার কিনতে পাওয়া যায় না, মি. সিম্পসন, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। কেননা জিনিসটা দেখতে খুব সাধারণ হলেও এটি আমার নিজের আবিষ্কার।'

একটু হেসে নিয়ে কুয়াশা আবার বলতে শুরু করলো, 'জিনিসটা আসলে লাইটারই নয়। দেখতে যাই হোক, এটা আসলে একটা হ্যাণ্ডবম। মাত্র দু'বার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে পারেন আপনি। কিন্তু তৃতীয়বার জ্বালাবার ঠিক পনেরো সেকেণ্ড পর এটা একটা হাতবোমায় পরিণত হবে। কোনো শত্রুকে যদি আত্মরক্ষার্থে শেষ করে দিতে চান তবে এর আর জুড়ি নেই। তৃতীয়বার জ্বালিয়ে এটা আপনি যেখানেই ফেলবেন সেখানে পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে চার ফুট জায়গা নিয়ে দাউদাউ করে আগুন ধরে যাবে। এবং সেটা হবে বিশেষ এক ধরনের আগুন, যার উচ্ছ্বাস থাকবে সব সময় উপরের দিকে খাড়া। আশপাশে অন্য কেউ বা অন্য কিছু থাকলে কোনো ক্ষতিই হবে না।'

হাতটা টেনে নিলেন মি. সিম্পসন। মনোযোগ দিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ জিনিসটা। তারপর তীক্ষ্ণ এক টুকরো হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে থমথমে গলায় বললেন কুয়াশার দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে, 'এখন, এখন যদি এই হাতবোমাটা তোমার উপরই ছুঁড়ে মারি, কুয়াশা! কি করতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি?'

হাঃ হাঃ করে প্রাণখুলে হাসলো কিছুক্ষণ কুয়াশা মি. সিম্পসনের কথা শুনে। হাসি থামতে বললো, 'কিছুই করতে পারি না সেক্ষেত্রে আমি, মি. সিম্পসন। কিন্তু আমি জানি আপনি তা পারবেন না। ক্ষমতা থাকলেও সে ইচ্ছা আপনার নেই।'

মুখ কাঁচুমাচু করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন মি. সিম্পসন। ধরা পড়ে গেছেন তিনি। কুয়াশার প্রতি তাঁর যে দুর্বলতা আছে, কুয়াশার প্রতি তাঁর মনের নিভৃত কোনায় যে একরাশ সহানুভূতিবোধ জন্মে গেছে তা নিজেরই বোকামির ফলে প্রকাশ হয়ে পড়বে ভাবেননি তিনি।

মি. সিম্পসনের ঠিক এই দুর্বল মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিল কুয়াশা। হঠাৎ সে শহীদ ও কামালকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল সেই প্রস্তাব দিয়ে বসলো। পরিশেষে বললো, 'যাবেন, মি. সিম্পসন, চলুন না, পৃথিবীটাকে আবিষ্কার করি আমরা সবাই মিলেমিশে। যাবেন?'

'কি যে বলো তুমি, কুয়াশা!'

স্ব-মহিমায় ফিরে আসতে পেরে আনন্দিত হলেন মি. সিম্পসন। বললেন

'ওসব করতে গেলে কি আর আমাদের চলে। আমাদের উপর নির্ভর করে ওসবের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব যে আমাদের উপর নির্ভর করছে, তা বুঝি বুঝতে পারছো না? তা না হলে তোমার মতো রথী-মহারথীরা যে স্বর্গ মনে করে বসবে এই পৃথিবীটাকে। তা কি হতে দেয়া যায়?'

কুয়াশাকে ব্যঙ্গ করতে পেরেছেন ভেবে তৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুললেন মি. সিম্পসন।

কুয়াশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লঞ্চঘাটে নেমে পড়লো ওরা তিনজন। ঘাটে উঠে খানিকদূর গিয়েই মি. সিম্পসন বললেন, 'তোমরা যাও, শহীদ, আমার একটা কাজ আছে শ্যামবাজারের দিকে। ফিরতে দেরি হবে।'

শহীদ ও কামালের মধ্যে আড়চোখে তাকিয়ে কি একটা ইঙ্গিত বিনিময় হলো। তারপর মি. সিম্পসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভালমানুষের মতো চলে গেল ওরা।

ওরা বেশ খানিকটা দূরে চলে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। দ্রুত পদক্ষেপে ফিরে চললেন তিনি লঞ্চঘাটের দিকেই।

ঘাটের কাছাকাছি এসে গতি মন্থর করলেন মি. সিম্পসন। ধীরে ধীরে হেঁটে, যেন সারাদিন মিস্তিগিরি করে ভীষণ ক্লান্ত, ঘাটের একটা সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়লেন। এবং আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন অদূরে দণ্ডায়মান একজন মানুষকে।

দণ্ডায়মান মানুষটি যে একজন জার্মান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কুয়াশার লঞ্চের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মি. সিম্পসন শহীদ ও কামালের সাথে কুয়াশার লঞ্চ থেকে নেমেই লোকটাকে ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছিলেন। তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল তাঁর। শহীদ ও কামালকে মিথ্যে কথা বলে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা ভালভাবে জানার জন্যেই ফিরে এসেছেন তিনি।

দশমিনিট, বিশমিনিট, আধঘন্টা, একঘন্টা···দু'ঘন্টা, আড়াই ঘন্টা,···পুরো আড়াই ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইলো জার্মান লোকটা কুয়াশার লঞ্চের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে। অগত্যা মি. সিম্পসনকেও বসে থাকতে হলো। আড়াই ঘন্টা পর ফিরে চললো লোকটা লিয়াকত অ্যাভিনিউয়ের দিকে। মি. সিম্পসনও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চললেন লোকটাকে।

পুরানো শহরের একটা বাড়িতে ঢুকলো লোকটা অনেক গলিঘুঁজি অতিক্রম করে। পিছন পিছন গিয়ে চিনে রাখলেন মি. সিম্পসন বাড়িটা। নাম্বারটাও টুকে নিলেন। তারপর থানায় ফিরেই একজন ইনফর্মারকে পাঠিয়ে দিলেন সাদা

পোশাকে চব্বিশ ঘন্টা বাড়িটার উপর নজর রাখার জরুরী নির্দেশ দিয়ে।

থানা থেকে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে এসেও স্বস্তি পেলেন না মি. সিম্পসন। সারাক্ষণ কি একটা দুশ্চিন্তা যেন তাঁকে ছটফটিয়ে মারছে। সে রাতে ভালো করে ঘুম হলো না তাঁর।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শেল্‌ফের উপর রাখা টেলিফোনটা তুলে নিলেন মি. সিম্পসন। ধীরে ধীরে শহীদের নাম্বারে ডায়াল করলেন। কিন্তু কানে না ঠেকিয়ে ফোনটা যথাস্থানে রেখে দিলেন আবার। কি একটা সঙ্কোচবোধে ইতস্তত করছেন তিনি। স্বস্তিও পাচ্ছেন না চুপচাপ বসে থাকতে।

দাড়ি কামাতে গিয়ে আজ গাল কেটে ফেললেন মি. সিম্পসন অন্যমনস্কতার জন্যে। কাক-স্নানটা কোনরকমে সেরে নিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসলেন, এবং অর্ধভুক্ত অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফোনটার দিকে এগিয়ে গেলেন আবার।

শহীদকে বাড়িতেই পেলেন মি. সিম্পসন।

'কি খবর শহীদ, তোমরা তাহলে যাচ্ছো কবে বলো তো?'

ওপার থেকে শহীদ বললো, 'আগামীকাল রওনা হবো আমরা, মি. সিম্পসন। কিন্তু হঠাৎ আপনি একথা জানতে চাইছেন যে? মত পরিবর্তন করলেন নাকি? যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

গম্ভীর স্বরে বললেন মি. সিম্পসন, 'পাগল আর কি! আমি কি ছেলেমানুষ যে এতো সহজে মত পরিবর্তন করবো? একবার যখন বলেছি যাবো না, তারপর আর মত পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। তোমাদের যাবার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, সত্যিসত্যি তোমরা যাচ্ছো কিনা সে কথা জানতে।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো শহীদের সঙ্গে। তবে সে সব মামুলি কথা। মি. সিম্পসন ফোন ছেড়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে ফিরতে যাবেন ঠিক এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো চমকে দিয়ে।

গতরাতে যে ইনফর্মারটাকে নিযুক্ত করেছিলেন তারই ফোন। ফোনে সে জানালো, 'যে বাড়িটার উপর নজর রেখেছিল সে সেই বাড়িটা থেকে একজন ইউরোপিয়ান লোক সকালে বের হয়ে নারায়ণগঞ্জে যায়। সেখানে একটা সী-প্লেন অপেক্ষা করছিল সম্ভবতঃ তারই জন্যে। লোকটা সী-প্লেনে চড়ে চলে যায় তারপর।'

ব্রেকফাস্ট করা আর হলো না মি. সিম্পসনের। ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন তিনি। কপালে তাঁর ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার রেখা। কি এক দুশ্চিন্তায় ছটফটিয়ে মরছেন যেন তিনি।

পায়চারি থামিয়ে টেবিলের সামনে বসে কাগজ-কলম নিয়ে একটা চিঠি লিখলেন মি. সিম্পসন। কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে পুলিস কমিশনারের

কাছে পাঠিয়ে দিলেন তখুনি চিঠিটা। তারপর ফোনটা তুলে নিয়ে বিশেষ এক নাম্বারে ডায়াল করলেন। অপর প্রান্তে কেউ ফোন ধরতেই বললেন তিনি, 'শীতলক্ষার উপর দিয়ে একটা সী-প্লেন যাচ্ছে। খুব বেশি দূর সেটা যেতে পারেনি এখনও। কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে ওটার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ মনোযোগ রাখা হোক। আর আমার জন্যে জলপুলিসের একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করা হোক আধঘন্টার মধ্যে। আমি এই সময়ের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হচ্ছি।

উপরোক্ত নির্দেশ দেবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো মি. সিম্পসনের। ঝটপট কাপড়-চোপড় পরে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

ছয়

বঙ্গোপসাগরের কূলে নির্জন বালুকাবেলা। ক্ষুদ্র একটা লঞ্চ 'সৈনিক' সাগরে ভাসছে একাকী। ক্ষুদ্র, নড়বড়ে লঞ্চটা প্রতীক্ষা করছে সুদূরের পানে যাত্রার। ক্ষুদ্র, ঝক্কড়মার্কা একটা লঞ্চ বলাই স্বাভাবিক এটাকে। আসলে কিন্তু এটা একটা ক্ষুদ্র জলচর-দানব বিশেষ। সুপার সাবমেরিন। জলের গভীরতম তলদেশেও এর গতিবিধি সহজ এবং স্বাভাবিক রাখা যায়।

এমন সময় ভাল্‌ভ ওঠাবার শব্দ পাওয়া গেল 'সৈনিকের' ভিতর থেকে। তাপ সরবরাহ শুরু করলো নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর। সর্বশক্তি যোগ করলো টারবাইনগুলো নিজ নিজ কাজে। প্রপেলার ঘুরতে লাগলো পানিতে দারুণ তোলপাড় তুলে। যাত্রা হলো শুরু।

শুরু হলো দুঃসাহসী একদল মানুষের দুর্গমের পথে যাত্রা। মানবকল্যাণের স্বার্থে বিদেশী একজন প্রতিভাবান বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানবপ্রেমিক একদল দুর্ধর্ষ মানব যাত্রা শুরু করলো সুদূরে। বহুদূরে, সুদীর্ঘ ষোলো হাজার মাইল দূরে-দক্ষিণ আমেরিকার পেরু নামক দেশের কোনো এক দুর্গম পাহাড়তলীতে।

টিপটপ ছিলো সব ব্যবস্থা। শহীদ, কামাল, মহুয়া ও গফুর তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল বাড়িতে। কুয়াশা নিজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল শহীদের বাড়িতে। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সকলকে এই নির্জন বালুকাবেলায়। বঙ্গোপসাগরের কূলে।

এখানেই নোঙর করা ছিলো কুয়াশার ক্ষুদ্রাকৃতি জলচর দানব 'সৈনিক'। সুন্দরবন ঘুরে, সতর্কতা অবলম্বন করে ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিল কুয়াশা। সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ কারণও ছিলো। বিদেশী শত্রু যে এখনও তার পিছু পিছু ভয়ঙ্কর একটা সর্বনাশ করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে তা কুয়াশা

ভালভাবেই জানতো। তাছাড়া তাকে গ্রেফতার করার জন্যে মি. সিম্পসনের মতো জেদি এবং ধুরন্ধর পুলিস অফিসার তো আছেনই। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন ছিলোই। সতর্কতা অবলম্বনে ত্রুটিও কুয়াশা রাখেনি। কিন্তু কেউই জানতো না কি ভয়ঙ্কর, রহস্যপূর্ণ ব্যাপারই না ঘটে গেছে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে।

বিপদটা ওরা জানতো না। জানলোও না পুরো পাঁচ ঘন্টা। যখন জানতে পারলো তখন আর কিছু করার নেই সাবধান হবার জন্যে। বুদ্ধি খাটিয়ে আত্মরক্ষা করা ছাড়া তখন আর উপায় নেই কোনো।

ঘন্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে এগোচ্ছিল সৈনিক।

জ্যোৎস্নাভরা মায়াময় রাত। সম্মুখে বিস্তারিত অতল সাগর। বিপুল জলরাশির উপর চন্দ্রকিরণ বিছিয়ে পড়েছে। সুউচ্চ ঢেউ উঠছে একটার পর একটা। ঢেউয়ের উপরে ঢেউ পড়ে ভেঙে যাচ্ছে। চূর্ণবিচূর্ণ জলরাশির উপর মায়াময় চাঁদের আলো পড়ে চিকচিকিয়ে উঠছে। চারদিকে মৃদু একটা গতিময় গর্জন।

নাতিপ্রবল সমীরণের শীতল স্পর্শ ডেকে বসে উপভোগ করছিল ওরা। কুয়াশা ছিলো না ওদের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়ার পাট বেশ খানিকক্ষণ আগে চুকে গেছে। কামালের বারবার অনুরোধে একটা আধুনিক বাংলা গান শেষ করে সবেমাত্র মাথা নিচু করেছে মহুয়া মেয়েলী লজ্জায়। এমন সময় কুয়াশা এসে বসলো ওদের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

'দাদা, অনেকদিন তোমার সরোদ শুনিনি। বাজাবে তুমি, শুনবো আমরা?' কুয়াশাকে বসতে দেখে মহুয়া বললো আবদারের সুরে।

চুপচাপ বসেছিল শহীদ। কুয়াশা মহুয়ার কথার উত্তর দিলো না দেখে মুখ তুলে তাকালো সে। দেখলো হঠাৎ নিজের হাতের রিস্টওয়াচটার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছে কুয়াশা। এবং কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। সকলের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত স্বরে বললো, 'তোমরা একটু বসো, আমি আসছি একটু পর।'

কথাটা বলেই চলে গেল কুয়াশা তার কেবিনের দিকে। কেউ তেমন করে লক্ষ্য না করলেও শহীদের দৃষ্টি এড়ালো না কুয়াশার বিচলিত মুখ-ভঙ্গি।

'দাদামণি!'

খাওয়া-দাওয়া সবেমাত্র শেষ করে শহীদের পিছনে এসে দাঁড়ালো গফুর। এসেই দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে ডাকলো শহীদকে। শহীদ কি যেন ভাবছিল কুয়াশার কেবিনের দিকে তাকিয়ে। শুনতে পেলো না সে গফুরের কণ্ঠস্বর। গফুর আবার ডাকলো, 'দাদামণি!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো এবার শহীদ উত্তর না দিয়ে।

'দাদামণি, একটা কথা বলবো?' মাথার পিছনের চুলগুলো খামোকা নাড়তে নাড়তে গফুর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বললো।

'তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।' নড়েচড়ে বসলো শহীদ, 'যা বলবার বলে ফেল দেখি ঘাড় না চুলকে।'

'না দাদামণি, ব্যাপারটা হাসির নয় কিনা, যদি হেসে ফেলো, তাই বলছিলাম···

এবার সত্যিসত্যি হেসে ফেললো শহীদ।

কামাল ঠাট্টা করে বললো, 'কি যে বলো তুমি গোবর্ধন, তোমার কথায় আমরা কি হাসতে পারি?'

কামালের কথা শুনে মহুয়াও হাসি চাপতে পারলো না। সকলকে এভাবে হাসতে দেখে ঘাবড়ালো না গফুর। কিন্তু অভিমান হলো তার। ফলে গাল দুটো ফুলে উঠলো ফোলা বেলুনের মতো। ফোলা গাল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো চলে যাবার জন্যে আর একটিও কথা না বলে।

শহীদ তাড়া দিয়ে বললো, 'এই হাঁদারাম, দাঁড়া! একটা কথা বলতে এতো ভড়ং কেন বলতো তোর? এবার বলে ফেল দেখি কি এমন কথা তোর।'

ফোলা গাল নিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ালো গফুর। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শুধু বললো, 'রান্নাঘর থেকে পরোটা চুরি গেছে চারটে।'

তিনজনই ভ্রূ কুঁচকে তাকালো গফুরের দিকে। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড কারো মুখেই কথা সরলো না কোনো। এক পা এগিয়ে এলো গফুর। মনোযোগ দিয়ে তাকালো সকলের মুখের দিকে। তারপর গম্ভীরমত গলা করে বললো, 'বিশ্বাস তো করবে না, তাই বলতে চাইনি। কিন্তু সত্যি বলছি, দাদামণি, চার-চারটে পরোটা চুরি গেছে মিটসেফ থেকে। আর মিটসেফের ওপরে এক গ্লাস পানি রাখা ছিলো, সেটাও পাচ্ছি না।'

'তুই বুঝি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি গফুর?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো কামাল।

'তাই-ই হবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে,' বললো মহুয়া।

'বিশ্বাস না হয় তো দেখবে চলো দাদামণি, আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি।'

শেষ চেষ্টা করে দেখলো গফুর। শহীদ এখনও কিছু বলেনি। হাসেওনি ওদের মতো। সুতরাং গফুর শহীদের দিকে এগিয়ে এলো আরো এক পা।

শহীদ শান্ত কণ্ঠে বললো, 'কি দেখবো বলতো তোর সঙ্গে গিয়ে?'

'মোট বাইশটা পরোটা বানিয়েছিলাম, দাদামণি। তোমাদের খাবার পর ছিলো ন'টা। তার থেকে আমার জন্যে ছিলো পাঁচটা। ন'টা থেকে পাঁচটা বাদ গেলে তো চারটেই থাকে। কিন্তু দেখবে চলো তুমি, আর একটাও নেই পরোটা। মিটসেফের ওপর পানি ভর্তি গ্লাসটাও নেই।'

শহীদ বললো, 'তোর ভাগের পাঁচটা পরোটা তুই খেয়েছিস?'

একটু থেমে গফুর বললো, 'হ্যাঁ।'

'বাকি অংশ থেকে ক'টা খেয়েছিস ঠিক বলতো?'

সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকালো এবার গফুর শহীদের দিকে। কিন্তু মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না সে। তারপর নিরস কণ্ঠে বললো, 'একটিও না।'

'ঠিক বলছিস?'

ছোট্ট, গম্ভীর উত্তর গফুরের, 'হ্যাঁ।'

শহীদ বললো, 'তাহলে তোর সমস্যাটা হচ্ছে এই যে পরোটাগুলো গেল কোথায়, তাই না রে?'

গফুর কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলো।

'পরোটাগুলো ইঁদুরের পেটে গেছে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কেমন?'

'না, দাদামণি, চারটে পরোটা ইঁদুরে নিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া পানির গ্লাসটা নিয়ে যাবে কিভাবে? আর আমি কেমন একটা কালো ছায়া মতো দেখলাম যে...'

'পরোটাগুলো ইঁদুরেই নিয়ে গেছে। আর গ্লাসের পানিটুকু খেয়ে গ্লাসটা এমন জায়গায় রেখেছিস যে এখন আর খুঁজে পাচ্ছিস না সেটা। যা ভাগ্ এখান থেকে, আর বকাসনে।'

কথাটা বলে শহীদ পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে গেল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো গফুর। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে যেতে যেতে নিজের কথা বলতে ছাড়লো না, 'আমার কথা তোমরা উড়িয়ে দিলে, দাদামণি, কিন্তু কাজটা ভালো করলে না। দেখো, বিপদ একটা হবেই।'

সিগারেটটা ধরাবার জন্যে লাইটারটা জ্বালিয়ে মুখের সামনে এনেছিল শহীদ। কিন্তু ধরানো আর হলো না। সামান্য একটু চমকে উঠে গফুরের দিকে তাকালো সে। চলে যাচ্ছে গফুর দুপদাপ শব্দ তুলে। পিছু ডাকলো না শহীদ। কিন্তু গফুরের গলা শুনে কেমন যেন খটকা লেগেছে তার। এই প্রথমবারের মতো শহীদ ভাবলো-সত্যিই কি ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ? গফুরের কথাটা কি না দেখে না জেনে উড়িয়ে দেয়া উচিত হলো?

সাত

গফুর চলে যেতে গম্ভীর পদক্ষেপে ফিরে এলো কুয়াশা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো শহীদ কুয়াশার দিকে। কুয়াশা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তার পরিত্যক্ত চেয়ারটার পিছনে দাঁড়ালো। তারপর শহীদের দিকে তাকিয়ে থমথমে উচ্চারণে বললো, 'একটা বড় ধরনের বিপদ আমাদের পিছন পিছন ঘনিয়ে আসছে শহীদ।

শত্রু আমাদেরকে অনুসরণ করছে। একটা বিরাট আকৃতির সাবমেরিন। পঞ্চাশ মাইল গতিতে ছুটে আসছে।'

চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো সবাই। মহুয়ার চোখেমুখে দারুণ ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো। কামাল শহীদের দিকে তাকালো বিচলিত হয়ে।

'কারা এরা?' কুয়াশার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো শহীদ।

'সাবমেরিনটা জার্মান মেড তা আমি জানি। তার মানে এরাই সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের শত্রু। অর্থাৎ আমাদেরও শত্রু। কেননা বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করতে চলেছি আমরা।'

'বুঝলাম। ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল আসছে, না? পঞ্চাশই কি ম্যাক্সিমাম স্পীড?'

'তার বেশি হবে বলে মনে হয় না। পানির উপরে ওদের চেয়ে আমাদের স্পীড পাঁচ মাইল বেশি। কিন্তু পানির নিচে ওদের চেয়ে আমাদের স্পীড পাঁচ মাইল কমে যাবে।'

শহীদ বললো, 'তার মানে ফুল স্পীডে আসছে ওরা। কতটা পিছনে আছে ওরা এখন, টর্পেডোর পাল্লার মধ্যে নেই তো?'

কুয়াশা বললো, 'খুব বেশি পিছনে নেই ওরা। কুড়ি-পঁচিশ মাইল খুব বেশি হলে। আমাদের মতো টর্পেডো যদি ওদের থেকে থাকে, তাহলে ওদের পাল্লার মধ্যেই আছি আমরা ধরে নিতে হবে।'

'আমরা এখন কতো স্পীডে যাচ্ছি?' প্রশ্ন করলো কামাল।

'পঞ্চান্ন।'

এতক্ষণে মহুয়ার ভীত স্বর শোনা গেল, 'কি হবে, দাদা!'

কুয়াশা অভয় দিয়ে বললো, 'ভয় কি রে, মহুয়া, তোর দাদা থাকতে দুশ্চিন্তার বোঝাটা কি আর কাউকে বইতে হবে? নির্ভয়ে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি যখন তখন তোদেরকে সবরকম বিপদ থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থাও করে রেখেছি। ভয় পাসনে।'

মুহূর্তের মধ্যে ভয় এবং দুশ্চিন্তার রেখাগুলো উবে গেল মহুয়ার মুখ থেকে। পরম শ্রদ্ধায় দাদার দিকে লজ্জিত হাসি হেসে তাকালো সে। তারপর নিচু স্বরে বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, দাদা। এমনটি আর হবে না।'

মিটিমিটি হেসে এগিয়ে এলো কুয়াশা। মহুয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে একটা হাত রাখলো তার মাথায়। বললো, 'যা, নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করগে।'

গভীর আনন্দে মাথা তুলে তাকালো মহুয়া একবার তার দাদার দিকে। তারপর মাথা নেড়ে ধীর পদক্ষেপে চলে গেল একা। কোনো ভয় নেই এখন আর তার মনে। কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

'কি প্রোটেকশন নেয়া উচিত আমাদের?' মহুয়া চলে যেতে প্রশ্ন করলো শহীদ।

কুয়াশা বললো, 'বিশেষ তেমন কিছু এই মুহূর্তে দরকার নেই। ম্যাক্সিমাম স্পীড বজায় থাক। আর ইতিমধ্যেই অ্যান্টি-টর্পেডোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যস।'

শহীদ বললো, 'কিন্তু এভাবে তাড়া খেয়ে কতদূর অব্দি যাবো আমরা? পিছন পিছন ওরা যদি আসতেই থাকে তবে তো বিপদ।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কুয়াশা বললো, 'আজ রাতটা দেখবো আমি। কাল সকাল অব্দি যদি পিছু না ছাড়ে তবে কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। সকাল না হলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি পরিমাণ শক্তিশালী ওরা।'

'সকাল অব্দি পিছু না ছাড়লে কি করবে বলে ভেবেছো?' নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জানতে চাইলো শহীদ।

কুয়াশা শহীদের দিকে তাকিয়ে থাকলো একমুহূর্ত। তারপর বললো, 'ধোঁকা দিয়ে ভুল পথে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। অন্যকিছু করার শক্তি আমাদের হাতে থাকলেও তেমন কিছু করা চলবে না। করলে যতগুলো প্রাণী আছে ওই সাবমেরিনে সবগুলো সলিলসমাধী লাভ করবে। ঘৃণ্য নরহত্যাই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত তাহলে।'

মাথা হেঁট করে চিন্তা করতে করতে শহীদ শুধু বললো, 'হুঁ!'

'এবার তোমরা যাও, শুয়ে পড়োগে। আশা করি কাল সকালে তোমাদেরকে সুখবরই দিতে পারবো,' কথাটা বলে চলে যেতে উদ্যত হলো কুয়াশা।

'একটা কথা...'

শহীদের ডাকে ফিরলো কুয়াশা।

'প্রয়োজন পড়লে আমাদের ডাকতে দ্বিধা করো না। সারারাত জেগে যদি সতর্ক থাকতে হয় তবে সবাই ভাগাভাগি করেই জেগে কাটিয়ে দেবো রাতটা।'

'তার কোনো প্রয়োজন নেই, শহীদ। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়োগে তোমরা।'

আর কোনো কথা না বলে শহীদ ও কামাল যার যার কেবিনের দিকে চলে গেল ধীরে ধীরে। ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতেই দ্রুত পায়ে নিজের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। ঠিক এমনি সময়ে শহীদ যদি কুয়াশার মুখ দেখতে পেতো তাহলে উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারতো না সে। অস্বাভাবিক গম্ভীর, কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা কুয়াশার সারামুখে ফুটে উঠেছে। কি যেন অনুমান করার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছে না কোনমতেই।

কেবিনের দরজা অতিক্রম করে ঢুকে পড়লো কুয়াশা। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না ডেকের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের একজনের চোখে সতর্ক দৃষ্টি। অপরজনের চোখ প্রতিহিংসার অনলে দাউ দাউ করে জ্বলছে যেন!

আট

মধ্যরাত।

কন্ট্রোলরুমে ঢুকে দরজার পাশে রাখা একটা নারীমূর্তির কপালের লাল রঙের টিপে চাপ দিতেই ঘড়ঘড় শব্দ হলো একটা। দেখতে না দেখতে কন্ট্রোলরুমের বাম পাশের দেয়ালটা মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে গেল খানিকটা। দেয়ালের ওদিক থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো এদিকে। ফাঁকটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের টেবিল এদিক ওদিক দাঁড় করানো। টেবিলের উপর অদ্ভুত সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থরে থরে সাজানো। ঢুকে পড়লো কুয়াশা ফাঁকটা দিয়ে। দেয়ালটা আবার ঘড়ঘড় শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকের রুমটায় ঢুকেই এগিয়ে গেল কুয়াশা রাডার স্ক্রীনের দিকে। রাডার স্ক্রীনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো কুয়াশা। ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো তার অবিশ্বাসে। দ্রুত পায়ে অদ্ভুত একটা যন্ত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ঝুঁকে দেখলো পিছনের সাবমেরিন আগের গতিতেই ছুটছে। ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল। কিন্তু শত্রুপক্ষের সাবমেরিন তাহলে এতো কাছে এগিয়ে আসে কিভাবে? রাডার স্ক্রীন তো মিথ্যে কথা বলবে না। ছুটে চলে এলো কুয়াশা এদিকের রুমটায়। স্পীডোমিটারের কাঁটা দেখলো ঝুঁকে। পঁয়তাল্লিশ! পঁয়তাল্লিশে নেমে এলো কিভাবে স্পীড? কে নামালো?

মিথ্যা দুশ্চিন্তা করে নষ্ট করবার সময় নয় এটা। চট্ করে স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে একটা স্টীলের স্যুটকেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। পকেট থেকে ডাবল এম চাবি বের করে খুলে ফেললো তালা। ফড়িং-এর মতো দেখতে আধগজ লম্বা কয়েকটা 'ইনোসেন্ট মিউজিশিয়ান' বের করে হাতে নিলো কুয়াশা। তারপর স্যুটকেসের তালা বন্ধ করে কেবিন থেকে বের হতে গিয়ে আর একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা তাকে স্তম্ভিত করে দিলো। কুয়াশা দেখলো অ্যান্টি-টর্পেডো নিক্ষেপ করার জন্যে যে সুইচ বোর্ডটা ব্যবহার করার নিয়ম সেটা ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে একদিকে।

দারুণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো কুয়াশা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না যেন সে।

কিন্তু সময় খুব মূল্যবান এখন। ধাওয়া করে আসছে শত্রুপক্ষের সাবমেরিন। মাইল পাঁচেকও পিছিয়ে নেই আর। টর্পেডো হেনে যে কোনো মুহূর্তে সর্বনাশ করতে পারে। প্রায় ছুটে বের হয়ে এলো কুয়াশা কন্ট্রোলরুম থেকে। ডেকের একপাশে তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি। টপাটপ সিঁড়ি টপকে সৈনিকের সবচেয়ে উঁচু

এবং শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা।

ফড়িংয়ের মতো দেখতে আধগজ লম্বা জিনিসগুলো একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেললো কুয়াশা সমুদ্রে। ফেলবার আগে প্রত্যেকটার গা থেকে খুঁজে খুঁজে একটা সরু অথচ শক্ত তামার তার টেনে বের করলো খানিকটা করে। তারপর ছুঁড়ে ফেললো পানিতে একে একে সবকটা।

ফড়িংয়ের মতো দেখতে অদ্ভুত এই আধগজী জিনিসগুলো সত্যিই অবিশ্বাস্য কার্যকরী। এটার তার টেনে নিয়ে পানিতে নিক্ষেপ করলে পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে এর গতি দাঁড়াবে ঘন্টায় পঁচিশ মাইল। নিচের দিকে মুখ করে পড়বে এটা পানিতে। তামার তারটা টেনে বের করার প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে কোনদিকে এর গতি হবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ছুটতে ছুটতে অসম্ভব জোরালো শব্দ এবং কম্পন সৃষ্টি করবে এটা সমুদ্রে। ঠিক মনে হবে কোনো জলযান ছুটে যাচ্ছে। ফলে কোনো শত্রুপক্ষীয় জলযান যদি পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে যদি ভুল পথে পরিচালিত করার ইচ্ছা থাকে তবে এর চেয়ে ভালো কোনো পন্থা হতে পারে না। অনুসরণকারী জলযানটিকে ঠিক ধোঁকা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবে অন্তত চল্লিশ মাইল দূরে। দেড়ঘন্টারও বেশি এর কর্মক্ষমতা। কুয়াশা এর নাম দিয়েছে 'ইনোসেন্ট মিউজিশিয়ান'।

শীত লেগে ঘুম ভেঙে গেল শহীদের। পায়ের কাছে একটা চাদর আছে মনে করে চোখ বুজেই পা দিয়ে সেটা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরও পায়ের আওতার মধ্যে চাদরটা না পেয়ে অগত্যা তাকে চোখ মেলতে হলো।

ঘুটঘুটে অন্ধকার কেবিনের ভিতর। অন্ধকার কেন?

ধড়মড় করে উঠে বসলো শহীদ। জিরো পাওয়ারের বাল্‌ব্ জ্বলছিল, ঘুমাবার আগে স্পষ্ট মনে আছে তার। বাল্‌ব্‌টা এখন জ্বলছে না কেন তবে? মহুয়া উঠেছিল নাকি এর মধ্যে? চোখে আলো সহ্য না হতে অফ করে দিয়েছে বুঝি?

রেডিয়াম ডায়াল রিস্টওয়াচটা বালিশের তলা থেকে বের করলো শহীদ। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলা যায়। পৌনে চারটে বাজে।

'বাতি অফ করলে কেন?' নিদ্রাজড়িত মহুয়ার গলা। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার শহীদের নড়াচড়ার শব্দে।

'তার মানে! তুমি অফ করোনি সুইচ? আমি ভাবছিলাম তুমিই বুঝি…'

'না তো।'

আর কথা না বলে পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে জ্বাললো শহীদ। প্রথমেই দৃষ্টি পড়লো তার পায়ের দিকে। কই, চাদরটা দেখা যাচ্ছে না তো! ঠিক এমনি সময় মনে পড়লো শহীদের শীত লাগবার তো কোনো কারণ নেই। এয়ার-কণ্ডিশন করা কেবিন। নিউক্লিয়ার জেনারেটর থেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ না হলে তো কিংবা

কুয়াশা কি কোনো কারণে ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে?

'চাদরটা কোথায় বলো তো? দেখছি না যে।'

উঠে বসলো মহুয়া। গায়ের কাপড় ঠিক করতে করতে সে বললো, 'চাদর তো ছিলো না। আমিই তো আগে ঘরে ঢুকেছিলাম, কই, চাদর দেখিনি।'

'বলো কি, মহুয়া! স্পষ্ট মনে আছে আমার বিছানায় চাদর দেখেছি আমি।'

'কখন?'

'সন্ধ্যার পরই সম্ভবতঃ।'

'সন্ধ্যার পর দেখেছো বলছো? কিন্তু আমি তো ঘরে ঢুকে দেখিনি চাদর?'

নিস্তব্ধ কয়েকটি মহূর্ত কেটে গেল। দুজনেরই মনে পড়লো আচমকা-গফুর বলেছিল রান্নাঘর থেকে চারটে পরোটা এবং এক গ্লাস পানি কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর মহুয়া বললো, 'ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ হলো কেন?'

'সে কথাই ভাবছি।'

'আমার মনে হয়...'

'চুপ্!'

চাপা গলায় সতর্ক করে দিলো শহীদ মহুয়াকে। তারপর ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললো, 'কান পেতে শোনো তো কারা যেন কথা বলছে কেবিনের বাইরে।'

শব্দহীন কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

এক সময় ফিসফিস করে মহুয়া বললো শহীদের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে দরজার পাশে কারা যেন কথা বলছে, আবার মনে হচ্ছে কানের ভুল।'

নেমে পড়লো শহীদ বিছানা থেকে নিঃশব্দ পায়ে। বালিশের তলা থেকে আগেই সে রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়েছে। দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে একটা বন্ধ জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। তারপর পাল্লা দুটো ধীরে ধীরে খুলে ফেললো এতটুকু শব্দ না করে।

চাঁদ এখনও সমুদ্রের পশ্চিম কোণ থেকে রহস্যময় মৃদু হাসি ছড়াচ্ছে। তারই এক চিলতে রহস্যঘন আলো এসে পড়লো কেবিনের ভিতর। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শহীদ বাইরের দিকে। কোনো শব্দ হচ্ছে না এখন। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না কোথাও।

কি করবে ভাবছিল শহীদ। আচমকা কি দেখে দৃষ্টিটা তার তীক্ষ্নতর হয়ে উঠলো। ছায়া! একটা মানুষের ছায়া এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বামদিকের খালি কেবিনগুলোর দিকে চলে গেল অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে যেতেও বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো শহীদ আরো কিছুক্ষণ।

কার ছায়া ওটা? কে ও?

মহুয়া এসে দাঁড়ালো শহীদের পিছনে। 'কিছু দেখতে পেলে?'

মহুয়া আতঙ্কগ্রস্ত হবে বলে মিথ্যে কথা বললো শহীদ, 'না, বাইরে বের হয়ে দেখতে হবে একবার।' কথাটা বলে জানালার পাশ থেকে সরে এলো শহীদ।

'একা এই অন্ধকারে থাকতে পারবো না বাপু আমি, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

জামাটা গায়ে চড়াতে চড়াতে শহীদ বললো, 'চলো।'

বের হয়ে এসে বাইরে থেকে লকআপ করলো শহীদ কেবিনটা। এক হাতে টর্চ এবং অপর হাতে রিভলভার নিয়ে আগে আগে এগোল সে। পিছনে মহুয়া। বামদিকের কেবিনগুলোর দিকে হাঁটছিল ওরা। কিন্তু বেশিদূর আর যেতে হলো না। মাত্র গোটা পাঁচ সাত কদম হেঁটেছে এমন সময় গফুরের গগনবিদারী আর্তনাদ সাগরমাঝের রাতের নির্জন নিস্তব্ধতাকে চিরে-কেটে বীভৎস করে তুললো, 'দাদামণি বাঁচাও! শয়তানটাকে ধরে ফেলেছি!! বাঁচাও!!! দাদামণি…'

নয়

'মাগো!'হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড চিৎকার শুনে ভয়ার্ত একটা শব্দ বের হলো মহুয়ার কণ্ঠ চিরে।

'ডান দিকে, আমার পিছু পিছু দৌড়াও!'

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলো শহীদ। তখনো একই ভাবে চিৎকার করে চলেছে গফুর। শহীদ কিচেন রুমের কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পেলো খানিকটা দূরে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে দু'জন লোকের। তাদের মধ্যে একজন গফুর তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না শহীদের। আর অপরজনটি নিশ্চয়ই কোনো শত্রু। ধরা পড়ে গেছে গফুরের হাতে। কিন্তু আরো খানিকটা এগিয়ে যাবার পর টর্চের তীব্র আলো ফেলে শহীদ যা দেখলো তাতে রীতিমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে।

শহীদ দেখলো খালি গায়ে দশাসই গফুর কামালকে ঠেসে ধরেছে একটা কেবিনের দেয়ালের সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে। আর প্রাণপণ শক্তিতে গফুরকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে কামাল। কিন্তু কোনক্রমেই গফুরের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠছে না সে। গফুর তার মুখে একটা হাতের চেটোর সম্পূর্ণ চাপ দিয়ে ঠেসে ধরেছে দেয়ালের সঙ্গে। কোনমতে ছাড়ছে না। ফলে মুখ দিয়ে কথাও বের হচ্ছে না কামালের।

ছাড়াবার জন্যে দু'পা এগিয়েছে শহীদ, এমন সময় দীর্ঘ একটা ছায়াকে

এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল–কুয়াশা আসছে।

'গফুর!'

প্রচণ্ড ধমকের শব্দে চমকে উঠলো গফুর। ধমকের তোড়ে কামালকে ছেড়ে দিয়ে শহীদের দিকে তাকালো সে।

'কি, হচ্ছে কি?'

কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো শহীদ। বিচলিত হয়ে তাকালো গফুর যে লোকটাকে সে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল তার দিকে। তাকিয়েই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো বেচারা, 'কামালদা, আপনি!'

তিক্ত, কর্কশ কণ্ঠে কামাল খেঁকিয়ে উঠলো, 'কামালদা, আপনি! কোথাও কিছু নেই ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লি কেন শুনি?'

গফুর হতভম্ব। নিরুত্তর।

'কি ব্যাপার, শহীদ?' কুয়াশা এসে দাঁড়ালো সকলের মাঝে।

শহীদ বললো, 'বুঝতে পারছি না এখনও। সম্ভবতঃ অন্য কেউ মনে করে গফুর কামালকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠেছিল অন্ধকারে।'

শহীদের কথা শেষ হতেই কামাল তিক্ত কণ্ঠে শুরু করলো, 'ঠাণ্ডা লেগে ঘুম ভেঙে যেতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি কার একটা ছায়া হেঁটে চলে গেল কিচেনরুমের দিকে। ভীষণ সন্দেহ হলো আমার। "সৈনিকে" আমরা ছাড়াও যে অজ্ঞাত পরিচয় কোনো লোক থাকতে পারে তা বিশ্বাস হচ্ছিলো না। কিন্তু স্বচক্ষে যা দেখছি তা তো অবিশ্বাসও করা যায় না। তাই কেবিন থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এদিকে আসছিলাম ব্যাপারটা জানতে। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে দাঁড়াতেই ওই হাঁদারাম উল্লুক পিছন থেকে লাফ দিয়ে পড়লো আমার ঘাড়ে। ওহ্, ঘাড়টা আমার ভেঙেই দিয়েছে হারামজাদা!'

'তুই কেন বাইরে বের হয়েছিলি, গফুর?' কোনরকমে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলো মহুয়া।

গফুর পূর্ববৎ মাথা নিচু করে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলো।

'বল না হাঁদারাম, কি হয়েছিল?' ধমক মারলো এবার শহীদ।

মাথা হেঁট করেই জড়িত কণ্ঠে কোনো রকমে গফুর বললো, 'আমিও যে আমার ঘরের জানালা দিয়ে একটা ছায়াকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। কামালদাকে চিনতে না পেরে...'

মাঝপথেই চুপ করে গেল গফুর। শহীদ মনে মনে ভাবলো, তা কি করে সম্ভব? কামাল যাকে দেখেছিল সে যদি গফুর হয়, তাহলে গফুর যাকে দেখেছিল সে কামাল হতে পারে না। কিংবা গফুর যাকে দেখেছিল সে যদি কামাল হয়, তাহলে কামাল যাকে দেখেছিল সে গফুর হতে পারে না। তাছাড়া সে নিজেই বা কাকে দেখেছিল জানালা দিয়ে? কামাল, গফুর, না অন্য কারও ছায়া সেটা?

চাদরটা, চাদরটাই বা গেল কোথায়?

মহুয়া এবার গফুরকে বললো, 'দাঁড়িয়ে থাকিসনে আর সঙয়ের মতো। যা, চা বানা গিয়ে কয়েক কাপ। ঘুমোবার আর সময় নেই।'

নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো গফুর। মনে মনে কামালদার কাছে হাজারবার মাফ চাইতে চাইতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। ইচ্ছে হচ্ছিলো তার কামালদার পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নেয়। কিন্তু দাদামণির ধমকের ভয়ে সাময়িকভাবে সেটা স্থগিত রাখলো সে।

কি যেন ভাবছিল শহীদ। মুখ তুলে তাকালো একসময়। দেখলো, একটু দূরে সরে গিয়ে মহুয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর উঠেপড়ে লেগে কি যেন বোঝাতে চাইছে কামাল। হঠাৎ লক্ষ্য করলো শহীদ, কুয়াশা কখন চলে গেছে এক ফাঁকে।

পুব আকাশে নতুন প্রভাতের পবিত্র আলো ধীরে ধীরে ফুটতে শুরু করেছে। সীমাহীন সমুদ্র ক্রমেই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছে। শীতল, মুক্ত, প্রভাতী বাতাস বইছে একটানা। মহুয়া ও কামাল উন্মুক্ত ডেকে গিয়ে বসলো দুটো চেয়ার নিয়ে। এখনও কৌতুকের হাসি লেগে রয়েছে মহুয়ার ঠোঁটে। কামাল কিছু বলছে না এখন। মুখ গোঁ করে বসে আছে সে সাগরের দিকে তাকিয়ে।

চুপিচুপি সরে গেল শহীদ। রহস্য একটা নিশ্চয় কোথাও আছে। কেউ না কেউ কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে উঠে পড়েছে "সৈনিকে"। কিন্তু কে হতে পারে লোকটা? শত্রু নিশ্চয়ই। শত্রু না হলে লুকিয়ে থাকবে কেন? কার শত্রু! তাদের সকলের শত্রু, না কেবল কুয়াশার? জানতে হবে ব্যাপারটা। যেমন করেই হোক, খুঁজে বের করতে হবে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটাকে। কোথায় আছে সে এখন? কিন্তু সময় নেই হাতে। কুয়াশা নেভিগেশনের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েছে শহীদের উপর। সুতরাং কতদূর এসেছে তারা, এবং এখন কোথায় আছে সেটা জানা দরকার। সরে গেল শহীদ। ব্রিজে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে এক গাদা কাগজপত্র, নক্সা, ম্যাপ নিয়ে ঝুঁকে পড়লো টেবিলের উপর।

কিছুক্ষণ পর কুয়াশা এসে দাঁড়ালো তার পাশে। মুখ তুলে তাকালো শহীদ। প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা, আলো নেই কেন?'

'ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দিতে হয়েছে শহীদ। আমার সঙ্গে এসো, বলছি তোমাকে সব।'

দশ

ব্যস্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো শহীদ। শত্রুরা কি এখনও আমাদেরকে অনুসরণ করে

আসছে?

কুয়াশা হঠাৎ দৌড়ুতে শুরু করে বললো, 'জলদী এসো, শহীদ! মারাত্মক বিপদের সিগন্যাল পাচ্ছি আমি ওয়্যারলেসে। শত্রুরা চরম আঘাত হানতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

কুয়াশার উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে ভ্রূ দু'টো কুঁচকে উঠলো শহীদের অমঙ্গল আশঙ্কায়। তারপরই দৌড়ুতে শুরু করলো সে কুয়াশার পিছন পিছন।

ব্রিজ অতিক্রম করে শহীদ দেখলো, কামাল ও মহুয়া তাদের জন্যে চা নিয়ে বসে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কুয়াশা এবং শহীদকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওরাও দ্রুত পায়ে চললো পিছন পিছন।

ছুটে গিয়ে প্রথমে নিজের কেবিনে ঢুকলো কুয়াশা। পরক্ষণেই বের হয়ে এলো হাতে একটা অ্যাটাচি-কেসের মতো চামড়ার ব্যাগ নিয়ে। যন্ত্রটা কায়দা করে ভাঁজ করা আছে ব্যাগটায়।

কেবিন থেকে বের হয়ে সোজা তিনতলায় ছুটলো কুয়াশা। পিছন পিছন আর সকলেও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। তিনতলায় একটি মাত্র কেবিন। কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো কুয়াশা। একদিকের মোটা কালো ভারি পর্দা সরিয়ে একটা গোলাকৃতি মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। মেশিনটার বাঁ পাশ থেকে একটা লম্বা হাতল বেরিয়ে আছে। সেটা ধরে চক্রাকারে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরালো, তারপর কেবিন থেকে বের হয়ে এসে সকলের উদ্দেশ্যে বললো, 'সৈনিকের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে দেখবে চলো, শত্রুরা কি ভীষণ গতিতে এগিয়ে আসছে।'

কুয়াশা আগে আগে চললো সকলের। পিছনে আর সবাই। থমথম করছে গম্ভীর কয়েকখানা মুখ। অমঙ্গল আশঙ্কায় মহুয়ার মুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। কামাল ভাবছে, ব্যাপারটা কি? শহীদ গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে-আসন্ন বিপদের রূপটা কি পরিমাণ ভীষণ হয়ে দেখা দেবে?

সৈনিকের পিছন দিকের রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো সকলে। আতঙ্কিত না হয়ে উপায় রইলো না এবার। তিমি মাছের মতো পিঠ উঁচু বিরাট আকৃতির মিশমিশে কালো একটা সাবমেরিন পিছন পিছন ছুটে আসছে বেপরোয়া গতিতে। পাঁচমাইল দূরেও নেই আর সাবমেরিনটা।

রাত দশটার সময় ছিলো সাবমেরিন এবং সৈনিকের দূরত্ব বিশ-পঁচিশ মাইল! অজ্ঞাত শত্রুর কারসাজিতে দূরত্ব এখন আর পাঁচ মাইলও নয়!

'ও কি!' গলা চিরে বিস্ময়বোধক একটা শব্দ বের হলো কামালের।

'সী-প্লেন! সী-প্লেন পাঠাচ্ছে ওরা!'

বিনকিউলারটা চোখ থেকে নামিয়ে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো

শহীদ। সত্যিই তাই। সাবমেরিনটা থেকে দু'দুটো সী-প্লেন উঠে পড়েছে আকাশে। গোল হয়ে একবার চক্কর মারলো সী-প্লেন দুটো সাবমেরিনটাকে। দ্বিতীয়বার চক্কর মারবার আগেই আরো দুটো প্লেনকে আকাশে উড়তে দেখা গেল। আগের দুটোর মতো এ দুটোও চক্রাকারে ঘুরলো সাবমেরিনটাকে কেন্দ্র করে। তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো সৈনিককে টার্গেট করে।

'নাপাম বোমা ফেলবার তালে আছে শয়তানরা,' মিটিমিটি হেসে কথাটা বললো কুয়াশা। তারপর হাতের অ্যাটাচি কেসটার তালা খুলতে খুলতে ডেকের একপাশে রাখা কয়েকখানা চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। পিছন পিছন ওরা সকলেও চেয়ারগুলোর কাছে চলে এলো। কুয়াশা একটা চেয়ারে বসে অ্যাটাচি কেসটা টেবিলের উপর রাখলো।

'বসো সবাই,' সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাটা বলে নিজের কাজে মন দিলো কুয়াশা। ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রটার বোর্ডে কম করেও দেড়শ' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুইচ এবং আলোর সঙ্কেত রেখা। ঝুঁকে পড়ে খটাখট শব্দ তুলে সুইচ টিপতে শুরু করলো কুয়াশা। এবং একই সঙ্গে আলোর সঙ্কেত রেখাগুলোর রূপান্তর গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বসে পড়লো একসময়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এগিয়ে আসছে আকাশ পথে চার-চারটে সাক্ষাৎ যমদূত। গর্জন শোনা যাচ্ছে বিপদের। এগিয়ে আসছে শত্রুরা, পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার জন্যে এগিয়ে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকা। এই নড়বড়ে ঝক্কড়মার্কা ক্ষুদ্র জলযানটিকে একটি মাত্র নাপাম বোমাই ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। হার্টবিট বেড়ে গেল ওদের তিনজনের। ঠিক এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা ঘটলো।

চমকে উঠলো ওরা ভয়ে। শিউরে উঠলো মহুয়া। 'সৈনিক' ডুবে যাচ্ছে। সাগর-গভীরে প্রবেশ করছে সৈনিক। ডুবে যাচ্ছে সীমাহীন জলরাশির অতলতলে!

এগার

প্রথমে একটা তীব্র ঝাঁকুনি খেলো ওরা। সামনের দিকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো একটু। তারপরই সামান্য উঁচু হয়ে গেল 'সৈনিকের' পিছন দিকটা। গোত্তা খেলো একটা। নিচু হয়ে পানির তলায় ডুবে যেতে লাগলো দ্রুত। লঞ্চসুদ্ধ পানির নিচে চলে গেল ওরা।

কিন্তু পানি কই? ভিজছে না কেন ওরা?

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে রহস্যটা ধরতে পারলো শহীদ। কামাল আর মহুয়ারও বুঝতে বাকি রইলো না রহস্যটা। ওদের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা হাসলো মৃদু মৃদু।

বললো, 'স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের আবরণ ঢেকে রেখেছে আগাগোড়া সৈনিককে। রকেট প্রুফ, টর্পেডো প্রুফ এবং ওয়াটার প্রুফ তো বটেই জিনিসটা, এমন পরিষ্কারভাবে স্বচ্ছ যে বোঝাই যায় না এর অস্তিত্ব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে এখন ওরা। রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো সবাই। কিছুক্ষণ পরই সমুদ্রের গভীরে চলে গেল সৈনিক। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো পাথরের টিলা, প্রবালের স্তম্ভ, রঙবেরঙের শ্যাওলা, সামুদ্রিক ফুল বিস্তারিত জায়গা জুড়ে। আর মাছ। আজব রকমের সব সামুদ্রিক মাছ দেখা যাচ্ছে। সৈনিকের অনধিকার প্রবেশে ভীত হয়ে পড়েছে ছোটো ছোটো নাম না জানা সামুদ্রিক মাছগুলো। পালাচ্ছে ভয়ে নিরাপদ দূরত্বে। একটা অক্টোপাসের বাচ্চা সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল দশ হাত দূরে। প্রতিপক্ষ মনে করে তিমি মাছের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ সৈনিকের দিকে রুখে আসছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এগোলো না।যদিও সে মোটেই ভয় পায়নি এই ভাব দেখাতে লাগলো। আসলে সৈনিককে গুরুত্ব দিতে রাজি নয় সে। একটা বুড়ো তলোয়ার মাছের ঠোঁট কামড়ে ধরে বেচারাকে কষ্ট দিতে দিতে আড়চোখে তাকিয়ে রইলো শুধু। লিকলিকে চেহারার একধরনের মাছ সভা করছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে। সৈনিকের অযৌক্তিক আগমনে বিরক্ত হয়ে কিলবিল করতে করতে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আরো সব অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণী মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়তে লাগলো ওদের চোখে। বিপদের আশঙ্কা ভুলে গিয়ে মগ্নচিত্তে দেখছিল ওরা সমুদ্রের তলদেশ। কুয়াশার কথায় সংবিৎ ফিরে পেলো শহীদ।

টেবিলের উপর থেকে মুখ তুলে কুয়াশা বললো, 'বুঝলে শহীদ, পানির নিচে আমাদের স্পীড কমে পঁয়তাল্লিশে নেমে এসেছে। সী-প্লেন দুটোকে আকাশে রেখে পানির নিচ দিয়ে ওরাও আসছে আমাদের পিছন পিছন। ঘন্টায় পাঁচমাইল হিসেবে পিছিয়ে পড়ছি আমরা।'

ফিরে এসে চেয়ারে বসলো শহীদ। বললো, 'বেশিক্ষণ পানির নিচে ওরা থাকতে পারবে না নিশ্চয়। তেল ফুরিয়ে যাবে প্লেনের।'

কুয়াশা বললো, 'সেই সুযোগই নেবো আমরা। অবশ্য পানির নিচে আমরা নিরাপদ নই মোটেও।'

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে সকলের অজান্তে কুয়াশা নিচু স্বরে বললো, 'আমাদের সঙ্গেই, এই জাহাজে, কোনো শত্রু যাচ্ছে, শহীদ। অ্যান্টি টর্পেডোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো করে দিয়েছে গত রাতে। আর এঞ্জিনরুমে ঢুকে কে যেন স্পীড কমিয়ে দিয়েছে আমাদের।'

'আমি তা জানি, কুয়াশা। কিন্তু সময় নেই এখন হাতে খোঁজ করবার। কিন্তু এ ব্যাপারে কি উপায় করা যায়?' কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললো শহীদ।

'উপায় একটা করা যাবে হয়তো। মেরামত করে নিতে হবে ভাঙা

কলকজাগুলো। কিন্তু দুশ্চিন্তার কথা হলো লোকটা কে? আমাদের জাহাজ ছোটো হলেও এমনভাবে তৈরি করা যে, ইচ্ছা করলে যে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারবে এতে দীর্ঘদিন। সহজে ধরা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমার হাতে সময়ও নেই।'

'লোকটা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়, কে হতে পারে?'

কুয়াশা বললো, 'আন্দাজ করে কিছু বলা যায় না, শহীদ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শহীদ। তারপর বললো, 'আন্দামান দ্বীপ ছাড়িয়ে এসেছি আমরা। এখন পাঁচটা বাজে। পুব দিকে চলেছি আমরা। ঠিক পুবদিকে নয়, দক্ষিণ-পুবদিকে বলা যায়। আমরা সুমাত্রা আর কুয়ালালামপুরকে দু'ধারে রেখে এগিয়ে যাবো নিউগিনির দিকে। পথে বোর্নিও পড়বে।'

কুয়াশা জানতে চাইলো, 'প্রথমবারের মতো কোথায় নোঙর করবো আমরা?'

'নিউগিনিতে। তবে ইতিমধ্যে কি বিপদ ঘটে বলা যায় না। বিপদ ঘটলে দেরি হয়ে যেতে পারে, প্ল্যানও বদলে ফেলতে হতে পারে। যদি তেমন কিছু না ঘটে তাহলে আগামী পরশু দিন বেলা তিনটের দিকে আমরা নিউগিনিতে নোঙর করবো আশা করা যায়।'

শহীদ জানতে চাইলো, 'ধাওয়ারত সাবমেরিনটাকে খসানো যায় কি ভাবে, কোনো উপায় কি নেই?'

কুয়াশা বললো, 'উপায় খুব ভালোই ছিলো আমার কাছে। কিন্তু আমাদের লঞ্চেই শত্রুপক্ষের কোনো লোক সব ব্যর্থ করে দিচ্ছে। গতরাতে ধাওয়ারত সাবমেরিনটার রাডারে ভুল তথ্য পাঠিয়ে দিয়ে অন্যপথে বেশ খানিকটা সরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সৈনিক থেকেই ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে সৈনিকের সঠিক অবস্থান জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছো।'

দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভারি হয়ে উঠলো শহীদের। নির্বাক তাকিয়ে রইলো সে কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা আবার বললো, 'যতো বিপদের আশঙ্কাই থাক শহীদ, ওদেরকে ডুবিয়ে মারবো না আমি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়। অ্যান্টি-টর্পেডোর ব্যবস্থাটা ঠিক করে ফেলি ইতিমধ্যে। টর্পেডো থেকে বিপদ না ঘটলে ওরা এমনিতেও পারবে না আমাদের সাথে।'

'ও কথা কি জোর করে বলা যায়?' প্রশ্ন করলো শহীদ।

'পানির নিচ দিয়ে যদি সব সময় চলি, তবে স্বভাবতই পিছিয়ে পড়বো আমরা। আর পানির উপরে ভেসে উঠলেই সী-প্লেন পাঠাবে ওরা। তখন আবার পানির নিচে ডুবে যেতে হবে আমাদেরকে। অবশ্য প্লেনও বেশিক্ষণ আকাশে থাকতে পারবে না ওদের। তেল ফুরিয়ে গেলে নামতেই হবে। এতে করে সময় নষ্ট হবে ওদের। ফলে পিছিয়ে পড়তে থাকবে। তাতেই যতটুকু লাভ হয় আমাদের।

কিন্তু আসল ভয় অন্যখানে। ঘরের শত্রুকে যতক্ষণ না ব্যর্থ করা যাচ্ছে, ততক্ষণ যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কা থাকছে। তাই প্রধান কাজ এখন আমাদের, সেই অজ্ঞাত পরিচয় শত্রুকে খুঁজে বের করা। কামাল ও গফুরকে লাগিয়ে দাও তুমি এই কাজে, শহীদ।'

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুয়াশার কথাগুলো শুনলো শহীদ। তারপর চিন্তা করতে লাগলো পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে।

বারো

সুমাত্রাকে দক্ষিণে রেখে এবং কুয়ালালামপুরকে উত্তরে রেখে পরদিন দুপুরের আগেই ওরা অতিক্রম করলো বোর্নিও। কখনও শত্রুপক্ষীয় সী-প্লেনের ভয়ে পানির নিচ দিয়ে, কখনও টর্পেডোর ভয়ে পানির উপর ভেসে ঘন্টায় তিরিশ মাইল বেগে একটানা ছুটে চললো সৈনিক।

প্রতি মুহূর্তে ভয় ছিলো সর্বনাশের। অ্যান্টি-টর্পেডোর ব্যবস্থা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনা গেলেও পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে যথেষ্ট ভালভাবে মেরামত করা সম্ভব হয়নি। যে কোনো মুহূর্তে একটা টর্পেডো লেগে সর্বনাশ ঘটে যাবার আশঙ্কা ছিলো পুরোমাত্রায়। যদিও পূর্ববর্তী বত্রিশ ঘন্টায় তেমন কিছু ঘটেনি। কিন্তু এই বত্রিশ ঘন্টা কেটেছে ওদের প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে। কে জানে কখন কি বিপদ কোনদিক থেকে মাথার উপর এসে পড়ে। শত্রু তো সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আত্মগোপনকারী শয়তানটাকে!

কম চেষ্টা করেনি কামাল ও গফুর খুঁজতে। কিন্তু ভীষণ ধুরন্ধর প্রতিপক্ষের লোকটা। কোনমতে ধরা দিচ্ছে না এদের হাতে। ঠিকই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

পরবর্তী তিনদিনের দৈনন্দিন ঘটনাও কোনো বিশেষ পরিবর্তন বয়ে আনলো না। নিঃশ্বাস বন্ধ করা আশঙ্কাজনিত উত্তেজনা এবং শিরঃপীড়নকারী দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল পরপর তিনটে দিন। আত্মগোপনকারী শত্রুও রইলো চোখের আড়ালে।

ঠিক বেলা তিনটের সময় পৌঁছলো ওরা নিউগিনির সমুদ্র সীমায়। ইতিমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও পিছু ছাড়েনি শত্রুপক্ষের বিরাটাকার জলচর দানব সাবমেরিনটা। দশ মাইল পিছনে সেটা তখন। ছুটে আসছে একটানা।

নিউগিনিতে নোঙর করা হলো না সৈনিক।

সমান গতি বজায় রেখে এগোতেই হলো সামনে। অবশ্য নোঙর করবার

বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না। প্রচুর খাদ্য ছিলো স্টোররুমে। 'সৈনিকের' ব্যক্তিগত প্রয়োজনও কিছু ছিলো না। তিনমাসের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সে। আর এখন শুধু শুধুই নোঙর করা মানে বিপদ জেনেও তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করা।

সকাল থেকেই সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল সেদিন। সুবিধেই হয়েছিল তাতে। পানির তোড় ছিলো সামনের দিকে। বেড়ে গিয়েছিল সৈনিকের গতি। কিন্তু নিকষ কালো মেঘ উঠে আসছিল আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে অশুভ ইঙ্গিত বহন করে।

চারটে নাগাদ ক্রমশ ঘন হয়ে উঠলো ঘনকৃষ্ণ মেঘের স্তরগুলো। ভয়ঙ্কর একটা গম্ভীর, থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হলো আকাশে। তার জমকালো ছায়া পড়লো সমুদ্রেও। অশান্ত হয়ে উঠলো আরও দিক-চিহ্নহীন বিশাল সমুদ্র।

বৈকালিক চা-নাস্তা সেরে উপরের ডেকে উঠে এসেছিল শহীদ, কামাল, মহুয়া ও গফুর।

মহুয়া, কামাল এবং গফুর রেলিঙের ধারে বসে বসে দেখছিল সামুদ্রিক মাছ। শহীদ একা বসেছিল ডেকের মাঝখানে চুপচাপ। তার মনে একই কথা ঘোরাফেরা করছিল সর্বক্ষণ—ঝড় উঠবে নাকি!

কুয়াশা তার কেবিনে বসে কি করছিল কে জানে।

গফুর, মহুয়া ও কামালের পায়ের কাছে বসে একটা গল্প বলছিল আর হাসছিল মহুয়া। গফুর এবং মহুয়ার কোনো দুশ্চিন্তা নেই যেন। মহুয়া তার দাদার উপর এমনই আস্থাশীল যে কোনো বিপদের আশঙ্কাকেই পাত্তা দিতে চায় না সে। দাদা তাদের সকলকে যে কোনো রকমের বিপদ থেকে রক্ষা করবে এ যেন তার জানা। আর গফুরের বিশ্বাস তার দাদমণির উপর। তার দাদামণি সাথে থাকতে কোনো দুশ্চিন্তা করাকে মগজের বাজে পরিশ্রম বলে মনে করে সে।

গফুর গল্প শোনাচ্ছিল, 'জানো দিদিমণি, আমাদের দেশে লোকে একটা গল্প বলে-অসুখে অসুখে একটি ছেলে মরে যায় দেখে একদিন তার বাবা মসজিদে গিয়ে খোদার দরবারে জানালো, আমার ছেলেকে ভালো করে দাও, খোদা! তোমার নামে তাহলে এক জোড়া উট কোরবানি দেবো আমি। আশ্চর্যের ব্যাপার, ছেলেটির অসুখ ভালো হয়ে গেল। কিন্তু লোকটা তার কথামত জোড়া উট কোরবানি দিলো না। একদিন হলো কি, লোকটা একটা স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নে তাকে মনে করিয়ে দেয়া হলো জোড়া উট কোরবানি দেবার কথা। লোকটা তখন মনে মনে বললো, উট তো এদেশে পাওয়া যায় না; উট না, আমি জোড়া গরু কোরবানি দেবো আগামী মাসে। একদিন আগামী মাস গত মাস হয়ে গেল। তবু সে গরু কোরবানি দিলো না। আবার লোকটা একটা স্বপ্ন দেখলো। এবার তাকে গরু কোরবানি দেবার ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দেয়া হলো। এবারও মনে মনে বললো লোকটি, গরু কোরবানি দেবার তো সামর্থ্য নেই আমার খোদা, আমি বরং এক জোড়া ছাগল

কোরবানি দেবো।' কিন্তু এবারও লোকটা তার কথা রাখতে পারলো না। এমনিভাবে সে একটি করে স্বপ্ন দেখে এবং একবার একটা ছাগল, তারপর ভেড়া, তারপরের বার মোরগ, তারপরের বার মুরগীর ছোটো বাচ্চা এবং শেষ বার একটা শালিক পাখি কোরবানি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো। যদিও রাখতে পারলো না আগের বারের মতোই। ফলে আবার একটা স্বপ্ন দেখলো গরীব লোকটা। এবার কিন্তু সে ভীষণ রেগে গেল। রেগেমেগে বিছানা থেকে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়ালো সে। তারপর চিৎকার করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো-হায় খোদা! তোমার মতি বোঝা ভার। এই দুনিয়ার পশু-পক্ষী, জীব-জানোয়ার সবই তো তোমার সৃষ্টি। একটা শালিক পাখি কোরবানি দেবো বলেছি তার জন্যে হরদম স্বপ্ন দেখিয়ে যাচ্ছো আমাকে-কেন, শালিক পাখি তো যেখানে সেখানে চরে বেড়াচ্ছে, তুমি একটু কষ্ট করে একটা ধরে নিতে পারো না?'

গফুরের গল্প শুনে হাসতে লাগলো মহুয়া। এমন সময় দেখা গেল কুয়াশা উঠে আসছে ডেকের উপরে।

উজ্জ্বল আলোকিত ডেকটা। কুয়াশার পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালো শহীদ। হঠাৎ কুয়াশার পিছন দিকে দৃষ্টি পড়তেই দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠলো শহীদ। একজন ইউরোপিয়ান লোক ডেকের এক কোণে আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রিভলভার তাক করছে পিছন থেকে কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে। চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে উঠতে রিভলভারের জন্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিলো শহীদ পকেটে। একই সঙ্গে চিৎকার করে কুয়াশার উদ্দেশ্যে বললো, 'শুয়ে পড়ো, কুয়াশা, জলদি!'

'গুড়ুম!'

'গুড়ুম! গুড়ুম!!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। শহীদের কথা শেষ হবার পরপরই তিনটে গুলির শব্দ উঠলো। ক্যাঙ্গারুর মতো লাফ দিয়ে একপাশে সরে গিয়েছিল কুয়াশা। সামান্যের জন্যে রক্ষা পেয়ে গেল সে। সরে গিয়েই দ্রুত পাক খেয়ে পিছন ফিরলো সে। তার ঘাড়ের ইঞ্চিখানেক দূর দিয়ে একটা গুলি ছুটে গিয়ে রেলিঙের কাঠে বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আর দুটো গুলি কোথায় বিঁধলো? ছুঁড়লোই বা কে?

আশ্চর্য হয়ে দেখলো সবাই, আক্রমণকারী ইউরোপিয়ানটা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ঠিক তার ঘাড়ের উপর পাশাপাশি দুটো গর্ত সৃষ্টি হয়েছে বুলেটের। তাজা লাল টকটকে রক্ত কলকল করে বেরুচ্ছে গর্ত দুটো থেকে। কুয়াশাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল এই জার্মান লোকটা। লোকটা নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষীয়, কিন্তু একে কে মারলো? সৈনিকে তাহলে একজনমাত্র অজ্ঞাত পরিচয় লোক ছিলো না! কিন্তু কুয়াশাকে রক্ষা করলো কেন সে? কি তার উদ্দেশ্য? যাচ্ছেই বা কেন সে এদের সঙ্গে? শত্রুই যদি না হয়. তবে লুকিয়ে থাকবার ইচ্ছা

কেন? কে হতে পারে এই শুভাকাঙ্ক্ষী? কে?

তেরো

অপরিচিত ইউরোপিয়ান লোকটাকে এক পলক দেখে নিয়েই ছুটলো শহীদ ডেক ধরে। জানতেই হবে রহস্যটা। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে কে বাঁচালো কুয়াশাকে? পিছন থেকে যদি অদৃশ্য মানুষটা গুলি না ছুঁড়তো, তাহলে ইউরোপিয়ানটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না নিশ্চয়। কে এই শুভানুধ্যায়ী? কেন এই উপকার করলো সে?

দোতলায় নামবার সিঁড়ির দিকে ছুটলো শহীদ। সিঁড়িমুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কে যেন বললো, 'ওদিকে নয় শহীদ, আমি এই দিকে রয়েছি!'

অবাক কাণ্ড! চট করে ঘুরে দাঁড়ালো শহীদ। 'কে, মি. সিম্পসন নাকি?'

'হ্যাঁ, সিম্পসন!' বিধ্বস্তপ্রায় মি. সিম্পসনই শহীদের উদ্দেশ্যে কথাটা বললেন।

একটা ড্রামের পাশের জমাট অন্ধকার থেকে টলমল করতে করতে মি. সিম্পসন বের হয়ে এলেন। অসহায় একটুকরো হাসি তাঁর ঠোঁটে কোনরকমে লটকে আছে। পরনের প্যান্টটা কুঁচকে একাকার হয়ে গেছে। ছিঁড়ে গেছে টাইটা। শার্টটায় দাগ ধরে গেছে ছোপ ছোপ। এবং সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হলো একমুখ দাড়ি গজিয়ে ওঠার ফলে মি. সিম্পসনকে ঠিক যেন চেনাই যাচ্ছে না।

'আরে! আপনি, আপনি কোথা থেকে এসে পড়লেন, মি. সিম্পসন?' ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলো কামাল।

'মাফ করবেন মিস্টার, আপনি কি সত্যিই মি. সিম্পসন?' মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করলো কুয়াশা।

'বাজে কথা বাদ দাও!'

মি. সিম্পসন কারো দিকেই সরাসরি তাকালেন না। মাপা পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সারেণ্ডারের ভঙ্গিতে কিছুটা, কিছুটা ছেলেমানুষী কথাবার্তা বন্ধ করার তাগাদা দিয়ে দু'হাত উপর দিকে উঠিয়ে বলে উঠলেন, 'বাজে কথা বাদ দাও! খিদে, খিদে এবং খিদে-প্রচণ্ড ক্ষুধায় মরমর অবস্থা হয়েছে আমার। খেতে দাও আগে, তারপর...। উহ্, গফুর ব্যাটা এমন আগলে আগলে রাখে রান্নাঘরটা যে...'

গফুর এসে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে। চলে গেল সে মুখ লুকিয়ে মি. সিম্পসনের জন্যে খাবার আনতে। মি. সিম্পসনের খেদোক্তি শুনে কোনরকমে হাসি সামলালো সবাই। একটা রোবট এসে সরিয়ে নিয়ে গেল লাশটা।

'তখন কি যেন বলছিলে তুমি?'

একপেট খেয়ে একটা ঢেকুর তুলে প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে। 'সত্যিসত্যি আমি সিম্পসন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছিলো তোমার, না?'

'আপনার দাড়ির জন্যে আপনাকে চেনা যাচ্ছিলো না বলেই বলেছিলাম কথাটা, মি. সিম্পসন। তাছাড়া, না খেতে পেয়ে আপনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন, তাই চিনতে পারছিলাম না। আর...'

কুয়াশার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে বাধা দিয়ে বললেন মি. সিম্পসন, 'আমাকে সিম্পসন হিসেবে চেনা যাক বা নাই যাক, এই বান্দা আজ এখানে না থাকলে গিয়েছিলে তো শেষ হয়ে।'

'তা অস্বীকার করবো না। সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, মি. সিম্পসন!'

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মি. সিম্পসন। হঠাৎ কেঁপে উঠলো সৈনিক কিসের যেন ধাক্কা খেয়ে। ছিটকে পড়লো মহুয়া চেয়ার থেকে। টাল সামলাতে সামলাতে উঠে দাঁড়ালো ওরা সকলে। এদিক ওদিক দুলছে সৈনিক অস্থিরভাবে। কি হলো বোঝা গেল না ব্যাপারটা। টলতে টলতে মহুয়ার দিকে এগিয়ে গেল শহীদ। কুয়াশা ছুটলো তার কেবিনের দিকে উৎকণ্ঠিত হয়ে। মি. সিম্পসন রেলিং ধরে ধরে দৌড়ুলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। ব্যাপারটা কি জানতে চান তিনি। কামাল এবং গফুর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে হতবাক হয়ে। সৈনিক কাত হয়ে যাচ্ছে একদিকে।

বেশ খানিকটা কাত হয়ে গেল সৈনিক দেখতে না দেখতে। মহুয়াকে উঠিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালো শহীদ। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো কুয়াশা তার কেবিন থেকে।

'মি. সিম্পসন কোথায় গেলেন?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলো কুয়াশা।

কামাল বললো, 'নিচে নেমে গেছেন তিনি।'

কামালের কথা শেষ হতেই কুয়াশা দ্রুত কয়েকটা কথা বললো শহীদের উদ্দেশ্যে, 'পেছনের সাবমেরিন থেকে টর্পেডো এসে আঘাত করেছে সৈনিককে, শহীদ। ফুটো হয়ে গেছে সৈনিকের তলা। আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হও তোমরা। এখুনি পানির উপরে ভেসে উঠছি আমরা। লাইফবয় এনে দিচ্ছে লৌহমানব। কোনো ভয় নেই। নির্ভাবনায় নেমে পড়বে সবাই।' কথা কটি বলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো কুয়াশা।

সকলের আগে মহুয়া প্রশ্ন করলো উৎকণ্ঠিত স্বরে, 'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছো, দাদা?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা। বললো, 'মি. সিম্পসনকে সরিয়ে

আনতে হবে, মহুয়া। সৈনিক অল্পক্ষণেই ডুবে যাবে!' কাষ্ঠ হাসি হেসে কথাটা বললো কুয়াশা। তারপর আর কাউকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই নেমে গেল দোতলায়।

কুয়াশা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো লৌহমানব উঠে এলো নিচের তলা থেকে। প্রত্যেকের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো তারা একটা করে লাইফবয়। তারপর চলে গেল নিভাঁজ পদক্ষেপে। ঠিক এমনি সময়ে পানির তলা থেকে সমুদ্রের উপরে ভেসে উঠলো সৈনিক।

লৌহমানব দুজনের একজন চলে গেছে নিচের তলায়। অন্যজন কুয়াশার কেবিনের ভিতর ঢুকে গোলাকৃতি যন্ত্রটার হাতল ঘোরাচ্ছে। ফলে প্ল্যাস্টিকের যে আবরণটা সৈনিককে ঘিরে রেখেছিল সেটা উন্মুক্ত হতে লাগলো ধীরে ধীরে। এবং…

এবং বাতাসের প্রচণ্ড গর্জনে চমকে উঠলো ওরা সকলে প্ল্যাস্টিকের আবরণটা সরে যেতেই। সেই সঙ্গে আচমকা বাতাসের ঝাপটা খেয়ে মাতালের মতো দুলতে লাগলো সৈনিক। টলতে লাগলো ওরা সবাই।

ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে। সাইক্লোনের পূর্বাভাস! মহুয়াকে জড়িয়ে ধরে রেলিঙের ধারে সরে গেল শহীদ। বাতাসের ঝাপটায় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বলে এক হাতে নাকটা আড়াল করে বসে পড়লো গফুর ডেকের উপর। কোনরকমে তাল সামলে দাঁড়িয়ে রইলো কামাল রেলিং ধরে। সৈনিক আরো কাত হয়ে গেছে।

মহুয়াকে রেলিং ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে শহীদ তুলে নিলো দুটো লাইফবয়। চিৎকার করে বললো কামাল ও গফুরের উদ্দেশ্যে, 'লাইফবয় হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোও সবাই!'

ডুবে যাচ্ছে ক্রমশঃ সৈনিক।

লাইফবয় হাতে নিয়ে এগোলো ওরা। কি যেন বললো কামাল, শুনতে পেলো না কেউ। গফুর বুঝি 'দাদামণি গো' বলে ককিয়ে উঠলো। শোনা গেল না তাও বাতাসের হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ গর্জনে।

এগোচ্ছে ওরা রেলিং ধরে।

মাত্র পাঁচ গজ দূরে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে পানিতে নেমে যাবার সিঁড়িটা। কিন্তু বাতাসের আক্রমণে এক'পা এগোতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা।

পিছিয়ে পড়েছে শহীদ ও মহুয়া। মহুয়াকে সামনে রেখে এগোচ্ছে শহীদ। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটছে বলে থেকে থেকে এলিয়ে পড়ছে মহুয়া শহীদের কাঁধে। রাশ রাশ চুল ঝাপটা মারছে শহীদের চোখে-মুখে। কিন্তু উপায় নেই আর কোনো, সময়ও নেই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব লাইফবয় নিয়ে নেমে যেতে হবে সমুদ্রে।

*

প্রথমে নামলো কামাল। কামালের পর গফুর এবং মহুয়া। কামাল পানিতে নেমেই গলা ফাটিয়ে কি যেন বললো চিৎকার করে। শুনতে পেলো না শহীদ। শহীদ নামলো সকলের শেষে।

নেমেই বিপদের ভয়ঙ্করত্ব দেখে দিশেহারা হয়ে পড়লো শহীদের মতো অসম-সাহসী মানুষও। কি বীভৎস সর্বনাশ ঘটবে এবার তা আর বুঝতে বাকি রইলো না তার।

পরস্পরের হাত ধরে এই মাতাল সমুদ্রে টিকে থাকা এককথায় অসম্ভব। ঢেউ উঠছে অনবরত। প্রচণ্ডভাবে ছুটে এসে ধাক্কা মারছে একটার পর একটা। সেই সঙ্গে দমকা বাতাসের তীব্র আঘাত। কি যেন বলতে গেল শহীদ কামালের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎচমকের আলোয় হতবাক হয়ে দেখলো, গফুরের হাত থেকে ছুটে গেছে কামালের হাত।

স্রোতের সঙ্গে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে লাইফবয়টা। বিদ্যুৎ চমকালো আবার। কোনো রকমে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে কামাল লাইফবয়ে। ঢেউয়ের তালে তালে উঠছে নামছে লাইফবয়টা। একবার তিনহাত উপরে দেখা যাচ্ছে সেটাকে, আবার দেখা যাচ্ছে ঝপাৎ করে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনহাত পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে অনেকটা দূরে গিয়ে।

কামালের হাত খসে যাবার পর থেকেই হায় হায় করে বিলাপ করছে গফুর। শক্ত হাতে ধরে আছে শহীদ ঝোলানো একটা রশি। ব্যথা হয়ে গেছে হাতটা। রক্ত জমে টনটন করছে আঙুলের মাথাগুলো। মাথা তুলে তাকালো শহীদ উপর দিকে। সৈনিক ক্রমশঃই কাত হয়ে যাচ্ছে!

একসাথে বেঁধে ফেলা যায় না লাইফবয় তিনটেকে? কথাটা ভাবলো বটে শহীদ, কিন্তু বাঁধবে কি দিয়ে? বাঁধবেই বা কে? তার দুটো হাতই তো জোড়া!

মাথা তুলে আবার একবার তাকালো শহীদ সৈনিকের দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠলো। মি. সিম্পসন খালি হাতে সমুদ্রে লাফ দিয়ে পড়ার জন্যে রেলিং টপকাচ্ছেন!

এভাবে লাইফবয় না নিয়ে লাফ দিলে নির্ঘাৎ মারা যাবেন মি. সিম্পসন, ভাবলো শহীদ। চিৎকার করে সাবধান করে দিতে চাইলো সে মি. সিম্পসনকে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। শহীদ দেখলো মি. সিম্পসনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্বয়ং কুয়াশা। পিছন থেকে ধরে ফেললো কুয়াশা মি. সিম্পসনকে। তারপর আবার যখন বিদ্যুৎ চমকালো ওদেরকে আর দেখা গেল না।

বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গগনবিদারী মেঘের গর্জন। পরক্ষণেই শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি।

স্রোতের তীব্রতা বেড়ে গেছে। বাড়ছে আরো ভয়ঙ্করভাবে। শহীদের রশি ধরে

থাকা হাতের আঙুলগুলোয় নোনা পানি লাগছে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ছে যেন। কি করবে ভাবছিল শহীদ। এমন সময় সে বুঝতে পারলো, মহুয়া জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো তার লাইফবয়ে। এর ঠিক পঁচিশ সেকেণ্ড পর প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের আঘাতে ছুটে গেল শহীদের হাত থেকে রশিটা। প্রথমে তীরের মতো ছুটে গেল তিনজন একসাথে স্রোতের তীব্র টানে। কিন্তু দ্বিতীয় আর একটি প্রকাণ্ড ঢেউ এসে পড়তেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো ওরা তিনজন পরস্পরের কাছ থেকে।

কি নিদারুণ সর্বনাশ ঘটে গেল দেখতে না দেখতে! অচেতন মহুয়ার কথা ভেবে কান্না পেলো শহীদের। নিরুপায় সে! কোনো উপায়েই কোনো চেষ্টা করার কিছু অবশিষ্ট নেই। কাউকে উদ্ধার করার চিন্তা করাও যেন এখন হাস্যকর। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার! স্রোতের তীব্র টান। ঢেউয়ের গগনবিদারী গর্জন। মেঘের গুরু গুরু গম্ভীর অশুভ ডাক, এবং প্রবল বর্ষণ। হু হু করে উঠলো শহীদের বুকটা। লাইফবয়টাকে কোনরকমে জড়িয়ে ধরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইলো সে। গফুরের কথা মনে পড়লো তার। কামাল তো আগেই দলছাড়া হয়ে গেছে। মহুয়া কি জ্ঞান ফিরে পাবে না? বাঁচবে তো এরা? সে নিজেই কি বাঁচবে? মহুয়া যদি জ্ঞান না ফিরে পেয়ে থাকে, তবে…তবে কি মহুয়া চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে গভীর সমুদ্রের অতলতলে?

ব্যথায় নীল হয়ে যেতে থাকলো শহীদ। কুয়াশার কথা মনে পড়লো তার। কুয়াশা কি এখনও জানতে পারেনি, কি সর্বনাশ ঘটে গেছে?

আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠলো।

বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো আলোয় শহীদ যেন দেখলো, বেশ খানিকটা দূরে একটা লাইফবয়। লাইফবয়টায় কে যেন পড়ে আছে হুমড়ি খেয়ে। চেনা গেল না। ধক্ করে উঠলো শহীদের বুকটা। কে হতে পারে? তার দয়িতা মহুয়া, না, তার প্রাণপ্রতিম বন্ধু কামাল, না, প্রভুভক্ত গফুর? কে?

আবার বিদ্যুৎ চমকালো।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো শহীদ। না, এবার আর লাইফবয়টা দেখা গেল না। ঘাড় বাঁকিয়ে সৈনিকের দিকে তাকালো। বিদ্যুৎ চমকালো একটু পরই। আবার একবার কেঁপে উঠলো শহীদের বুকটা। নেই! পানির উপরে আর সৈনিকের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না!

একা সে। কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কোনদিকে। কেউ নেই তার সঙ্গে। কুয়াশা নেই, মহুয়া নেই, কামাল নেই। গফুর নেই, মি. সিম্পসনও নেই। সে শুধু একাই বুঝি বেঁচে আছে। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না কোনো দিকে। সম্মুখে শুধু উত্তাল ভয়ঙ্কর সমুদ্রের বীভৎস উল্লাস। আর গগনবিদারী গর্জন চারদিকে।

কুয়াশা ১৪

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ৬৮

এক

হালকা কুয়াশায় ঘেরা আবছামতো একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে উত্তর দিকে।

সমুদ্রের উথালপাথাল সেই ভীষণ মূর্তি এখন আর নেই। সকাল হবো হবো। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। সূর্য উঠবে এখুনি। পুব আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। মাথার উপরে এখনো মিশকালো মেঘের মিছিল শেষ হয়নি। কি যেন একটা জরুরী কাজে দক্ষিণ দিকে অনবরত ছুটে চলেছে মেঘগুলো। বিরামহীন, বিশ্রামহীন।

নির্জন, নিস্তব্ধ একটা দ্বীপ। ধ্যানমগ্ন, প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তির মতো সমাহিত দেখাচ্ছে দূর থেকে দ্বীপটাকে। লালচে পাড় দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। বালুকাবেলা থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে পাড়টা। গতরাতের ঝড়বৃষ্টিতে লাল মাটি ভিজে গিয়ে আরো লালচে দেখাচ্ছে।

মগ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশা দ্বীপটার দিকে। কুয়াশার কপালে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখা যাচ্ছে। গতরাতের সাইক্লোনে একটা ভারি রড এসে পড়েছিল তার কপালে। তাড়াহুড়ো করে ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে "সৈনিক" থেকে নেমে পড়েছিল সে সমুদ্রে মি. সিম্পসনকে নিয়ে। ব্যাণ্ডেজের কাপড় ভেদ করে লাল রক্তের ছাপ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

আধমাইলও দূরে নেই দ্বীপটা। কুয়াশাচ্ছন্ন বলে আবছা আবছা দেখাচ্ছে। ছবির মতো সুন্দর লাগছে দেখতে। মগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে কুয়াশা সেই দিকে। না, কোনো জনমানবের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। বালুকাবেলা পড়ে আছে নির্জন। তারপর উঁচু পাড়। পাড়ের উপর গাঢ় সবুজের সমারোহ। গভীর জঙ্গল। মনে হচ্ছে দ্বীপটা জঙ্গলাকীর্ণ। না, কোনো ঘরের ছাদ বা বাঁশের ছাউনি দেখা যাচ্ছে না।

ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে লাইফবয় দুটো। মি. সিম্পসন ঘুমিয়ে রয়েছেন। অ্যাটাচি কেসটা কোলের উপর টেনে নিয়ে সিধে হয়ে বসলো কুয়াশা। গতরাতের ভয়াবহ সাইক্লোনে ডুবে গেছে কুয়াশার আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র সাবমেরিন প্রশান্ত মহাসাগরের অতল তলে। শত্রুপক্ষীয় সাবমেরিন থেকে টর্পেডো এসে আঘাত করেছিল "সৈনিকের" তলায়। ফুটো হয়ে গিয়েছিল "সৈনিক"।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্মুখবর্তী দ্বীপটার দিকে আবার তাকালো কুয়াশা ভ্রূ

কুঁচকে। তারপর মি. সিম্পসনকে জাগাবার জন্যে রশি ধরে টান দিলো একটু। লাইফবয় দুটো যাতে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যেতে না পারে সেজন্যে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল কুয়াশা। "সৈনিক" ডুবে যাবার আগেই নেমে পড়েছিল তারা সমুদ্রে।

ধক্ করে উঠেছিল কুয়াশার বুকটা পানিতে নেমেই। সমুদ্র যে রূপকথার রাক্ষসীর মতো ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছে তা সে আগে বুঝতে পারেনি। শহীদ, মহুয়া, কামাল ও গফুরের কথা ভেবে শিউরে উঠেছিল সে অশুভ আশঙ্কায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বুঝতে পেরেছিল, তার আশঙ্কা অমূলক নয়। শহীদরা কে কখন কোথায় কোন্দিকে ভেসে গেছে কে জানে! হায় হায় করে উঠেছিল কুয়াশার অন্তরাত্মা ওদের কথা ভেবে। কোথায় গেল ওরা! কোন্দিকে ভেসে গেল? একসঙ্গেই আছে তো ওরা, নাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে? ডুবে যায়নি তো ওরা অতল সাগরে?

দারুণ দুশ্চিন্তায় এখনো বিমূঢ় হয়ে আছে কুয়াশা। গতরাতের প্রাকৃতিক ঝড় শেষ হয়ে গেছে একসময়। কিন্তু ঝড় বইছে এখনও কুয়াশার সমস্ত বুক জুড়ে। শহীদরা কি হারিয়ে গেল চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে?

'কুয়াশা, দেখো দেখো সামনে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে!' ঘুম থেকে জেগে উঠে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন মি. সিম্পসন। চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলো কুয়াশা। মি. সিম্পসনের দিকে ফিরে বললো, 'দেখেছি আমি দ্বীপটা। আপনি দেখুন তো মি. সিম্পসন, দ্বীপটায় কোনো মানুষজনের চিহ্ন দেখা যায় কি না?'

সিধে হয়ে বসলেন মি. সিম্পসন। চোখ কচলে নিয়ে তাকালেন দ্বীপটার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন তিনি দ্বীপটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'কই, মানুষজন তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমিও দেখতে পাইনি কিছু।' পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করতে করতে কথাটা বললো কুয়াশা।

'কি নাম এই দ্বীপের!'

কিছুক্ষণ পর ম্যাপটা থেকে চোখ তুলে কুয়াশা বললো, 'ম্যাপে তো দেখছি দ্বীপটার কোনো উল্লেখ নেই। দ্বীপটা সম্ভবত এখনো অনাবিষ্কৃত।'

'অনাবিষ্কৃত!' মি. সিম্পসন যেন চমকে উঠলেন, 'জংলীদের আড্ডা নয় তো?'

চিন্তান্বিত কণ্ঠে কুয়াশা বললো, 'গড নোজ, মি. সিম্পসন।'

জোয়ারের সময় এখন।

বিরাটাকায় একটা পাথরের পাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে লাইফবয়টা এগিয়ে চললো মি. সিম্পসনের। দু'মিনিটের মধ্যেই বালুকাবেলায় গিয়ে ঠেকলো লাইফ-বয়টা।

কুয়াশা দশ হাত পিছনের একটা পাথরের কাছে রয়েছে। অ্যাটাচি কেসটা পাথরের গর্তে যত্ন করে রেখে লাইফবয় নিয়ে সে-ও বালুকাবেলায় এসে নামলো খানিক পর।

মি. সিম্পসন ইতিমধ্যেই উঁচু পাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন মাথার বিশৃঙ্খল চুলগুলোকে পিছন দিকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে। কুয়াশা নিজের লাইফবয়টাকে একটা পাথরের আড়ালে রেখে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘুরে দাঁড়িয়েই থমকাল সে।

'মি. সিম্পসন, এদিকে আসুন একটু!' ব্যস্ত কণ্ঠে কথাটা বলে অদূরবর্তী একটা পাথরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। দেখা গেল পাথরটার পাশে একটা লাইফবয় পড়ে আছে। মি. সিম্পসন তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কুয়াশার পাশে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে পড়লো কুয়াশা ওল্টানো লাইফবয়টার উপর। দু'হাত দিয়ে সিধে করে দিলো সে জিনিসটাকে। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো ফুটে উঠলো কুয়াশার সারামুখে। সে দেখলো লাইফবয়টার গায়ে স্পষ্ট বাংলা হরফে লেখা রয়েছে- "সৈনিক"!

মি. সিম্পসনও দেখলেন লেখাটা। চিন্তান্বিত মুখে তাকালেন তিনি কুয়াশার দিকে। কি যেন চিন্তা করতে করতে সিধে হয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। তারপর ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকালো চারদিকে। ধীরে ধীরে নিভে গেল তার মুখ থেকে আশার আলো। নেই, আর কোনো লাইফবয়ের চিহ্নও নেই চারপাশে!

কার লাইফবয় হতে পারে এটা? এর গায়ে "সৈনিকের" নাম লেখা রয়েছে যখন তখন শহীদ, মহুয়া, কামাল বা গফুরের লাইফবয় এটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু লাইফবয় দেখা যাচ্ছে মাত্র একটা। তার মানে, একজন ছিলো এতে। আর সবাই গেল কোথায়? তাছাড়া লাইফবয়টা শূন্যই এখানে এসে ঠেকেনি তো! এটাতে যে ছিলো সে হয়তো ঝড়ের মুখে ছিটকে পড়ে গেছে সমুদ্রে। তা সে শহীদ, মহুয়া, কামাল বা গফুর-যে কেউ হতে পারে। মাথার ভিতরটায় ঝিম ঝিম করতে শুরু করলো কুয়াশার। শহীদদেরকে সে-ই যেচে পড়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। যাচ্ছিলো তারা বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক Kotze-কে সাহায্য করতে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। দুর্ধর্ষ শত্রু কর্তৃক বিপদগ্রস্ত বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অভিনব এক উপায়ে কুয়াশার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। সে নিজে একজন বৈজ্ঞানিক। অপর একজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের বিপদে সাড়া না দিয়ে পারেনি সে। বেশ যাচ্ছিলো তারা। পথিমধ্যে শত্রুপক্ষীয় সাবমেরিন থেকে টর্পেডো মেরে ফুটো করে দিলো "সৈনিকের" তলা। ফলে আত্মরক্ষার জন্যে পানিতে নেমে পড়তে বলেছিল কুয়াশা সকলকে। কিন্তু কে জানতো ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়ে ওরা অসীম সমুদ্রে ভেসে যাবে! ওদেরকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ছিলো আমারই, মনে মনে ভাবলো কুয়াশা, কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি।

'চলো, কুয়াশা, জঙ্গলে ঢুকলে হয়তো হদিস পাওয়া যাবে কিছু। শহীদ বা অন্য যে-কেউই এই লাইফবয় নিয়ে এখানে এসে থাকুক, সে নিশ্চয় জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে।'

উত্তর দিলো না কুয়াশা। কোমর থেকে লেসারগানটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে। মি. সিম্পসন তার পিছন পিছন চললেন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে।

উঁচু পাড়টা বেয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলো ওরা। সূর্য তখন আকাশের পুব দিকে উঠে এসেছে। কিন্তু রোদ্দুর ভালভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। মেঘের আড়াল সরে না যাওয়াতেই এমনটি হচ্ছে। তাছাড়া জঙ্গলটাও দুর্ভেদ্য। মেঘ যখন সরে যাচ্ছে তখনও শুধুমাত্র টুকরো টুকরো সূর্যের আলো অনুপ্রবেশ করছে বনভূমির ঘন-সন্নিবেশিত গাছের পাতার ফাঁক গলে।

অতি কষ্টে এগোতে হচ্ছিলো ওদেরকে।

কাঁটা গাছ, বিছুটি পাতার চারা, আরো সব বিষাক্ত রঙিন পাতার গাছ-গাছড়ায় ভরে আছে জঙ্গলটা। প্যান্টের কাপড়ে কাঁটা আটকে বাধার সৃষ্টি করছে।

পায়ে চলার নির্দিষ্ট কোনো পথের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল কুয়াশা। এবং বিষাক্ত গাছের অদ্ভুত আকৃতির ঝোপ-ঝাড় দেখতে দেখতে সে ভাবছিল, জঙ্গলটা সত্যিই কি অনাবিষ্কৃত? সভ্য মানুষের পদধূলি কি এই দ্বীপে এখনো পড়েনি?

'কুয়াশা!' হঠাৎ সতর্ক কণ্ঠে ডেকে উঠলেন মি. সিম্পসন। 'শুনতে পাচ্ছো, ডান দিক থেকে একটা শব্দ আসছে যেন?'

কান পেতে শব্দটা শুনতে চেষ্টা করলো কুয়াশা। হ্যাঁ, শব্দ একটা হচ্ছে। ডান দিক থেকেই আসছে শব্দটা। খটখট, খটখট, খটাখট-যেন দুটো শক্ত জিনিসে বাড়ি লেগে সৃষ্টি হচ্ছে শব্দটা।

'ডান দিকেই চলুন, দেখা যাক ব্যাপারটা কি।'

ডান দিকে ফিরলো ওরা। শব্দ লক্ষ্য করে দ্রুত এগোতে চেষ্টা করলো নিঃশব্দ পদক্ষেপে।

নিস্তব্ধ, নির্জন দ্বীপ। খটাখট সেই শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। কোনো জন্তু-জানোয়ারের সাড়াশব্দ মাত্র নেই। একটা খরগোসের বাচ্চাও দেখা যাচ্ছে না কোনদিকে। বড় বড় মাছি,ফড়িং এবং প্রজাপতিই শুধু উড়ছে অসংখ্য। কোনো চিহ্ন নেই ঘরবাড়ি বা বাঁশের কোনো ছাউনি বা মাচার, যা দেখে বোঝা যায় দ্বীপটায় মানুষ আছে।

ডান দিক ধরে বেশি দূর যেতে হলো না ওদেরকে। পায়ে চলা সরু পথ পাওয়া গেল একটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো কুয়াশা সরু পথটা। না। বোঝা যাচ্ছে না পথটা মানুষ চলাচলের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, না নিশাচর জন্তু-জানোয়াররা এর কারণ।

থেকে থেকে দমকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাছের উপর দিয়ে। রাস্তাটা ছাড়লো না ওরা। এখন আর শোনা যাচ্ছে না সেই খটখট শব্দটা। অনুমানের উপর ভর করে এগোতে লাগলো ওরা।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর হঠাৎ শেষ হয়ে গেল রাস্তাটা। সামনে বিশ-পঁচিশ ফুট লম্বা চওড়া ফাঁকা একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা এবার অন্যদিকে মোড় নিয়েছে সম্ভবত। খুঁজল ওরা রাস্তাটা ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি ফেলে।

অল্প সময়ের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেল নতুন রাস্তাটা। আগের মতোই সরু রাস্তাটা এবার দক্ষিণমুখো এগিয়ে গেছে। পা বাড়ালো ওরা সেই দিকে। ঠিক এমনি সময়ে শব্দটা আবার শুনতে পেলো ওরা। ওদের খুব কাছাকাছিই হলো শব্দটা। ঠিক মাথার উপর থেকে।

থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা এবং মি. সিম্পসন। একই সঙ্গে মাথা তুলে তাকালো ওরা উপর দিকে।

প্রাচীন একটা বটগাছ। গাছটার মাথাতেই শব্দটার উৎস। মাথা তুলে তাকাতেই সর্বশরীর শিউরে উঠলো মি. সিম্পসনের। ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো তার ধীরে ধীরে। কুয়াশার দিকে তাকালেন তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। কুয়াশাও তাকালো চিন্তান্বিত মুখে। তারপর মাথা তুলে তাকালো গাছটার উপরে।

বুড়ো বটগাছটার মাথায় রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে দুটো নরকঙ্কাল! হালকা বাতাসে ঘুরছে কঙ্কাল দু'টো। দুলছে। হঠাৎ দমকা বাতাস পড়লেই ধাক্কা লাগছে একটার সঙ্গে অন্যটার। তার ফলেই শব্দ হচ্ছে খটখট, খটখট, খটাখট।

গাছের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো ওরা।

'অশুভ সঙ্কেত!' গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন মি. সিম্পসন। কুয়াশা ভাবছিল দ্বীপটা তাহলে অসভ্য জংলীদেরই আড্ডা? তা না হলে গাছের মগডালে নরকঙ্কাল টাঙিয়ে রাখার মানে কি?

'অশুভ সঙ্কেতই বটে, মি. সিম্পসন।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে মি. সিম্পসনের কথার উত্তর দিলো কুয়াশা। তারপর নতুন রাস্তাটা ধরেই এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

কাঁটা গাছের বাধা টপকে টপকে চললো ওরা আবার।

এবার ওদের দৃষ্টি মাঝেমাঝেই এদিক-ওদিকের গাছের মাথার উপর ঘুরে ফিরছিল। মিনিট দুয়েক পরই দেখতে পেলো ওরা আর একটা গাছে একটি নরকঙ্কাল। এগিয়ে চললো ওরা গম্ভীর মুখে সামনের দিকে সতর্ক পদক্ষেপে।

আগে আগে হাঁটছিলেন মি. সিম্পসন। কুয়াশা এগোচ্ছে ঠিক তার পিছন পিছন। হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা বুড়ো বটগাছ ধরা পড়লো কুয়াশার দৃষ্টিতে। সন্দিহান হয়ে তাকালো সে গাছটার মাথায়। পরক্ষণেই পিছন থেকে আচমকা একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো সে মি. সিম্পসনকে। সাত হাত দূরে ছিটকে

পড়লেন মি. সিম্পসন ধাক্কা খেয়ে। পরমুহূর্তে একটা লম্বা বর্শা এসে বিঁধলো ঠিক যেখানে মি. সিম্পসন দাঁড়িয়েছিলেন সেই জায়গায়।

'আঁ-আঁ-আঁ···।'

তীক্ষ্ণ কিন্তু অস্ফুট একটা মৃত্যু-আর্তনাদ উঠতে না উঠতে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

'ধপ!'

সশব্দে একটা মুণ্ডুহীন লাশ পড়লো বুড়ো বট গাছটার উপর থেকে।

ব্যথা ভুলে তড়িৎবেগে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। উঠে দাঁড়িয়েই মুণ্ডুহীন একটা জংলীকে আকাশ থেকে পড়তে দেখে অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠলো তাঁর চোখ দুটো। বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কুয়াশাও।

'একি!'

বিস্ময়ের ঘোর কোনমতে কাটিয়ে উঠতে পারছেন না মি. সিম্পসন।

কুয়াশা বললো, 'আপনাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়েছিল জংলীটা গাছের উপর থেকে। ধাক্কা দিয়ে আপনাকে সরিয়ে না দিলে সিধে আপনার বুকে এসে বিঁধতো বর্শাটা। আমি···'

কুয়াশার কথায় বাধা দিয়ে মি. সিম্পসন বলতে চাইলেন, 'কিন্তু জংলীটার দশা···'

কুয়াশা বললো, 'আপনাকে সরিয়ে দেবার সময় তাড়াহুড়োতে আমার হাতের লেসারগানের ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ে যাবার ফলে এ দুর্ঘটনাটা ঘটলো মি. সিম্পসন।'

মারণরশ্মির বীভৎস ক্ষমতা দেখে চোখ বন্ধ করলেন মি. সিম্পসন। মুণ্ডুহীন জংলীটার ঘাড় থেকে কলকল করে রক্তের স্রোত বের হচ্ছে।

'ঐ জংলীটার নয়, আসলে ঐ দশা হবার কথা ছিলো আমারই।' কথাটা ধীরে ধীরে বললো কুয়াশা মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে।

'কেন?'

বিমূঢ় মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন আশ্চর্য হয়ে। কুয়াশা বললো, 'লেসারগানের ট্রিগারে চাপ পড়তে মারণরশ্মি আমার মুখের ইঞ্চিখানেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর একটু হলেই···'

'থাক, কুয়াশা!'

বাধা দিলেন মি. সিম্পসন কুয়াশাকে। ব্যাপারটা কল্পনা করাও অসহ্য রকমের অস্বস্তিকর মনে হলো তাঁর। আর একটিবারও মুণ্ডুহীন জংলীটার দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কুয়াশাও পা বাড়ালো সামনে।

দুই

উড়ে আসছিল একটি পাখি। একটি রহস্যময় পাখি উড়ে আসছিল ওদের দিকে। ছোট্ট একটা পাখি, কিন্তু ভয়ঙ্কর।

ইতিমধ্যে বনভূমির গভীরতম দেশে প্রবেশ করেছে ওরা। আগে আগে হাঁটছে এখন কুয়াশা। পিছনে মি. সিম্পসন।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল কুয়াশা নতুন কোনো পায়ে চলা পথের খোঁজে। কি যেন ভাবছিলেন মি. সিম্পসন। আর তীব্র বেগে উড়ে আসছিল একটি পাখি ওদের দিকে। ওদের দুজনেরই অগোচরে।

উড়ে আসছিল পাখিটা। তীব্র, একরোখা, দুর্ধর্ষ গতিতে এগিয়ে আসছিল। তীক্ষ্ণ, ছুরির ধারালো ফলার মতো এক জোড়া চঞ্চু তার। চোখ জোড়া দুফোঁটা রক্তের মতো টকটকে লাল। প্রতিহিংসার নীল আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে সেই চোখের শাণিত দৃষ্টিতে। বহুদূর থেকে উড়ে উড়ে আসছিল পাখিটা। দূর থেকেই কিছু একটা দেখতে পেয়েছিল সে।

উঁচু উঁচু গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো গাছের মাথার উপর দিয়ে। থেকে থেকে অদ্ভুত একটা করুণ রবে শিস দিতে দিতে উড়ে আসছিল পাখিটা। কোনদিকে খেয়াল নেই তার, সিধে এগিয়ে আসছিল কুয়াশাকে লক্ষ্য করে।

দেখতে দেখতে এসে পড়লো রহস্যময় পাখিটা। ঠিক হাত দুয়েক দূরে থাকতে টের পেলো কুয়াশা। দু'সেকেণ্ডের জন্যে দেখতে পেলো সে, ছোট্ট একরত্তি একটা কালো রঙের পাখি তার কপাল লক্ষ্য করে তীরের মতো এসে পড়েছে। আশ্চর্য হবারও সময় পেলো না কুয়াশা। ঠোকর মারলো পাখিটা।

সিধে এসে ছুঁচালো তীরের মতো বিঁধলো পাখিটার ঠোঁট জোড়া কুয়াশার কপালের ব্যাণ্ডেজ-মুক্ত অংশটায়। পরমুহূর্তে হাত-ঝাপটা মারলো কুয়াশা। ছিটকে পড়লো পাখিটা কুয়াশার চওড়া হাতের প্রকাণ্ড এক থাবড়া খেয়ে। প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে।

দু'পা এগোলো কুয়াশা পাখিটাকে ভালো করে দেখার জন্যে। দু'পা-ই এগোল মাত্র। হঠাৎ মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো তার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন ভাবলো কুয়াশা। তারপর নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অদূরে পতিত মৃত রহস্যময় পাখিটার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কেঁপে উঠলো কুয়াশার সর্বশরীর। টলতে লাগলো পা দু'খানা।

'কি হলো, কুয়াশা?' কুয়াশাকে থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখে ভয়ে ভাবনায় প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন পিছন থেকে।

কোনো উত্তর পাওয়া গেল না কুয়াশার তরফ থেকে।

বিস্মিত হয়ে এগিয়ে এলেন মি. সিম্পসন। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই সশব্দে কুয়াশার বিশাল শরীর পড়ে গেল মাটিতে।

এক বিরাট মহীরুহের পতন ঘটলো যেন।

দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। মাটিতে বসে পড়ে তুলে নিলেন তিনি তাড়াতাড়ি কুয়াশার মাথাটা নিজের কোলে। চোখ দুটো বুজে গেছে কুয়াশার। কপাল থেকে রক্ত বেরুচ্ছে চিকণ ধারায়। কাঁপা হাতে তুলে নিলেন মি. সিম্পসন কুয়াশার একটি হাত। পালস্ দেখলেন।

জ্ঞান হারিয়েছে কুয়াশা। পালস্ চলছে। কিন্তু মি. সিম্পসনের মনে একটা ভয়াবহ প্রশ্ন ককিয়ে মরছে, শেষ পর্যন্ত পালস্ ঠিক থাকবে তো কুয়াশার! নাকি কুয়াশার মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যেই অনাবিষ্কৃত দ্বীপের সর্বনাশী বিষাক্ত পাখিটা উড়ে এসেছিল? কে বলতে পারে সেই চরম শাস্তিটাই সে দিয়ে গেল কিনা?

ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থাপত্র এখন হাতের কাছে নেই। কাছেপিঠে তেমন কিছু পাবার আশাও হাস্যকর। তা সত্ত্বেও লেগে পড়লেন পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার মি. সিম্পসন। যতো রকম জ্ঞান ছিলো তাঁর একজন অচেতন মানুষের চেতনা আনার ব্যাপারে, একে একে সব খাটালেন তিনি। কিন্তু হা হতোহাস্মি! কোনো উপায়েই কোনো পরিবর্তন হলো না। জ্ঞান ফিরলো না কুয়াশার। ব্যর্থ-মনোরথ মি. সিম্পসন ছটফট করতে লাগলেন কি করবেন ভেবে না পেয়ে।

বিশুদ্ধ পানির দরকার। কিন্তু বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা পানি পাওয়া যাবে কোথায়? ভেবে ভেবে কোনো কূল দেখতে পেলেন না মি. সিম্পসন। গরম হয়ে উঠলো তাঁর মাথা। দেরি হয়ে যাচ্ছে বড্ড। এখনো পালস্ চলছে ধীরে ধীরে। এখনো প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়নি কুয়াশার। যা হোক কিছু একটা করা দরকার এখুনি। সময় কাটছে হুহু করে। আধ ঘন্টা কেটে গেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু কই, জ্ঞান ফিরে আসার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কুয়াশার!

অস্থির হয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন। কুয়াশার মাথাটা অতি যত্নের সঙ্গে নামিয়ে রাখলেন তিনি মাটির উপর। তারপর উঠে দাঁড়ালেন সিধে হয়ে। দারুণ একটা ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর সারামুখে। চোখ দুটো আশঙ্কায় চঞ্চল।

কিছু একটা করা দরকার। এবং সময় নষ্ট না করে যা করার এখুনি করা দরকার। কিন্তু কি করার উপায় আছে? পানির জন্যে সমুদ্রের দিকে ফিরে গেলে কেমন হয়? মনে মনে ভাবলেন মি. সিম্পসন কথাটা। না; সমুদ্র থেকে পানি আনতে দেরি হয়ে যাবে। পানি আনবেনই বা কিভাবে? সামনে এগিয়ে পানির সন্ধান করাই বরং উচিত হবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। বহু কষ্টে নরম ঘাসের উপর তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন তিনি কুয়াশার জ্ঞানহীন দেহটাকে। তারপর দেরি না করে যথাসম্ভব দ্রুত

এগিয়ে চললেন সামনের দিকে কাঁটা গাছের খোঁচা খেতে খেতে। গহীন জঙ্গলে অচেতন এবং একা পড়ে রইলো কুয়াশার বিশাল শরীর।

মিনিট পাঁচেক একনাগাড়ে হাঁটার পর হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। আচমকা আটটা তীক্ষ্ণফলা বর্শা কে জানে কোথা থেকে এসে বিঁধলো তার চারপাশের মাটিতে। ঝট্ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন রিভলভার বের করার জন্যে।

'কারাই বা, কা কারাইবা, কারাই বা কা…!'

জংলীদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল দুর্বোধ্য ভাষায় আশপাশের গাছের উপর থেকে। চকিতে উপর দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন।

হিংস্র জংলীর দল গাছের উপর চড়ে বসে আছে। সংখ্যায় দশ-বারোজন হবে। হাতে তাদের তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরা। হিংস্র, বীভৎস উল্লাস ফুটে বেরুচ্ছে ওদের মুখ থেকে।

'গুড়ুম! গুড়ুম!!' গুলি করলেন মি. সিম্পসন।

'আঁ-আঁ।'

দুটো মাত্র গুলি বের হলো রিভলভারের নল দিয়ে। পরক্ষণেই একটা বিষ মাখানো তীর এসে বিঁধলো মি. সিম্পসনের ডান বাহুতে। বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেল পলকের মধ্যে। অবশ হয়ে এলো মি. সিম্পসনের সর্বশরীর। দেখতে দেখতে হাত থেকে খসে পড়লো তাঁর রিভলভারটা। থরথর করে কেঁপে উঠলেন মি. সিম্পসন। টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছেন তিনি মাটিতে। ভয়ানক পিপাসা পাচ্ছে তার। অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকছে জংলীদের হৈ-হল্লা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে ঠিক মাথার উপরের গাছটা থেকে লাফ দিয়ে পড়লো একজন জংলী মি. সিম্পসনের ঘাড়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো মি. সিম্পসনের অচেতন দেহটা মাটিতে।

মি. সিম্পসনের গুলিতে দুজন জংলীর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে দেহ ছেড়ে চিরতরে। মি. সিম্পসনকে ঘায়েল করতে পেরে বীভৎস উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠলো অর্ধনগ্ন তামাটে রঙের অসভ্যগুলো। দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে আটজন জংলী নেমে এলো মি. সিম্পসনের জ্ঞানহীন দেহের পাশে। তারপরই সকলে মিলে কাঁধে তুলে নিলো তাঁকে। তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে বয়ে নিয়ে চললো তারা মি. সিম্পসনকে তাদের রাজার কাছে। রাজা এর বিচার করবেন। যার অর্থ মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। বলি দেয়া হবে নির্ঘাৎ এই সভ্য মানুষটাকে তাদের পবিত্র জন্মভূমিতে এসে পড়ার জন্যে।

একটা স্বপ্ন দেখছিল কুয়াশা।

অসভ্য জংলীরা বর্শা হাতে ঘিরে ফেলেছে তাকে। বিরাট একটা এলাকা নিয়ে

গোল মতো করে ঘিরে ফেলেছে কুয়াশাকে জংলীরা। গম্ভীর পদক্ষেপে বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে গোল মতো জায়গাটা। চিৎকার করছে জংলীগুলো দুর্বোধ্য ভাষায়। কান পাতা দায় সেই চিৎকারে।

ঘুম ভেঙে গেল কুয়াশার এমন সময়। চোখ মেলে তাকালো সে চারপাশে। ধড়মড় করে উঠে বসলো পরক্ষণেই। কানে বাজছে এখনো জংলীদের হৈ হৈ চিৎকারটা।

উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে সে। কপালের রক্ত শুকিয়ে যাবার ফলে চিড় চিড় করে উঠলো কপালের চামড়াটুকু। তারপরই ভূপাতিত সেই সর্বনাশী বিষাক্ত পাখিটার দিকে দৃষ্টি পড়লো তার হঠাৎ। মনে পড়ে গেল সব কথা।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো কুয়াশা চারপাশে। মি. সিম্পসন কোথায় গেলেন? হঠাৎ কানে এসে বাজলো আবার জংলীদের হৈ-হৈ চিৎকারটা। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো সে কি যেন। একটু পরই কুয়াশা বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা স্বপ্নের ঘোর নয়। সত্যিই একটা হৈ-হৈ চিৎকার এগিয়ে আসছে এদিকেই।

দক্ষিণ দিক থেকে আসছে শব্দটা? উত্তর দিকে ফিরে তাকালো কুয়াশা। সেদিকে পায়ে চলা রাস্তা দেখা যাচ্ছে একটা। কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলো কুয়াশা। গন্ধ পেয়ে গেছে অসভ্য জংলীর দল অনাহূত শত্রুদের। পালাতে হবে। ধরা পড়লে চলবে না ওদের হাতে। কিন্তু মি. সিম্পসন গেলেন কোথায়? আমাকে এখানে অচেতন রেখে কোথায় যেতে পারেন তিনি, ভাবলো কুয়াশা। ধরা পড়ে যাননি তো জংলীদের হাতে?

দক্ষিণ দিক থেকেই আসছে জংলীরা। দলে দলে আসছে। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েই আসছে।

দ্রুত পায়ে উত্তর দিকের পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করলো কুয়াশা। মি. সিম্পসনের খোঁজ পরে করলেও চলবে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে হিংস্র চিৎকারটা। পালাতে হবে আগে। ঝোপ-ঝাড় ভাঙার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মটমট করে।

মিনিট তিনেক হাঁটার পরই একটা উন্মুক্ত মাঠ দেখতে পেলো কুয়াশা। এবার কোন্‌দিকে এগোনো যায় ভাবছিল সে। এমন সময় সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকাল সে। সারবন্দী হয়ে গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে শ'দুয়েক জংলী বর্শা উঁচিয়ে। এগিয়ে আসছে তার দিকেই। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে তাকালো কুয়াশা। দমে গেল সে এবার। পশ্চিম দিক থেকেও একদল জংলী এগিয়ে আসছে সারবন্দী হয়ে।

কুয়াশার পিছন দিকটা দক্ষিণ দিক, অর্থাৎ পিছন দিকে জঙ্গল। জঙ্গলের দিক থেকে জংলীদের চিৎকারটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। উত্তর দিকে অর্থাৎ তার সামনে এবং পশ্চিম দিকেও জংলীরা রয়েছে। এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে তার দিকে সতর্ক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ব্যগ্র হয়ে তাকালো কুয়াশা এবার পুব দিকে।

নেই! পুব দিকে কোনো জংলীর চিহ্নমাত্র নেই। উন্মুক্ত, শূন্য মাঠ পড়ে আছে শুধু। কিছুটা উঁচু মতো হয়ে পড়ে আছে মাঠটা। ছুটলো কুয়াশা সেই দিকে।

গাঢ় বাদামী গায়ের রঙ জংলীগুলোর। সারা মুখে লাল ও হলুদ রঙয়ের পোঁচ দেয়া। কাঁধে ঝুলছে তীর-ধনুক। হাতে তীক্ষ্ণফলা বর্শা।

মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে নজর ফেললো কুয়াশা। রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল সে। শত শত জংলী বের হয়ে এসেছে জঙ্গল থেকে। এখন আর তারা চিৎকার করছে না। অন্য দুটো দলের মতো এরাও এগিয়ে আসছে তার দিকে ধীরে, গম্ভীর পদক্ষেপে, বর্শা উঁচিয়ে।

এতো দেরি করছে কেন ওরা!

কুয়াশা দৌড়ুচ্ছে পালিয়ে যাবার জন্যে। কুয়াশার পিছন পিছন ওরাও ছুটতে পারে। কিন্তু কোনো তাড়াহুড়োর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওদের মধ্যে। এর কারণ কি!

কারণটা বুঝতে পারলো না কুয়াশা। লেসারগানটা হাত বদল করে দৌড়ুতে লাগলো সে।

আবার পিছন ফিরে তাকালো একবার কুয়াশা। আশ্চর্য হয়ে দেখলো সে যে, সব জংলীগুলোই তাদের বর্শার মুখ আকাশের দিকে করে নিয়েছে একসময়। এগিয়ে আসছে সমান তালে পা ফেলে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই।

মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিরাশ হয়ে পড়লো কুয়াশা। চওড়া একটা নদী দেখা যাচ্ছে সামনে। অসংখ্য কুমীর রোদ পোহাচ্ছে তীরে উঠে এসে। কুয়াশার সাড়া পেয়েই নড়েচড়ে উঠলো তারা। অনেকদিন মানুষের মাংসের স্বাদ পায়নি ওরা। সুযোগ এলো বোধহয় এতদিনে। সাড়া পড়ে গেল হিংস্র জলচর জন্তুগুলোর মধ্যে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কুয়াশা। এতক্ষণে বুঝতে পারছে সে জংলীরা কেন এমন ধীর এবং শান্ত পায়ে তার পিছন পিছন ধাওয়া করে আসছে। ওরা তো জানেই সামনে ছাড়া অন্য কোনোদিকে এগোতে পারবে না কুয়াশা। এগোবার চেষ্টা করলেই প্রাণ দিতে হবে বর্শার মুখে। আর সামনে এগিয়ে গেলে আরও বীভৎস মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে-হিংস্র কুমীরগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে খাবে।

এমন একটা বিপদে পড়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো কুয়াশা। জংলীগুলোকে বোঝানো সম্ভব নয় যে, সে ওদের শত্রু নয়। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় লেসারগান। তা না হলে তাকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এতগুলো বুদ্ধিহীন মানুষকে পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে!

অসভ্য ওরা। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ জানে না। বোঝে না কে শত্রু কে মিত্র। ওদের চোখে ওরা ছাড়া সকলেই খারাপ। সকলেই বদ, শত্রু। কিন্তু তাই বলে ওদেরকে কি মেরে ফেলা উচিত কাজ হবে?

না। তা পারবে না কুয়াশা। কোনো একটা উপায় বের করতেই হবে। যাতে একবিন্দুও রক্তপাত না হতে পারে।

নদীর দিকে তাকালো কুয়াশা। আরে! এই তো কি চমৎকার একটা উপায় তৈরি করা রয়েছে। কুয়াশা দেখলো নদীর পাড়ে বাঁধা রয়েছে ছোটো একটা নৌকো। কেউ যেন তার জন্যেই আগে থেকে নৌকোটা রেখে গেছে এখানে।

দেরি করলো না কুয়াশা। ছুটে চলে এলো নৌকোটার কাছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়লো সে সেটায়। ঠিক তখুনি দেখা গেল জংলীরা দলে দলে এসে পড়েছে একবারে কুয়াশার একশো হাতের মধ্যে।

দাঁড়টা তুলে নিয়ে পানিতে ফেললো কুয়াশা। কিন্তু হা হতোহাস্মি! নৌকোটা যে তিন তিন জায়গায় ফুটো!

ফুটোগুলো দিয়ে পানি উঠছে দ্রুত। এভাবে পানি উঠতে থাকলে মিনিটখানেকও লাগবে না নৌকোটা ডুবে যেতে। পা দিয়ে চেপে ধরলো কুয়াশা দুটো ফুটো। এদিকে পনেরো কুড়িটা কুমীর মাথা তুলে এগিয়ে আসছে নৌকোর দিকে।

লেসারগানের মুখ তুলে ধরলো কুয়াশা কুমীরগুলোর দিকে লক্ষ্য করে। গোটা তীর থেকে হাত চার-পাঁচ সরে এসেছে । দুটো কুমীর এগিয়ে এসে পাশ থেকে গায়ের ধাক্কা মেরে উল্টে দেবার তালে আছে নৌকোটাকে। ট্রিগার টিপলো কুয়াশা। অদৃশ্য হয়ে গেল দুটো কুমীরের মাথা। ভীষণ একটা তোলপাড় উঠলো পানিতে। খানিকটা জায়গার পানি ধোঁয়ার সৃষ্টি করে উড়ে গেল উপরের দিকে। রক্তে লাল হয়ে গেল নদীর পানি। থমকে দাঁড়ালো জংলীরা। চোখগুলো তাদের বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

অসংখ্য কুমীর এগিয়ে আসছে এবার দলে দলে। আবার লেসারগানের ট্রিগার টিপলো কুয়াশা কুমীরগুলোকে লক্ষ্য করে। আড়াল হয়ে গেল সামনের দিকটা ধোঁয়ায়। পানির চারপাশে দারুণ একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল মুণ্ডহীন কুমীরগুলোর তড়পানিতে। লালে লাল হয়ে উঠলো নদীর পানি। জংলীগুলো বিচলিত হয়ে তাকালো পরস্পরের দিকে। ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাদের চোখেমুখে।

লাইন বন্দী জংলীগুলোর দিকে তাকালো এবার কুয়াশা। বর্শাগুলো আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওরা এখনো। বর্শাগুলোর মাথা লক্ষ্য করে লেসারগানটা তুলে ধরলো এবার কুয়াশা। ট্রিগার টিপে লেসারগানের নলটা ধীরে ধীরে একদিক থেকে অন্যদিকে ঘোরালো সে। মুহূর্তের মধ্যেই নেই হয়ে গেল শত

শত বর্শার অর্ধেকটা করে।

মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল জংলীদের মধ্যে। ভেঙে গেল লম্বা সারবন্দী লাইনগুলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ওরা দেখতে দেখতে। তারপরই দেখা গেল সবাই পিছন ফিরে পালাতে শুরু করেছে এলোমেলোভাবে ভয়ার্ত আর্তনাদ করতে করতে।

আধ মিনিটের মধ্যে গায়েব হয়ে গেল মূর্তিমান ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার কারণ। পালাতে দিশে পেলো না অসভ্য জংলীগুলো মারণরশ্মির অলৌকিক কেরামতি দেখে।

এদিকে আরো কুমীর এগিয়ে আসছে নৌকোর দিকে। চারপাশে পানির রঙ রক্তে লাল হয়ে গেছে। লেসারগানটা একহাতে শক্ত করে চেপে ধরে তীরের দিকে লাফ দিলো কুয়াশা। ডুবে গেল এতক্ষণে জলভর্তি নৌকোটা। এতক্ষণ দু'টো পায়ের চেটো দিয়ে নৌকার দুটো ফুটো চেপে রেখেছিল কুয়াশা। একটিমাত্র ফুটো দিয়ে পানি উঠছিল তার ফলে। তা না হলে অনেক আগেই ডুবে যেতো নৌকোটা।

মাঠের মাঝখানে আবার ফিরে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। জঙ্গলে ঢুকতে হবে তাকে আবার। মি. সিম্পসনকে খুঁজে বের করতে হবে। কে জানে ইতিমধ্যে কি দশা হয়েছে তাঁর। তিনি যদি কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে ধরা পড়ে গিয়ে থাকেন অসভ্য জংলীদের হাতে তাহলে আর তাঁর রক্ষা নেই। উদ্ধার করতে হবে তাঁকে। তাছাড়া সমুদ্রতীরে একটা লাইফবয় দেখেছিল তারা। সেই লাইফবয়ে কে এসে উঠেছে এই দ্বীপে, সেটা জানতে হবে যেমন করে হোক। বাঁচাতে হবে ওদেরকে জংলীদের কবল থেকে।

আবার এগিয়ে চললো কুয়াশা মাঠের উপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় করে।

তিন

এ কোথায় এসে পড়লাম!

সেদিনই সকালবেলা মহুয়ার লাইফবয়টা জোয়ারের টানে অসভ্য জংলীদের দ্বীপের তীরে এসে ঠেকতেই জ্ঞান ফিরে এলো তার।

সমুদ্রের ভীষণ মূর্তি দেখে, ক্লান্তিতে ও ভয়ে গতরাতে বারবার অচেতন হয়ে পড়েছিল মহুয়া লাইফবয়ের উপর।

এ কোন অচেনা দেশে এসে পড়লাম! কোনো জন-মনিষ্যির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলাকীর্ণ মনে হচ্ছে। এটা কি একটা দ্বীপ? কাদের অধিকারে আছে এই দ্বীপ? কিভাবে গ্রহণ করবে এখানকার মানুষ আমাকে? একা দুর্বল মেয়েমানুষ

আমি! সাহায্য করবে তো এখানকার মানুষ আমাকে? নাকি একা মেয়েমানুষ দেখে জুলুম সইতে হবে···

নানা রকম দুশ্চিন্তার কথা ভাবতে ভাবতে লাইফবয় থেকে তীরে নেমে পড়লো মহুয়া। সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কি যেন খুঁজলো সে, কি যেন দেখার চেষ্টা করলো সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তারপর নিরাশ হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে দ্বীপটার চারপাশটা দেখতে লাগলো অসহায় ভঙ্গিতে।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। ভিজে শরীর সামুদ্রিক হাওয়া লেগে শুকিয়েছে বটে, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে ভাবটা কাটেনি মোটেই। নোনা পানি শুকিয়ে যাবার পরও শরীর চটচট করছে কেমন যেন। আর অসম্ভব ক্লান্তিতে শরীর হালকা হয়ে গেছে। যেন এক'পা হাঁটার শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই।

ধীরে ধীরে বালুকাবেলা ছাড়িয়ে এলো মহুয়া। দুরুদুরু করছে বুকের ভিতর। এ কোথায় এসে পড়লো সে!

বালুকাবেলা ছাড়িয়ে একটা বড় পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো মহুয়া। হু হু করে উঠলো তার বুকটা নিজের অসহায় অবস্থার কথা কল্পনা করে। নিঃশব্দ ধারায় দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা।

শহীদের কথাই তার মনে পড়ছে অহরহ। বেঁচে আছে তো সে? নাকি সমুদ্রের অতলতলে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে···ভাবতে ভাবতে থরথর করে কেঁপে উঠলো তার সর্বশরীর। শিউরে উঠলো বুকটা অমঙ্গল আশঙ্কায়। তওবা তওবা করে অমঙ্গল চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো সে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে আবার সমুদ্রের দিকে তাকালো সে।

মাগো! একি, এরা কোথা থেকে এলো! কারা এরা? তামাটে রঙের মোটা মোটা দুজন লোক দেখছি যে! এরা তো সভ্য মানুষ নয়···তবে কি দ্বীপটা অসভ্য জংলীদেরই···

প্রায় উলঙ্গ দুজন অসভ্য জংলী বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে মহুয়ার পরিত্যক্ত লাইফবয়টার সামনে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে জংলী দুজন। কি যেন বললো একজন অন্যজনকে। শুনতে পেলো না মহুয়া ওদের কথা। পিট পিট করে চারদিকে তাকালো ওরা দুজন। কাকে যেন খুঁজছে ওরা। উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওদের চোখেমুখে। হিংস্র একটা উল্লাস যেন খেলে বেড়াচ্ছে ওদের অঙ্গভঙ্গিতে।

ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল মহুয়ার। চট্ করে পাথরের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে ফেললো সে। শুধু মুখটা সামান্য একটু বের করে দুরুদুরু বুকে তাকিয়ে রইলো অদ্ভুতদর্শন লোক দুজনের দিকে।

কালো পিচের মতো রঙ দিয়ে জংলী দুজনের হাত দুটোতে বিদঘুটে ছবি আঁকা। এক হাতে বর্শা ধরা। কাঁধে তীর-ধনুক। মুখে নানা রঙের পোঁচ।

এক'পা এক'পা করে লাইফবয়টার কাছাকাছি এগিয়ে গেল ওরা দুজন। তারপর কিচিরমিচির করে কি যেন বলা-কওয়া করলো খানিকক্ষণ। হঠাৎ মাটিতে ঝুঁকে পড়লো দুজনই একসাথে লাইফবয়টার দিকে। ছোঁ মেরে তুলে নিলো একজন লাইফবয়টা পলকের মধ্যে কাঁধের উপর। কেউ যেন জিনিসটা কেড়ে নেবার তালে আছে তাদের হাত থেকে। কাঁধে তুলে নিয়েই তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ছুট দিলো জঙ্গলের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল জংলী দুজন।

খিদেটা এতক্ষণ ভুলে ছিলো মহুয়া। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো জংলী দুজন চোখের সামনে থেকে সরে যেতেই আবার চেগিয়ে উঠলো প্রচণ্ড খাই খাই অনুভূতিটা। জঙ্গলের দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেছে জংলী দুজন। অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো মহুয়া। পুব দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। তেমন কিছু পাবার আশা না থাকলেও বনভূমিতে ফল-পাকড়ের গাছ আছে নিশ্চয়। এখন তাই পেলেই রক্ষে। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে কি দুর্ভোগ আছে তা একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে।

কাঁটা গাছে বেধে যাচ্ছে শাড়ি।

দু'পা হেঁটেই থামতে হচ্ছে মহুয়াকে। ঝোপ-ঝাড় টপকে টপকে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। এখনো পায়ে চলা একটা রাস্তাও কোনদিকে দেখতে পায়নি সে।

জানে না সে কোন অচিন মুল্লুকে ভেসে এসেছে। অভুক্ত শরীরে হাঁটার পরিশ্রম সইতে বড় কষ্ট হচ্ছে তার। এই দুর্গম জঙ্গলে দ্বীপ থেকে কোনদিন আবার মুক্ত বিশ্বে ফিরে যেতে পারবে কিনা তাও সে জানে না। সে জানে না, তার স্বামীর কি দশা হয়েছে। কোথায় কেমন হালে সে এখন আছে তা একমাত্র খোদাই জানে। যেভাবেই থাকুক, বেঁচে থাকে যেন সে-প্রার্থনা জানালো মহুয়া খোদার দরবারে। কামাল ও গফুরের দশাই বা কি হলো? আর তার দাদা কুয়াশা?. মি. সিম্পসন?

হু হু করে উঠলো মহুয়ার বুকের ভিতরটা। চোখ থেকে জলের ধারা ঝরতে শুরু করলো আবার।

যাচ্ছিলো তারা সবাই মিলে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। শহীদ জানতো, তাকে না নিয়ে যেতে চাইলে সে নিজেও যেতে পারবে না। কান্নাকাটি শুরু করে দেবে তাহলে মহুয়া। তাই সঙ্গে না নেবার প্রশ্নই তোলেনি শহীদ। কিন্তু একি মহা সর্বনাশ ঘটে গেল মাঝপথে! এখনো যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ঘটনাটা। এমনটি যে হবে তা তো কেউ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। পৃথিবীর সব সুখ-স্বস্তি, বেঁচে থাকার সামান্যতম আশা, অবলম্বন সব এমন করে হারিয়ে যাবে জীবন থেকে তা কি কেউ জানতো? এতো দুঃখেও হাসি পেলো মহুয়ার। জীবনের কথা ভাবছে কেন সে? বেঁচে থাকার কথা এখন চিন্তা না করাই ভালো। জংলীদের বর্শার মুখে

যে প্রাণ যাবে না তা কি কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে?

এক ঢোক পানিও পাওয়া যাবে না কোথাও!

এখনো এমন কোনো গাছ দেখতে পায়নি মহুয়া যাতে কোনো না কোনো রকম ফল ধরে আছে। কিন্তু পেট ভরাবার জন্যে না হয় কিছু না-ই পাওয়া গেল, গলা ভেজা-বার জন্যে এক ঢোক পানিও পাবার আশা নেই!

গাছের উপর তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল মহুয়া। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো সামনের দিকে গাছের সংখ্যা কমে আসছে। আরো একটু এগোলো সে। অকারণ খুশিতে বুকটা নেচে উঠলো তার। সামনে একটা ছোট্ট মাঠ মতো দেখা যাচ্ছে।

প্রখর রোদের মধ্যে দিয়ে ছোটো মাঠটা পেরিয়ে আবার ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলো মহুয়া। এবার একটা পায়ে চলা পথ পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে, ক্লান্ত শরীরের বোঝা বইতে বইতে কোনমতে হাঁটছিলো সে। ছিঁড়ে গেছে শাড়িটা কাঁটার খোঁচা লেগে অসংখ্য জায়গায়। রক্ত ঝরছে পায়ের তলা থেকে। সর্বশরীর বেয়ে নামছে নোনা ঘাম। চুলের খোঁপা খুলে গিয়ে মুক্তকেশী হয়ে পড়ছে সে। পাগলিনী পারা হয়ে হাঁটছে এক মুঠো খাবার এবং এক ঢোক পানির আশায়। হাঁটছে সে মন্থর গতিতে। তার দু'চোখ বেয়ে ঝরছে অনবরত জলের ধারা। তার স্বামী, গর্বের বস্তু দাদা, কামালের মতো দেবর, গফুরের মতো প্রভুভক্ত সেবক এবং শুভানুধ্যায়ী মি. সিম্পসনের জন্যে চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে অনর্গল ধারায়।

ওটা কি! ওটা কি পড়ে রয়েছে! একটুকরো কাপড় না? ওটা, ওটা তো···

চমকে উঠলো মহুয়া। থমকে দাঁড়ালো সে পায়ে-চলা সরু পথটার উপর। আশায় আনন্দে, সবরকম বিপদের আশঙ্কা ভুলে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো তার। একটুকরো ছেঁড়া কাপড় পড়ে রয়েছে পথের উপর। ঠিক তার হাত পাঁচেক দূরে হবে। ক'পা এগিয়ে গিয়ে খপ্ করে তুলে নিলো মহুয়া কাপড়ের টুকরোটা। চিনতে বিলম্ব হলো না, জিনিসটা কার। গফুর ওই কাপড়ের শার্ট পরে ছিলো। এটা তারই শার্টের ছেঁড়া টুকরো।

কিন্তু গফুরকে দেখা যাচ্ছে না তো! কোথায় সে? তার শার্ট ছিঁড়লই বা কিভাবে?

দপ্ করে নিভে গেল মহুয়ার চোখমুখ থেকে শত প্রদীপের উজ্জ্বল আলো। ব্যস্ত-ব্যাকুল চোখে তাকালো সে এদিক ওদিক। দু'পাশে শুধু গহীন জঙ্গল। সম্মুখদিকে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে সরু পথটা। পিছনেও ফেলে এসেছে সে পথের খানিকটা অংশ। কই, কোথাও দেখা যাচ্ছে না তো গফুরকে!

'গ-ও-ও-ফু-উ-উ-র···গ-ও-ও-ফু-উ-উ-র!'

বারবার ডাকলো মহুয়া গফুরের নাম ধরে আশায় নিরাশায় দুলতে দুলতে। সে থামতেই তার মনে হলো বহুদূর থেকে কার যেন একটা ক্ষীণ অথচ গম্ভীর মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বেশ খানিকক্ষণ ধরেঃ আ-আ-আ-স-ছি-ই-ই-ই!

কানের ভুল নয় তো? ভাবলো মহুয়া। আবার যতো জোরে সম্ভব গফুরের নাম ধরে ডাকলো সে। কিন্তু এবার আর তার ডাকের প্রত্যুত্তর শোনবার সুযোগ হলো না মহুয়ার। পায়ের পাতার উপর সড়সড় করে উঠলো কি যেন। শিরশিরিয়ে উঠলো মহুয়ার সর্বশরীর। সাপ না কি?

চকিতে পায়ের দিকে তাকালো মহুয়া। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে। পলকের মধ্যে দু'পা পিছিয়ে এলো সে নিজেরই অজান্তে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে। কিন্তু তারপরই ভয়ঙ্কর এবং অবাঞ্ছিত বিপদ দেখে অবশ হয়ে গেল সে পাথরের মতোই। নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে ফ্যালফ্যাল করে মাটির দিকে তাকিয়ে।

কয়েকটা সবুজ দড়ি এগিয়ে আসছে। সাপেরই মতো দেখতে কয়েকটা দড়ি এগিয়ে আসছে সড়সড় করে। চার-পাঁচ গজ লম্বা সবুজ রঙের দড়ির মতো দেখতে জিনিসগুলো। পায়ে চলা পথ থেকে বেশ খানিকটা দূরে অস্বাভাবিক বড় আকৃতির একটা ফুল ফুটে রয়েছে। রাক্ষসী পদ্ম ফুল ওটা। এতবড় ফুল দেখা তো দূরের কথা, মহুয়া শোনেওনি এর কথা। ফুলটার গোড়া থেকে সাত-আটটা সবুজ দড়ির মতো ডাল বেরিয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে নানাদিকে। বিছিয়ে আছে মাটির উপর। জলজ্যান্ত একটা মানুষের গন্ধ পেয়ে লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে রাক্ষসী ফুলটার পক্ষে। ডালগুলো সাপের মতো এগিয়ে আসছে বুকে হেঁটে মহুয়ার দিকে।

মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছে মহুয়া! মৃত্যুভয় জাগছে তার মনে। বিমূঢ় বিস্ফারিত হয়ে উঠলো মহুয়ার চোখের দৃষ্টি। অচেতন হয়ে পড়েছে সর্বশরীর। কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে মহুয়া নিজের। নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে সে দু'পা মাত্র পিছিয়ে এসে সেই একই জায়গায়। ক্রমশ এগিয়ে আসছে সড়সড় করে বুকে হেঁটে দুটো সবুজ ডাল।

বিপদের ভয়াবহতা বুঝতে পারছে মহুয়া। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার, যে তাকে পেঁচিয়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে বিরাটাকার ঐ রাক্ষসী ফুলটার মধ্যিখানে। সঙ্গে সঙ্গে ফোটা ফুলটা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার ফুটবে ওটা খানিকক্ষণ পর। তখন আর মহুয়ার সামান্যতম চিহ্নও থাকবে না ওর মধ্যে। হজম করে ফেলবে সহজেই মানুষখেকো ঐ রাক্ষসী ফুলটা এতো বড় একজন মানুষের দেহ।

আবার পায়ের পাতায় স্পর্শ পেলো মহুয়া একটা ডালের। শেষ মুহূর্তে শরীরের অসাড়তা কেটে গেল তার পলকের জন্য মাত্র। ভয়ার্ত একটা অস্ফুট শব্দ করে আবার দু'পা পিছিয়ে এলো সে। তারপর আর নড়ার শক্তি রইলো না। দাঁড়িয়ে রইলো সে কাঁপতে কাঁপতে, ঘামতে ঘামতে। এগিয়ে আসছে আবারও ডাল দুটো নাছোড়বান্দার মতো সড়সড় করে।

অদ্ভুত ব্যাপার!

এবারের স্পর্শটুকু আশঙ্কা করেনি মহুয়া। পিছন দিক থেকে কি যেন স্পর্শ

করলো এবার তার ডান পায়ে। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শিউরে উঠলো সে। সামনের ডাল দুটো এখনো ইঞ্চি কয়েক দূরে রয়েছে। এ তবে কিসের ছোঁয়া লাগে তার পায়ে!

দারুণ ভয়ে পিছন ফিরলো মহুয়া। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো তার চোখের দৃষ্টি। ঠাণ্ডা হিম হয়ে উঠলো সর্বশরীর। কাঁপছে সে থরথরিয়ে। দু'হাতে চোখ ঢেকে কুঁকড়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়তে ইচ্ছে করলো মহুয়ার। কিন্তু পারলো না সে। নড়াচড়ার একবিন্দু শক্তিও তার দেহে অবশিষ্ট নেই।

এবার পিছন দিক থেকে এসেছে অন্য একটা রাক্ষসী ফুল গাছের দুটো ডাল। দেখতে দেখতে মহুয়ার ডান পা-টা পেঁচিয়ে ধরলো দড়ির বাঁধনের মতো একটি ডাল। অপর ডালটিও এসে পড়লো। দু'খানি পা-ই পেঁচিয়ে ধরার জন্যে মুখ বাঁকিয়ে এগিয়ে এলো সেই ডালটা। পেঁচিয়ে ধরে ফেললো ধীরে সুস্থে দু'খানি পা-ই নির্বাধায়।

সবচেয়ে বড় ভয়, সবচেয়ে ভীষণ ভয়—মৃত্যুভয়!

মৃত্যুভয়ে চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে মহুয়ার। এমন সময় ডাল দুটোর শক্ত কঠিন টানে মাটিতে পড়ে গেল মহুয়া ধপাস করে। আরো তিনটে ডাল এগিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। পেঁচিয়ে ধরেছে সেগুলোও মহুয়ার গলার কাছে, কোমরে এবং হাঁটুর কাছটায়। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে মৃত্যু গহ্বরে।

এতক্ষণে প্রাণে বাঁচবার আকুল ইচ্ছেটা শক্তি এনে দিয়েছে তার শরীরে। ছটফট করছে মহুয়া। ছটফট করছে তিন-চারটে ডালের শক্ত কঠিন বাঁধন থেকে ছাড়া পাবার জন্যে। এমন সময় প্রথম ফুলগাছটার ডালগুলো পেঁচিয়ে ধরলো তাকে উল্টোদিক থেকে। সড়সড় করে ঐ ডালগুলোও এসে পড়েছে কখন যেন।

একেই সম্ভবতঃ বলে টাগ-অব-ওয়ার!

টানা হেঁচড়া শুরু হয়ে গেল দুটো রাক্ষসী ফুল গাছের ডালগুলোর মধ্যে মহুয়াকে নিয়ে। কোমরের উপর একটা ডালের শক্ত বেষ্টনী ক্রমেই চেপে বসেছে। কষ্ট হচ্ছে মহুয়ার। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ। ব্যথার চোটে জল এসে গেছে চোখের কোণে। এদিকে ভেঙে যাবার দশা হয়েছে উরু দুটো। এখন আর কোনদিকেই এগোচ্ছে না মহুয়ার দেহ। দুদিক থেকে দুপক্ষের ডালের প্রবল টানে মাঝখানে স্থির হয়ে পড়ে আছে সে। শরীরের সবকটা হাড়গোড় ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে টানা-হেঁচড়ার ফলে।

গলার উপর চাপ বাড়তে শুরু করেছে। নীল হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে সারা মুখ। হাত দুটো এখনো ধরতে দেয়নি মহুয়া। গলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু সামান্যতম সুবিধেও করা যাচ্ছে না। ক্রমেই শক্ত হয়ে

চেপে বসছে ডালটা গলার চারপাশে।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলো মহুয়া—বাঁ-চা-ও-আ-আ-ও! আর সইতে পারছে না সে কষ্ট। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে বুক ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে দম। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে দেহ। শক্তি নেই আর সংগ্রাম করার।

আবার একবার চিৎকার করার চেষ্টা করলো মহুয়া। পারলো না। গলা দিয়ে একটুও শব্দ বের হলো না এবার।

'হিস্‌স্! হিস্!! হিস্‌স্!!!'

ঢিলে হয়ে গেল একদিকের ডালগুলোর টান্না-হেঁচড়া। গলাটা ছাড়া পেয়ে চোখ বন্ধ রেখেই নিঃশ্বাস ফেললো মহুয়া। বুক ভরে শ্বাস নিলো। তারপর হাঁপাতে লাগলো শব্দ করে। চোখ দুটো বন্ধ করেই রাখলো। কি ঘটেছে তা ভেবে দেখার শক্তিও তার নেই। কিন্তু কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই! কি ঘটলো।

ধীরে ধীরে চোখ মেললো মহুয়া।

'ভয় নেই আর, মহুয়া! এসে পড়েছি আমি।'

কুয়াশার কণ্ঠস্বর। লেসারগানের ট্রিগার টিপতে টিপতে মহুয়ার উদ্দেশ্যে আশ্বাসের হাসি হেসে তাকালো সে।

স্বপ্ন নয় তো? মহুয়া তার দাদাকে দেখে বিশ্বাস করতে পারলো না সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অবিশ্বাস করারও তো উপায় নেই। লেসারগান হাতে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে কুয়াশাকে রাক্ষসী ফুলগাছের ডালগুলোকে শেষ করে দেবার কাজে।

'উঠে পড় এবার।'

মহুয়া এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি ব্যাপারটা। আসলে রাক্ষসী ফুল গাছ একটি বা দুটি নয়, অসংখ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে ঐ ভয়ঙ্কর পদ্মফুল এদিক ওদিক। এগিয়েও আসছে এখনো সেই সব ফুলের ডালগুলো দু'জন মানুষের সাড়া পেয়ে। কুয়াশা ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবগুলো ফুল এবং ফুলের ডালগুলোকে শেষ করে দিতে।

'ডানদিকে সরে গিয়ে দাঁড়া, মহুয়া।'

মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনে সরছিল মহুয়া। কুয়াশার কথায় দিক পরিবর্তন করে ডান ধারে পিছু হটতে শুরু করলো।

সরে যাচ্ছে মহুয়া পেছন দিকে! ভুল করছে সে। আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে রয়েছে এখনো। ভয় কাটছে না তার একবিন্দুও। কুয়াশাকে দেখেও তার সাহস সঞ্চয় হচ্ছে না। পিছিয়ে যাচ্ছে সে অপ্রকৃতিস্থের মতো। চোখ দুটো এখনও বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে তার। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে সে। সারামুখে ভয়ের রেখা ফুটে রয়েছে তার বিপদ-মুক্তির পরও।

থামবার কথা ভাবছে না মহুয়া। ভাবতে পারছে না সে কিছুই। কুয়াশা অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাক্ষসী ফুলগাছগুলোর সংখ্যাহীন ডালগুলোকে মারণরশ্মি দিয়ে

পোড়াতে। পিছু হটছে সেই থেকে মহুয়া। দূরে, বহুদূরে সরে যেতে চাইছে সে। পালাতে হবে। পালাতে হবে রাক্ষসী ফুল গাছের আওতা থেকে। স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টি পড়ে আছে মহুয়ার সামনের দিকে। অসহায় একটা আকুতি ফুটে আছে তার চোখ-মুখে।

পিছন ফিরে হাঁটছিল সে। একবারও পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেনি বলেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে পিছন দিকে পা মচকে পড়ে গেল মহুয়া। জায়গাটা হঠাৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে হাত পাঁচ-সাত। পা ফসকে নিচে নেমে এলো মহুয়া মাটির উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে।

উঁচু মতো একটা কিছুতে মাথাটা এসে ঠেকলো। গাছের গুঁড়ি বলে তো মনে হচ্ছে না? ব্যথা পেলো না সে কেন?

নিঃসাড় পড়ে রইলো মহুয়া কিছুক্ষণ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়লো কয়েকটা। কিন্তু একি! এমন হচ্ছে কেন? মাথাটা ঘুরে উঠলো নাকি? না তো! এ যে দেখা যাচ্ছে···আশ্চর্য! মাথাটা দুলছে কেন তার? নড়ছে কেন মাথাটা? আরে, ধীরে ধীরে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে যে মাথাটা!

ক্লান্তি ভুলে ধড়মড় করে উঠে বসলো মহুয়া। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সে পিছনে। তাকাবার সাথে সাথে 'মাগো'! বলে ককিয়ে উঠলো সে।

বিরাট একটা পাইথন সাপের দেহ। কুণ্ডলী পাকানো লেজটা দেখা যাচ্ছে শুধু। লেজটার উপরই এতক্ষণ মাথা রেখে পড়ে ছিলো মহুয়া। কুণ্ডলী পাকানো লেজটা বাইরে রেখে শরীরের প্রায় সবটাই একটা গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল পাইথনটা। গর্ত থেকে বিশাল শরীরটা ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে এখন।

উপর্যুপরি মৃত্যুমুখে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে মহুয়া। বারবার মৃত্যুভয় জাগাতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। এতও ছিলো তার ভাঙা কপালে!

চেতনহারা মহুয়া বসে রইলো সেই একই জায়গায় নিঃসাড়। নিঃশ্বাস আটকে গেছে যেন তার। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে অবিশ্বাসে সাপটার দিকে। মনে মনে ভাবছে সে—এতো ভয়ানক মৃত্যু ছিলো শেষ পর্যন্ত তার কপালে!

মহুয়া টের পেলো না নতুন আর একটা বিপদ! চার-পাঁচজন অসভ্য জংলী ঝোপের পাতা ফাঁক করে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওর দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে।

গর্ত থেকে বিরাট শরীরটা বের করে মহুয়ার দিকে ঘুরছে এখন পাইথনটা। নিঃশ্বাস পড়বার শব্দ হচ্ছে হিসহিস করে ভয়াল সাপটার। ঝোপ-ঝাড়ের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন প্রতিটি নিঃশ্বাস পড়বার সাথে সাথে। ঘুরছে সাপটা এখনো মহুয়ার দিকে।

মৃত্যুর দিকে নিথর তাকিয়ে আছে মহুয়া। শক্তি পাচ্ছে না সে পালাবার। গলায় জোর নেই কুয়াশাকে ডাকবার। মৃত্যু এবার অবধারিত বুঝতে পারছে সে।

কেউ নেই যে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে তাকে।

বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে সাপটা। লকলকে সরু লোভাতুর জিভ বেরিয়ে পড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। মোটা শরীরটা সড়সড়িয়ে এগোচ্ছে এবার মহুয়ার দিকে।

শিরশির করে উঠলো মহুয়ার সর্বশরীর। বোকার মতো করুণ মিনতিভরা চোখে তাকিয়ে রইলো সে সাপটার দিকে। হঠাৎ যেন একটা স্বপ্নের দৃশ্য ভেসে উঠলো মহুয়ার চোখের সামনে। পূর্ব পরিচিত 'হিস্‌স' করে একটা শব্দ কানে ঢুকলো তার। এক ঝলক চোখ ঝলসানো তীব্র আলো এসে পড়লো পাইথনটার মাথায়। ভয়ঙ্কর একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল সাথে সাথে।

অদৃশ্য হলো পাইথনটার মাথা। মুণ্ডুহীন পাইথনটা মহা-আক্ষেপে তড়পাতে লাগলো। কেঁপে উঠলো চারপাশের বনভূমি।

নেমে এলো কুয়াশা উঁচু জায়গাটা থেকে লাফ দিয়ে। উপর থেকেই মারণরশ্মির সাহায্যে সাপটার বারোটা বাজিয়েছে সে।

একেবারে শেষ করে ফেলা দরকার সাপটাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করে বেড়াচ্ছে সে। চারপাশের গাছ-গাছড়া উপড়ে ফেলছে শরীরের বাড়ি মেরে মেরে। মৃত্যুপথযাত্রী পাইথনটার লেজের বাড়ি যদি লাগে তবে দেখতে না দেখতে মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হতে হবে।

মহুয়াকে উঠিয়ে নিয়ে দূরে দাঁড় করিয়ে দিলো কুয়াশা। সতর্ক হয়ে ফিরে গেল সে সাপটার যতোটা সম্ভব কাছে। অপেক্ষা করতে লাগলো সে লক্ষ্য স্থির করার জন্যে। মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে পারছে না পাইথনটা যন্ত্রণার প্রকোপে।

মিনিট খানেক লাগলো কুয়াশার পাইথনটাকে পুড়িয়ে শেষ করতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে এতক্ষণে। মহুয়ার দিকে ঘুরলো সে মুখে আশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে। কিন্তু কোথায় মহুয়া!

চমকে উঠলো কুয়াশা। নেই তো মহুয়া! যেখানটায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সে সেখানে দেখা যাচ্ছে না মহুয়াকে। দ্রুত এদিক ওদিক ঘুরে তাকালো কুয়াশা। কই! কোথায় গেল আবার সে।

'মহুয়া!'

কোনো উত্তর এলো না কোনো দিক থেকে। আবার কয়েকবার মহুয়ার নাম ধরে ডাকলো কুয়াশা। চিক চিক করে ডেকে উঠলো একটা পাখি, গাছের ডাল থেকে উড়ে যেতে যেতে। মহুয়ার সাড়া পাওয়া গেল না।

কি মনে করে একটা উঁচু মতো গাছে চড়তে শুরু করলো কুয়াশা তরতর করে। গাছটার মগডালে উঠে নিরাশ হতে হলো তাকে। উপর থেকে বনভূমি দৃষ্টিগোচর হলো না। গাছের সবুজ মাথা দেখতে পেলো সে বহুদূর অব্দি। আরো অনেক দূরে দৃষ্টি দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলো সে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বাঁশের তৈরি গোল গোল গম্বুজ মতো। জংলী অধিবাসীদের গ্রাম ওটা।

নেমে এলো কুয়াশা ব্যস্ত হয়ে। কি করা যায় ভেবে ঠিক করতে পারছে না

সে। উপর্যুপরি বিপর্যয় এবং ভাগ্যের বিদ্রূপে দিশেহারা হয়ে পড়ার মতো মনের অবস্থা হয়েছে তার।

কি করা যায় এখন, কি করলে মহুয়ার খোঁজ পাবে সে?

চার

কে যেন গফুরের শার্ট ধরে আস্তে আস্তে টানছে!

সেইদিনেরই সকাল বেলার ঘটনা। সূর্য আকাশের উপরে উঠে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু ঘুম ভাঙেনি এখনও গফুরের পুরোপুরি। তন্দ্রার আমেজ কাটবো কাটবো করেও কাটছে না।

গতরাতে শেষবার অচেতন হয়ে পড়ে গফুর মস্ত উঁচু একটা ঢেউয়ের উপরে চড়ে। ঢেউটা যখন লাইফবয়টাকে তীব্রবেগে উপর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তখনই জ্ঞান হারায় সে। তারপরের সব ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞ সে। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে এলেও ঘুম ভাঙেনি তার।

ঢেউয়ের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে অসভ্যদের এই দ্বীপে উঠে এসেছিল গফুরের লাইফবয়। বালুকাবেলা পেরিয়ে লাইফবয়টা বনভূমিতে ঢুকে পড়েছিল প্রবল পানির তোড়ে। গফুরকে মাটিতে ফেলে রেখে আবার ভেসে গেছে লাইফবয়টা। সেই থেকে একভাবে এলিয়ে পড়ে আছে সে মাটির উপর।

পাতলা হয়ে এসেছে গফুরের ঘুম। অস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছে সে কে যেন তার শার্টের কোনা ধরে টানছে ধীরে ধীরে!

চোখ না মেলেই হাত ঝাপটা মারলো গফুর। আটকে গেল হাতটা। কে যেন খপ্ করে তার হাতটা কিসের মধ্যে ভরে নিলো। কুসুম কুসুম গরম মনে হলো হঠাৎ হাতের আঙুলগুলো। কে যেন তার আঙুলগুলো চুষছে মনে হলো। ভিজে যাচ্ছে আঙুলগুলো পিচ্ছিল রস লেগে।

'কি জ্বালাতনে পড়া গেল!' বিড়বিড় করতে করতে অগত্যা চোখ মেলে তাকালো গফুর।

ধক্ করে উঠলো বুকটা চোখ মেলতেই। এ কোথায় রয়েছে সে! চারপাশে এমন জঙ্গল কেন! আর ওটা, ওটা কি জানোয়ার? কি নাম ঐ জানোয়ারটার?

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো গফুর মাটি থেকে। প্রথমেই দৃষ্টি পড়লো তার গায়ের শার্টের দিকে। শার্টের অর্ধেকটাই তার নেই। অদ্ভুত জানোয়ারটার দিকে চোখ ফেললো গফুর। দশ হাত দূরে লেজের উপর সম্পূর্ণ শরীরের ভর দিয়ে চারপেয়ে জন্তুটা দাঁড়িয়ে আছে। শার্টের নিখোঁজ অংশটা ঝুলছে তার মুখে। এতক্ষণ তাহলে ঐ জানোয়ারটাই দাঁত দিয়ে টানছিল তার শার্টটা! কিন্তু এ আবার কেমন আজব জানোয়ার রে বাবা! চার-চারটে পা থাকতে অমন লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? দেখতে ঠিক যেন একটা ছাগল। হালকা খয়েরী রঙের পশম সারা

গায়ে। ছাগলের মতোই আকার-আকৃতি। কিন্তু লেজটা অস্বাভাবিক মোটা এবং লম্বা। ঠিক সাপের মতো গোল আর শেষের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে।

গফুরকে কটমট করে তাকাতে দেখে মাথা নেড়ে কি যেন বোঝাতে চাইলো জানোয়ারটা। কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা-টমা চাইলো সম্ভবত। কিন্তু গফুর তার সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক বন্ধুত্ব স্থাপন করতে রাজি নয় বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে পা চারটে মাটিতে ফেললো সে। লেজটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে গেল নিরাশ হয়ে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সব কথা মনে পড়ে গেল গফুরের। শুকিয়ে গেল তার মুখ সকলের কথা ভেবে। দিদিমণি কেমন আছে? আছেই বা কোন্ জায়গায়?

অন্ধকার মাতাল সমুদ্রে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ওরা। কারও খোঁজই সে জানে না। কে মরলো আর কে বাঁচলো তা শুধু খোদাই জানে। নাকি সে একাই বেঁচে আছে? কেন বাঁচলো সে! সেও তো ডুবে যেতে পারতো অন্ধকার সমুদ্রে। এখন সে কার জন্যে জীবন যাপন করবে? দাদামণি আর দিদিমণি ছাড়া ইহজগতে আর কেউই তো তার নেই। দাদামণি! দাদামণির কথা মনে হতেই আশার একটা আলো দেখতে পেলো গফুর। সহজে হার মানার মানুষ নয় তার দাদামণি। জীবনে হাজার হাজার বিপদে পড়েছে দাদামণি। কখনও হার হয়নি তার। ঠিক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে বুদ্ধি খাটিয়ে। বুদ্ধি এবং সাহস আছে তার দাদামণির যে কোনো মানুষের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি।

'দাদামণি তুমি ঠিক বেঁচে আছো—আমি জানি।' শব্দ করেই কথাটা শোনালো গফুর নিজেকে। তারপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালো সে। ভাবলো, দাদামণি বেঁচে থাকলে দিদিমণিও বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। তাহলে কামালদাই বা মরবে কেন? দাদামণি ঠিক বাঁচিয়েছে সকলকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো গফুর। শার্টের অর্ধেকটা অদৃশ্য হওয়াতে উঁচু ভুঁড়িটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে শার্টটার জন্যে দুঃখ হলো গফুরের। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে একটা। তারপর পায়ে চলা একটা রাস্তা ধরে দিক নির্ণয় না করেই হাঁটতে লাগলো।

অভুক্ত ক্লান্ত শরীর। আধঘন্টাটাক বহু কষ্টে হাঁটলো গফুর। গত রাতের ঝড়ে যথেষ্ট নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে তাকে। পেট ভরে আছে নোনা পানিতে। নোনতা নোনতা ঠেকছে এখনও মুখের ভিতরটা। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পেট ভর্তি নোনা পানি থাকলে হবে কি, প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে তার। খাবার পাওয়ার আশা যে বিন্দুমাত্র নেই তা সে বেশ বুঝতে পারছে। সেই দুঃখে মনটা মরে গেছে যেন তার। তার উপর হাঁটার এই পরিশ্রম। না হাঁটলেও চলবে না, হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। শেষ কোথায় এই গহিন জঙ্গলের? কতদূর আছে আর লোকালয়?

যুক্তিতর্ক খাড়া করে নিজেকে শাসন করলো গফুর। মনমরা হয়ে পড়া উচিত নয়। বিপদে পড়েছে তারা। সকলকেই চেষ্টা করতে হবে বিপদ থেকে মুক্তি

পাবার। অন্যান্যরা যে যেখানেই থাকুক নিশ্চয় চেষ্টা করছে সবাই একটা উপায় খুঁজে বের করার জন্যে।

আবার হাঁটতে লাগলো গফুর মন শক্ত করে। পা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে কখন থেকে। কাঁটা গাছের বাধায় নির্বিঘ্নে একপা-ও এগোনো যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা অচেনা গাছের মাথার উপর নজর পড়তে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। লাল টুকটুকে জংলী ফল ঝুলছে গাছটার ডালে ডালে। দেখতে ঠিক আঙুরের মতো। কিন্তু টকটকে লাল এগুলোর রঙ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবনা করার সময় নয় এটা গফুরের পক্ষে। মনস্থির করতে দু'সেকেণ্ডের বেশি সময় নিলো না সে। ঝোপ টপকে টপকে এগিয়ে গেল সে গাছটার দিকে। তারপর চড়তে শুরু করলো মোটা গাছটাকে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে।

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত শরীর। তায় ঘামে নেয়ে উঠেছে সে। খুবই কষ্ট হচ্ছিলো গফুরের উঁচু গাছটায় চড়তে। এতবড় দশাসই শরীরকে গাছের উপর টেনে তোলা যারতার কর্ম নয়। পাঁচ-সাতজন কুলি হলেই বরং কাজটা ভালভাবে সারা যেতো। যাই হোক, রসে টুসটুসে এবং রঙে টকটকে ফলগুলোর আকর্ষণও কম নয় কিছু। খিদে মিটবে ফলগুলো পেড়ে আনতে পারলে। গলা ভিজবে। লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছুবার জন্যে হাঁটার শক্তি পাবে সে। তাছাড়া নতুন ধরনের একটা ফল টেস্ট করার অভিজ্ঞতাও কম লোভনীয় নয় নিশ্চয়। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠতে লাগলো গফুর উপর দিকে।

আর সামান্য উঠতে হবে। সামনেই ঝুলছে থোক থোক ফলগুলো। হাত বাড়ালো গফুর। জিভে জল এসে গেছে তার। শূন্য পেটটা ফোলা বেলুনের মতো আরো খালি খালি ঠেকছে। গলা ভিজে ভিজে মতো হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

টপাটপ মুখে ফেললো গফুর তিন-চারটে জংলী ফল একসঙ্গে। কিন্তু দাঁত দিয়ে কামড় দিতেই বেঁকে গেল হাঁড়িপানা মুখটা। বিকৃত আকার ধারণ করলো গফুরের মুখমণ্ডল। থুক থুক করে ফেলে দিলো সে পরক্ষণেই কামড়ানো ফলগুলো মুখের ভিতর থেকে। ফলগুলো থুথুর সাহায্যে ধুয়েমুছে ফেলে দেবার পরও বাঁকা চোরা হয়ে রইলো তার মুখ। বিরাম নেই এক দণ্ডের জন্যেও তবু থুথু ফেলার। ফলগুলো আসলে জহরের জ্ঞাতিভাই—তেতো বিষ!

তেতো ফল মুখে দিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে গাছ থেকে নেমে এলো বেচারি গফুর। ভয়ানক বিগড়ে গেছে তার মেজাজ। খেপে উঠেছে সে নিজের ভাগ্যের উপর। কিন্তু খেপে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেও তো চলবে না। চেষ্টা করতে হবে এই জঙ্গল থেকে বের হবার জন্যে। খুঁজে বের করতে হবে লোকালয়। তা না হলে সকলের অজ্ঞাতে এই জনমনিষ্যিহীন জঙ্গলে পচে মরতে হবে তাকে।

কাঁটা গাছের শয়তানি বাধা অগ্রাহ্য করে আবার হাঁটা শুরু করলো গফুর। রেগেমেগে জোরে জোরে হাঁটছিল সে। ফলে কিছুদূর যেতেই হাঁপ ধরে গেল তার।

মন্থর হয়ে এলো চলার গতি। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেল আরো। ফল খেয়ে যে শান্তি সে পেয়েছে তার কথা মনে পড়তে লাগলো বারবার। মনে পড়ার সাথে সাথে থুথু ফেলছে সে মাটিতে সশব্দে। তবু দূর হচ্ছে না মুখের ভিতরের তিতকুটে ভাবটা। ফলে মেজাজও হয়ে উঠছে ভীষণ খাটা। সঙ্গে কেউ নেই বলে রক্ষে, তা না হলে তার উপরই অকারণে খানিকটা ঝাল ঝাড়তো সে।

আর মাত্র বিশ কদম হাঁটার পর ফাঁকা মতো একটা জায়গায় এসে পড়লো গফুর। চারপাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একটা জিনিস দেখে থমকাল সে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলো সে সেদিক থেকে। কিন্তু আশা বড় পাজি জিনিস। এদিক ওদিক খানিকক্ষণ দেখে শুনে আবার জিনিসটার দিকে চোখ রাখলো সে। এবার আর চোখ ফিরিয়ে নেবার কথা মনে রইলো না তার। মুখের ভিতর থেকে তিতকুটে ভাবটা এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে কিনা।

ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে অদ্ভুত একধরনের ছোট ছোট সবুজ গাছ দেখতে পেয়েছে গফুর। গাছগুলোর পাতা বলতে একটাও নেই। বুড়ো আঙুলের মতো একধরনের মোটা এবং লম্বা বেগুন ঝুলছে ডালগুলোতে। গাছগুলোর মধ্যিখানে সরু সরু এবং বেগুনী রঙের কয়েকটা করে শিষের মতো ফুল খাড়া খাড়া ভাবে ফুটে আছে।

পায়ে পায়ে একটা গাছের দিকে এগিয়ে গেল গফুর দ্বিধাগ্রস্ত মনে। এদেশের বেগুন এই রকম! মনে মনে আশ্চর্য হলো গফুর। কিন্তু বেগুন-এর রঙ কালো হবে কেন? এদেশের বেগুন বোধহয় কালই হয়। গাছটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। তারপর মনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ঝুঁকে ছিঁড়ে নিলো একটি কালো বেগুন।

হুবহু বুড়ো আঙুলের মতো দেখতে জিনিসটা। উল্টেপাল্টে বেশ খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলো গফুর। তারপর দু'হাতের আঙুল লাগিয়ে চাপ দিলো সে ফলটার দু'দিক ধরে। ফট্ শব্দ করে দু'ভাগ হয়ে গেল সেটা। অবাক কাণ্ড! জিনিসটার ভিতরে শাঁস বলতে কিছুই নেই। ভিতরটা শুধু ঠাণ্ডা পানিতে টইটম্বুর। দু'ভাগ হবার সাথে সাথে দু'হাতের আঙুলের ফাঁক গলে সবটুকু পানি পড়ে গেল মাটিতে। ভিজে গেছে হাতটা। হঠাৎ কি মনে করে একটা ভিজে আঙুল জিভে ঠেকালো গফুর। বাহা রে! উজ্জ্বল হয়ে উঠলো গফুরের মুখ। তেতো নয়, কোনরকম বিশ্রী ঝাঁজও নেই। বেশ মিষ্টি পানি। একেবারে চিনির শরবতের মতো মিষ্টি। কিছুটা ভিটাকোলার মতো স্বাদও পাওয়া যাচ্ছে। আর খুবই ঠাণ্ডা। রায়শার বাজারের হাবলাদের দোকানের বরফ দেয়া শরবতের মতো।

এক ঢোক পানির জন্যে ছাতি ফেটে যাবার দশা হয়েছে গফুরের। এবার আর ঠকবার কোনো প্রশ্ন নেই। সুতরাং শুভ কর্মে বিলম্ব কেন। ফট ফট করে ছিঁড়ে নিলো সে কালো রঙের সেই জংলী ফল গোটা চার-পাঁচ। বলাই বাহুল্য, তারপর গফুর একটি একটি করে ফাটিয়ে সেগুলোর ভিতরের সবটুকু পানি খেতে লাগলো মহা তৃপ্তির সঙ্গে।

সেই সুস্বাদু পানি খেয়ে পেট ভরে গেল গফুরের। ছেঁড়া শার্টটা ভেদ করে

ঝুঁড়িটা উঁচিয়ে উঠলো আরো বেশি করে। প্রশান্ত মনে আবার হাঁটতে লাগলো ফাঁকা মতো জায়গাটা পেরিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে। এর ঠিক মিনিট দেড়েক পর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো তার—জ্বর আসছে নাকি রে বাবা!

দাঁড়িয়ে পড়লো গফুর। কি যেন অনুমান করার চেষ্টা করলো সে। কি যেন হচ্ছে তার, কি রকম যেন একটা পরিবর্তন আসছে তার শরীরে। ও কিচ্ছু না হয়তো, মনে মনে ভাবলো গফুর। তারপর হাঁটতে লাগলো আবার। কিন্তু তিন-চার কদম এগোতে না এগোতে সে বুঝতে পারলো সত্যিসত্যি তার শরীর ক্রমশ তেতে উঠছে। আর কেমন যেন দুলে দুলে উঠছে পৃথিবীটা চোখের সামনে। মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেসামাল হয়ে পড়লো গফুর। কালো বেগুনের রস খেয়ে মাতাল হয়েছে সে। আদতে ঐ পানিটুকু এক ধরনের জংলী মাদক-রসই।

শরীর টলতে লাগলো গফুরের। পা কাঁপতে লাগলো। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে এলো দেখতে না দেখতে। দৃষ্টি হলো ঝাপসা ঝাপসা। আর শরীরটা ক্রমশই গরম হয়ে উঠতে লাগলো।

'একি রে বাবা, এমন হচ্ছে কেন!' জড়িয়ে জড়িয়ে কথাটা উচ্চারণ করলো গফুর আপনমনে। তারপর মাতালের মতো এঁকেবেঁকে হাঁটতে লাগলো সামনের দিকে।

মিনিট দশেক ধরে হেঁটেও সেই জায়গা থেকে দূরে কোথাও যেতে পারলো না গফুর। হাঁটছে সে, হাঁটার বিরাম নেই এতটুকু, কিন্তু দু'পা সামনে গিয়ে আবার ডান দিকে সরে আসছে দু'পা। তারপর পিছন হটছে আরো দু'পা। অর্থাৎ একই জায়গায় ঘুরছে সে কেবল মাতাল অবস্থায়। মাতালের দৃষ্টি যেমন হয় তেমনই হয়েছে গফুরের। সাদাটে ধোঁয়ার একটা পর্দা পড়েছে তার চোখের সামনে। একটা গাছকে সে দশটা গাছ দেখতে পাচ্ছে। দৃষ্টিভ্রম আর বলে কাকে।

বেশ খানিকক্ষণ এভাবে কাটাবার পর গফুর দেখলো কালো রঙয়ের ইয়া বড় বড় কি যেন এগিয়ে আসছে দশ-বারোটা। প্রথমে সে ভাবলো ব্যাপারটা চোখের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। চোখ দুটো ভালো করে কচলে নিয়ে আবার তাকালো সে। না, চোখের ভুল নয়তো! ওই তো গুটিগুটি এগিয়ে আসছে দূর থেকে হেলতে দুলতে কালো কালো কি যেন। মোষ নাকি? কিন্তু এতগুলো মোষই বা হঠাৎ আসবে কোথা থেকে?

টলতে টলতে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইলো গফুর মাটির উপর। রীতিমত ভয় পেয়েছে সে। মনে মনে চিন্তা করার চেষ্টা করছে সে, এখন তার কি করা উচিত।

আরো কাছে এগিয়ে আসছে কালো কালো জানোয়ারগুলো। ঝুঁকে পড়লো গফুর মাটির দিকে। কাঁপা হাতে অন্ধের মতো ইঁট বা একটা পাথর খোঁজার চেষ্টা করছে সে। একটা বড় গাছের গুঁড়ি ধরে ফেললো সে। গুঁড়িটাকেই সে বড় একটা

পাথরের টুকরো মনে করে টানাটানি শুরু করে দিলো। যখন কোনমতেই পারলো না গাছের গুঁড়িটাকে ওঠাতে তখন হাল ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো আবার সে। দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেলো কালো মোষের মতো জানোয়ারগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে কাছে। লাল টকটকে তাদের হিংস্র চোখগুলো। ছুঁচালো মুখ। ছোরার ফলার মতো চকচকে ধারালো দাঁত দু'পাটি গঁ-গঁ-গঁ করে গর্জন করছে জানোয়ারগুলো গফুরের দিকে তাকিয়ে।

আবার মাটিতে ঝুঁকে পড়লো গফুর। এবার সে একটা পাথরের টুকরো পেয়ে গেল ভাগ্যগুণে। পাথরটা সিধে ছুঁড়ে মারলো সে সামনের জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করে। বাহ! অব্যর্থ লক্ষ্য। একটি মাত্র ছোটো পাথর ছুটে গিয়ে সবকটা জানোয়ারের দাঁতে গিয়ে আঘাত করলো। ভেঙে গেল সবকটা দাঁত একটি একটি করে প্রত্যেকেরই। মুখের কশ বেয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করলো দরদরিয়ে।

ছেঁড়া শার্টে অর্ধেকটা ভুঁড়ি ঢেকে মাতাল গফুর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্যাবলার মতো। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। এমন সময় সেই জানোয়ারগুলো তেড়ে আসতে শুরু করলো আবার। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে গফুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পেটে এসে গুঁতো মারলো জানোয়ারগুলো একসঙ্গে। বুঝতে পরে পিছিয়ে গিয়েছিল বলে এ যাত্রা অল্পের মধ্যে দিয়ে ফাঁড়াটা কেটে গেল। তা না হলে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়তো এক গুঁতোতেই। পেটের চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করে উঠলো। আবার গর্জন করে এগিয়ে আসতে লাগলো জানোয়ারগুলো। এতো বিপত্তিতে তো আর মাদক-রসের প্রতিক্রিয়া নষ্ট না হয়ে পারে না। নেশা কেটে গেল গফুরের। সংবিৎ ফিরে পেলো সে। চোখের ঝাপসা দৃষ্টি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সরে গেল চোখের সামনে থেকে সাদাটে ধোঁয়া। তারপরই পিছন ফিরে ছুট লাগালো সে প্রাণপণ শক্তিতে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল তার নিজের বোকামির কথা ভেবে। সব কথা দাদামণি জানতে পারলে ঠিক তার কান দুটো আচ্ছামত ডলে দেবে। ওহ! জানোয়ার বলতে মোষও নয়, অনেকগুলোও নয়। কালো রঙের জানোয়ার ওটা-একটাই। বুনো ভালুক একটা। নেশাগ্রস্ত দৃষ্টিতে গফুর এতোক্ষণ একটি ভালুককেই অসংখ্য এবং আজব জানোয়ার হিসাবে দেখছিল।

সবকটা দাঁত বের করে পিছন পিছন লাফাতে লাফাতে আসছে ভালুকটা। ছুটছে গফুর। পালাতে হবে। তা না হলে ছিঁড়েখুঁড়ে তার বারোটা বাজিয়ে দেবে জানোয়ারটা।

কিন্তু কতক্ষণ একটানা দৌড়ুনো সম্ভব। পথটা তো সরু বটেই, তাছাড়া দু'দিক থেকে কাঁটা গাছের ডালগুলো বেরিয়ে বাধার সৃষ্টি করছে চলার পথে। কাপড়ে বেধে যাচ্ছে কাঁটা। রক্ত ঝরছে পা কেটে গিয়ে। হাঁপাচ্ছে সে। ঘামছে দরদর করে আর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গালাগালি করছে নিজের বোকামিকে।

'দাদামণি থাকলে মজা টের পেতি, ব্যাটা!' ভালুকটার উদ্দেশ্যেই শাসানি-

বাক্যটা ব্যবহার করলো গফুর। কিন্তু শুনবে কেন বুনোটা। লাফাতে লাফাতে আসছে সে এখনো। গফুর পিছন দিকে তাকাতেই মুখ ভেংচে নিচ্ছে একবার করে বিশ্রী ভঙ্গিতে। গতি কমে এসেছে এবার গফুরের। দৌড়ুতে পারছে না সে এখন আগের মতো। বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে সে। দেখছে আর কতটা দূরে সাক্ষাৎ যমদূত।

বারবার পিছন ফিরে তাকাবার ফলে সরু পায়ে-চলা রাস্তাটা থেকে অন্যদিকে সরে গেল গফুর। ঝোপঝাড় টপকে টপকে খানিকটা যাবার পর সামনে এগোবার উপায় দেখতে পেলো না সে আর। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা উঁচু গাছ। একেবারে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো।

ভাল্লুকটার কেবল মাথা দেখা যাচ্ছে এখন। ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তার বিশাল লোমশ শরীরটা। চাপা একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। নাছোড়বান্দার মতো ছুটে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত।

নিরুপায় হয়ে দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলো গফুর। প্রথমে তার ইচ্ছে হলো এখানেই বসে পড়ে হাউ-মাউ করে ককিয়ে কেঁদে ফেলবে। কিন্তু না। তা না করে এক বুদ্ধি করলো গফুর। সামনের গাছটার দিকে তাকালো সে। তারপর আর সময় নষ্ট না করে চড়তে শুরু করলো গাছটার কাণ্ড বেয়ে।

প্রাণের মায়া বড় মায়া। গাছে চড়ার অভ্যেস কোনদিনই ভালো করে রপ্ত করেনি গফুর। প্রকাণ্ড শরীরটাই এ ব্যাপারে তাকে বিফল করে এসেছে সবসময়। কিন্তু আজ বিপদে পড়ে, মাত্র একবারের চেষ্টাতেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গেছুড়ে হিসাবে প্রমাণিত হলো সে। তরতর করে উঠে পড়লো গফুর গাছের উপরে। ঠিক তখুনি বুনো ভাল্লুকটা গাছের নিচে এসে হাজির হলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মুখ ভেংচালো ভাল্লুকটা গফুরকে। কিন্তু এবার কম গেল না গফুরও। গাছের উপর চড়ে বসে আছে সে, এখন আর ভয় কি? কাছেপিঠে থেকে কেউ যখন গফুরকে লক্ষ্য করছে না, তখন শুধু শুধু সঙ্কোচ করার মানে হয় না। দাঁত-জিভ বের করে, মুখ বাঁকিয়ে, ঠোঁট উল্টে খুব করে মুখ ভেংচে দিলো সে-ও। গফুরের কিম্ভূতকিমাকার মুখ বিকৃতি দেখে ভাল্লুকটাও রীতিমত লজ্জা পেলো। রেগে গেল সে তারপর।

রাগে গরগর করতে করতে কয়েকবার চক্কর মারলো ভাল্লুকটা গাছটাকে কেন্দ্র করে। তারপর গফুরের পিলে চমকে দিয়ে একটা হুঙ্কার ছেড়ে গাছের উপর চড়ার জন্যে দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। গফুর অবশ্যি তখন গাছের মগডালে উঠে গেছে।

'আরে! শয়তানটা দেখছি গাছে চড়তে চায়!'

বুক থেকে সবটুকু আশা উবে গেল গফুরের। দেখতে না দেখতে বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়লো গেছো ভাল্লুকটা। অসহায় গফুর ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। একটু পর বোকার মতো তাকালো সে এদিক-সেদিক

সাহায্যের আশায়। মাথা ঝিমঝিম করছে তার। ধুকপুক করছে বুকের ভিতর। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে তার দাদামণির কথা।

'আছাড় মেরে জাহান্নামে পাঠাতো তোকে দাদামণি...'

কথাটা শেষ করতে পারলো না গফুর। অভিমানে গলা বুজে এলো তার। ছলছলিয়ে উঠলো চোখ দুটো। মনে মনে সে বললো, 'দাদামণি, আমি যে মরণের মুখে পড়েছি...হারামজাদাটা আমার কথা শুনতে চাইছে না মোটে...'

একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উপর দিকের অন্য একটি ডালের দিকে লাফ দিচ্ছে ভাল্লুকটা। এমনি করেই এগিয়ে আসছে সে গফুরের দিকে। বেশি নিচে নেই সে আর। মাত্র দুটো ডাল উপরে বসে প্রাণভয়ে কাঁদছে গফুর।

আবার একবার ঝুলতে ঝুলতে লাফ দিলো ভাল্লুকটা। আরো একটি ডাল উপরে উঠলো সে। আর একটিবার লাফ দিলেই ধরে ফেলবে ভাল্লুকটা গফুরকে। দেখতে হবে না আর, খামচে ধরবে ভয়াল জানোয়ারটা তাকে। ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে ফেলবে।

কি যেন ভাবলো গফুর। মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করলো, দাদামণি হলে এক্ষেত্রে কি করতো। নিরাশ হলো গফুর। দাদামণি এক্ষেত্রে কি করতো তা সে বুঝতে পারলো এক কণা সময় চিন্তা করেই। রিভলভার দিয়ে খতম করতো, না হয় লড়াই করতে শুরু করে দিতো আস্তিন গুটিয়ে। কিন্তু সে ওসব পারবে কেন? সে তো আর দাদামণি নয়। দাদামণির সেবক সে। তার উচিত...

বুদ্ধি খুলে গেল গফুরের হঠাৎ। চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। কি করা উচিত তার তা সে জেনে ফেলেছে। একটার পর একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। এক গাছের ডাল অন্য গাছের ডালের সঙ্গে লেগে আছে গায়ে গায়ে। গফুর বুঝতে পারলো এক গাছ থেকে অন্য গাছে সরে না গিয়ে আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই তার। পালানোই এখন ধর্ম আত্মরক্ষার জন্যে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে সে এখন। তারপর দেখা যাবে...

এতসব কথা ভাবতে ক'সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগলো। পাশের একটা গাছের শক্ত ডাল ধরে ঝুলে পড়লো সে। দুলতে দুলতে আর একটি ডালে পা রাখলো সে। তারপর ডাল ধরে ধরে বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেল সে টলটলায়মান পা ফেলে ফেলে। কিন্তু খুব একটা ফল হলো না তাতে। বুনো ভাল্লুকটাও কম যায় না তার চেয়ে। এবার আর তাকে ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে হলো না। কাছাকাছি ডাল পাচ্ছে সে অসংখ্য। সেই ডালগুলোর উপর পা ফেলে এদিকের গাছটায় চলে এলো সে। মুখ ভেংচে নিলো আবার একবার গফুরের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু গফুর এবার মুখ ভেংচালো না দেখে খুশি হলো সে। ফলে আর একবার দাঁত-মুখ দেখালো সে গফুরকে। কিন্তু গফুরকে নিস্তেজ ভেবে ভুল করেছিল সে। কথা আছে ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। ঠিক তাই ঘটলো। না, এবার আর মুখ ভেংচালো না গফুর। মুখ ভেংচাবার কথা দাদামণি জানতে

পারলে-সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। কেউ না বললেও, সে যখন সব কথা তার দাদামণিকে বলবে তখনই প্রকাশ হয়ে পড়বে এই মুখ ভেংচাবার কথাটা। মিথ্যে কথা বলতে পারে না সে তার দাদামণিকে-হুবহু সব বলে ফেলে। যা হবার হয়েছে, আর নয়। এবার সে ভাল্লুকটার মুখ ভেংচানির জবাবে প্রথমে বুড়ো আঙুল দেখালো-অর্থাৎ কলা খাও! তারপর পৃথিবীর একমাত্র বুদ্ধিমান জীব সে, সে একজন মানুষ এই কথা ভাল্লুকটাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ব্যঙ্গ করে বললো-তুই তো একটা জানোয়ার বই আর কিছু না! জানোয়ার, জানোয়ার!

কথাটা বলে গফুর বুঝতে পারলো খানিকটা সময় ফালতু খরচ হয়ে গেল। উঠে আসছে আবার জানোয়ারটা। পালাতে হবে আবার অন্য একটা গাছে।

জমে উঠেছে খেলাটা!

সেই থেকে এক গাছ থেকে অন্য গাছে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গফুর। আর হাত-জোড় করে মাঝে মাঝে বলছে সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে, 'রেহাই দে সোনা ভাই আমার, ছেড়ে দে! হার মানছি তোর কাছে বাপ! আমার দাদামণি নেই কাছেপিঠে, তা না হলে তোর…

বাপ-ভাই কিছুই বলতে বাকি রাখছে না বেচারা গফুর জানোয়ারটাকে। কিছুক্ষণ আগে ভাল্লুকটাকে জানোয়ার বলেছিল, তা সে বেমালুম ভুলে বসেছে।

এদিকে গফুরের কথার কোনোই মূল্য দিচ্ছে না ভাল্লুকটা। কান পেতে শুনছে বটে সে গফুরের নাটকীয় ডায়ালগ। কিন্তু সে থামতেই গর্জন করে উঠছে গোঁ গোঁ করে। তারপর অভ্যাসবশতঃ মুখ ভেংচায়, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। আবার এগিয়ে আসতে থাকে গফুরের দিকে, গফুরকে পাকড়াবার জন্যে। ইচ্ছাটা তার অতি পরিষ্কার।

ভবিতব্যই বলতে পারে এই ভয়ঙ্কর খেলা কতক্ষণ চলবে।

পাঁচ

ঐ একই দিনের ঘটনা।

নিরাশ হলো শহীদ। পাথরটার পাশ দিয়েই চলে যাবে তার লাইফবয়টা। ঠেকবে না গায়ে। উপায় নেই, সাঁতার কাটতে হবে কিছুটা। তা না হলে আবার মাঝ সমুদ্রে ভেসে যাবে লাইফবয়।

সকাল হয়েছে সবে মাত্র। আকাশে ছাই রঙের মেঘের মিছিল। চারপাশে হালকা কুয়াশা। সমুদ্র এখন সুবোধ বালক। কোনোই চঞ্চলতা নেই। ডান দিকে বড় বড় পাথরের খণ্ড পানির উপর মাথা তুলে রয়েছে। তারপরেই খাড়া একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সোজা উঠে গেছে পাহাড়টা সমুদ্র থেকে সোয়াশো-দেড়শো ফিট। কালো পাথরের গা, পিচ্ছিল। সকালবেলার রোদ লেগে চকচক করছে ভিজে পাহাড়টা। কি আছে পাহাড়টার ওপাশে?

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শহীদ পাহাড়টার দিকে। না, পাহাড়টার ওপাশে কি আছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

অজ্ঞাত এক দ্বীপের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে শহীদের লাইফবয়টা। মনস্থির করে ফেলেছে শহীদ করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে। লাইফবয়টা টেনে নিয়ে চললো সে। সাঁতরে গিয়ে উঠলো সামনের একটা বড় পাথরের উপর। বুক ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার। মহুয়ার কথা মন থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরাতে পারছে না সে। কোথায় গেল মহুয়া? কোন্‌দিকে ভেসে গেল সে? বেঁচে আছে তো? নাকি, সমুদ্রের অতলতলে হারিয়ে গেছে চিরতরে, তাকে ফাঁকি দিয়ে?

কুয়াশা যাচ্ছিলো বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক Kotze-কে সাহায্য করতে। কুয়াশারই অনুরোধে তার সঙ্গী হয়েছিল শহীদরা। কিন্তু এ কি চরম সর্বনাশ ঘটে গেল পথিমধ্যে! বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের প্রবল-পরাক্রান্ত শত্রু বঙ্গোপসাগর থেকেই "সৈনিকের" পিছু নিয়েছিল। কুয়ালালামপুর এবং বোর্নিও পার হয়ে আসার একদিন পর টর্পেডো মেরে ফুটো করে দিলো সৈনিকের তলা। তার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ভয়ঙ্কর তুফান। আত্মরক্ষার তাগিদে পানিতে নেমে পড়েছিল ওরা লাইফবয় নিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমুদ্রের মত্ত স্রোতে পড়ে ভেসে গেল একের পর এক সকলে বিশাল সমুদ্রের কোথায় কে জানে। তাদের জলযান সৈনিককেও ডুবে যেতে দেখেছিল শহীদ বিদ্যুৎচমকের আলোয়। সৈনিকে কুয়াশা এবং মি. সিম্পসন ছিলো তখনও। তাদের অবস্থাই বা কি হলো? বেঁচে আছে না ডুবে গেছে সৈনিকের সঙ্গে?

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো শহীদের সব কথা মনে পড়ে যেতে। পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে বসে রইলো সে পাথরটার উপরে অনড়।

এক মিনিট কাটলো। দু'মিনিট, তিন মিনিট কাটলো। তারপর নড়েচড়ে উঠলো শহীদ। ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং সামনের ওই পাহাড়টায় আশ্রয় নেয়া ভালো। বলা যায় না, পাহাড়টার ওপাশে হয়তো একটা বড়সড় দ্বীপ আছে। হয়তো সেই দ্বীপে আছে মানুষের বাস। মনুষজন থাকলে খাদ্য আছে। জলযানও হয়তো থাকতে পারে। চেষ্টা করলে তবু সে একদিন না একদিন দেশে ফিরে যেতে পারবে। তাছাড়া আর সকলের খোঁজ নেবার উপায়ও তখন একটা বের করা যাবে। কে কে বাঁচলো আর কে মারা গেল সেটা ভালো করে খুঁজে না দেখলেই নয়। বলা যায় না, তার মতো কেউ কেউ বেঁচে যেতেও তো পারে। তার লাইফবয় যেমন ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপের কাছাকাছি এসেছে; তেমনি ওদেরও কারো কারো লাইফবয় জোয়ারের টানে ভাসতে ভাসতে কোনো এক দ্বীপে গিয়ে ঠেকতে পারে। খুবই সম্ভব সেটা। সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি করলে চলবে না। খুঁজে বের করতেই হবে ওদেরকে।

জোয়ারের সময় এখন। সাঁতরে যেতে হবে পাথরগুলোর পাশ কাটিয়ে পাহাড়টার কাছে। খুব একটা অসুবিধে হবে না জোয়ারের সময় সাঁতরাতে।

অনেকগুলো পাথরের মাথা দেখা যাচ্ছে ছাড়া ছাড়া ভাবে পানির উপরে। সব শেষের পাথরটা পার হব্যার পর পাহাড়ের গায়ে গিয়ে পৌছুনো যাবে। তারপর চেষ্টা করতে হবে পাহাড়টার খাড়া শরীর বেয়ে উপরে ওঠার। কঠিন কাজ নিঃসন্দেহে। তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দেরি করার মানে হয় না। হোলস্টারটা কোমরের সঙ্গে আঁট করে বাঁধা আছে কিনা দেখলো শহীদ। তারপর পাথরটার উপর উঠে দাঁড়ালো সে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো সমুদ্রের পানি। তল দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। না, কোনো জলচর জানোয়ার কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না। নেমে পড়লো শহীদ পানিতে।

ডুব সাঁতার দিলো শহীদ। একদমে বিশহাত দূরে গিয়ে মাথা তুললো সে। সামনের পাথরটা আকারে বেশ বড়। এক ডুবেই অর্ধেকটা দূরত্ব পার হয়ে এসেছে সে। আবার মাথা নোয়ালো পানির নিচে। তারপর আবার যখন মাথা তুললো তখন পাথরটা মাত্র হাত তিনেক দূরে।

পাথরটা পেরিয়ে গেল শহীদ। থামলো না। যতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে না পড়ে ততক্ষণ বিশ্রাম নেবে না ঠিক করলো শহীদ। ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটা পাথর ধরে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলেই চলবে।

গোটা পাঁচেক পাথর অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়লো শহীদ। কিন্তু তখন সে পঞ্চম পাথরটাকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকদূর চলে এসেছে। সামনেও দেখা যাচ্ছে একটা পাথর। চল্লিশ হাত দূরে সেটা এখনও। শহীদ ভাবলো, রিস্কটা না নেয়াই উচিত ছিলো। হাঁপিয়ে গেছে সে রীতিমত। এমনিতেই দুর্বল শরীর। তায় ক্ষুধার্ত। সারারাত সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে লাইফবয়ের উপর টিকে থাকার জন্যে। মাতাল সমুদ্র মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নিতে দেয়নি। এই শরীর নিয়ে এতদূর সাঁতরে আসা কম কথা নয়।

আরো হাত পাঁচেক এগিয়েছে শহীদ। চিৎ সাঁতার দিচ্ছে সে। আকাশের দিকে মুখ করে শরীরটাকে যথাসম্ভব হালকা করে দিয়ে এগোচ্ছে সে। নার্ভাস হয়ে পড়লে চলবে না। পৌছুতেই হবে সামনের পাথরটার কাছে। কিন্তু এ কি! কি ব্যাপার! কে জড়িয়ে ধরতে চাইছে তার পা দু'টো? অক্টোপাস নাকি? সামুদ্রিক লতা নয়তো? নাকি তার মনের ভুল?

শিরশির করে উঠলো শহীদের আপাদমস্তক। কে যেন একটা মহাবিপদের সঙ্কেত ধ্বনি বাজিয়ে গেল তার কানে কানে। সচেতন হলো শহীদ। পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে উপুড় হলো সে। পিছন ফিরে তাকাবার আগেই আবার একবার স্পর্শ পেলো সে কিসের যেন। পেঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করছে তার পা দুটো।

পিছনে তাকিয়ে সময় নষ্ট করলো না শহীদ। বিপদের গন্ধ নাকে ঢুকেছে তার। ক্লান্তির কথা ভুলে যেতে হলো তাকে। প্রাণ বাঁচাতে হবে। প্রাণপণ শক্তিতে সাঁতরে চললো সে। কিন্তু এই মুহূর্তে পলায়ন শহীদের ভাগ্যে ছিলো না। ধরা পড়ে গেল সে শক্ত বাঁধুনিতে।

জানোয়ারটাকে না দেখেও অনুমানে বুঝতে বাকি রইলো না শহীদের কিছু। আটপেয়ে মাঝারি গোছের একটা অক্টোপাস। সাপের মতো গোল এবং মোটা আর লম্বা আটটি পায়ের একটি শহীদের হাঁটু জোড়া পেঁচিয়ে ধরেছে শক্ত করে। গতিরুদ্ধ হলো শহীদের। অক্টোপাসটা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শহীদকে। পানির নিচে ডুবে গেল শহীদের মাথা। পাঁচ পা মাটিতে নামালো অক্টোপাসটা। এক পায়ে ধরে আছে শহীদের হাঁটু জোড়া। বাকি দুটো এগিয়ে আসছে আক্রমণের জন্যে। একটা শহীদের গলায় চেপে বসে শ্বাসরোধ করার মতলব আঁটছে। অন্যটা কোমর পেঁচিয়ে ধরবে।

ধস্তাধস্তি করে কোনো লাভই হবে না বুঝতে পারলো শহীদ। পানির জগতে বাস অক্টোপাসের। সে ডাঙার মানুষ। 'আপনা গলিমে কুত্তা ভি রাজা।' অনেক বেশি জোর পানিতে ওর। বুদ্ধি এবং কৌশলে ছাড়া পেতে হবে। অস্ত্রও দরকার। এদিকে গলা পেঁচিয়ে ধরার আগেই যা করবার করতে হবে তাকে।

হাত দুটো মুক্ত আছে এখনো। হোলস্টারে রাখা রিভলভারের কথা ভোলেনি শহীদ। ডান হাতটা হোলস্টারের দিকে বাড়ালো সে। রিভলভার ছোঁয়ার আগেই মাটির স্পর্শ পেলো সে। ধস্তাধস্তি করে বাঁচা যাবে না তা ঠিক, কিন্তু হাত-পা ছুঁড়তে কসুর করছে না শহীদ। অবশ্য তার ফলে অক্টোপাসটা তাকে ছাড়ছে না, ছাড়বে না শত হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করলেও। কিন্তু পুরোপুরি কাবু করার সুযোগও পাচ্ছে না সে শহীদকে। হোলস্টারে হাত দিতেই ছোরাটার কথা মনে পড়ে গেল শহীদের। বেল্টের সঙ্গে একটা খাপ তৈরি করা আছে। ছোরাটা রাখা আছে সেই খাপে। রিভলভার বের না করে ছোরাটাই টেনে নিলো শহীদ। কিন্তু ইতিমধ্যেই অক্টোপাসটা কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে তার। অবশ্যি গলাটা পেঁচিয়ে ধরার কায়দা ঠিক মতো করে উঠতে পারেনি এখনও। এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে শহীদ। এদিকে দম রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তার পক্ষে। মনে হচ্ছে গলার কাছে একটা টাইমবোমা আটকে গেছে। ফেটে গিয়ে বুক আর গলা উড়িয়ে দেবে এখুনি।

কোমরে চেপে বসেছে বাঁধনটা। অক্টোপাসের সেই পায়েতেই আমূল বসিয়ে দিলো শহীদ ছোরাটা। তারপর ছোরাটা তুলে না নিয়ে জোরে চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল যতদূর সম্ভব। চিরে গেল হাতখানেক জায়গা গভীর গর্তের সৃষ্টি করে। রক্তে লাল হয়ে উঠলো স্বচ্ছ পানি।

এভাবে বিশেষ সুবিধা করা যাবে না বুঝতে পারলো শহীদ। বিশেষ কোনো লাভই হলো না ছোরার আঘাত করে। ছোরাটা এবার তুলে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে রাখলো সে। সুযোগ চাই একটা। অক্টোপাসটার চোখে বসাতে হবে ছোরার ফলা। তবেই কাজ হাসিল হতে পারে। ধস্তাধস্তি শুরু করলো শহীদ আবার। কোমরের পা-টা জখম হওয়ায় তেমন শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরা সম্ভব হচ্ছে না আর অক্টোপাসটার পক্ষে। মাটি থেকে উপরের দিকে ওঠবার চেষ্টা করলো শহীদ। এলোমেলো ভাবে ছোরা বসাচ্ছে সে সুযোগ পেলেই যত্রতত্র।

মরিয়া হয়ে উঠেছে জন্তুটা। তবে মাটি ছেড়ে উপর দিকে উঠতে বাধ্য হয়েছে সে। শহীদের হাত-পা ছোঁড়ার চোটে স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। সবকটা পা দিয়ে আক্রমণ করছে এবার সে। অতি কষ্টে মাথাটা পানির উপর তুললো শহীদ। বুক ভরে বাতাস নিয়ে আবার পানির নিচে ডুব দিলো সে। পানির নিচে এসেই শরীরটা ঢিলে করে দিলো শহীদ। অক্টোপাসটা ভাবলো শত্রু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটাই চাইছিল শহীদ। ছোরাটা উঁচিয়ে তৈরি হয়ে রইলো সে।

সাহস বেড়ে গেছে অক্টোপাসটার। ছোরাবিদ্ধ শরীরের ব্যথা ভুলে আটটা পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ধীরেসুস্থে শহীদকে নিজের শরীরের ভিতর টেনে নিতে শুরু করলো সে।

আটটা পা দিয়েই ঘিরে ফেলেছে অক্টোপাসটা শহীদকে। অপেক্ষার ইতি হয়েছে এতক্ষণে। মুখের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে খাবলা মারার তোড়জোড় এখন শুধু।

ঢিল করে দিয়েছে শহীদ নিজেকে। মুখ থেকে হাতখানেক দূরে থাকতে সে বুঝলো সময় হয়ে গেছে। তৈরি হয়েই ছিলো সে আগে থেকে। বাগিয়ে ধরা ছিলো ছোরাটা। হঠাৎ উঁচিয়ে ধরা ছোরাটা তীব্রবেগে বসিয়ে দিলো অক্টোপাসটার ডানদিকের চোখে। অব্যর্থ লক্ষ্য।

ফিনকি দিয়ে খানিকটা আঠালো রস এসে লাগলো শহীদের মুখে। ঝাপসা হয়ে গেল সামনের দিকটা। ছোরাটা তুলে নিয়ে আবার আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলো সে। কিন্তু অক্টোপাসটার অপর চোখটি দেখতে পাচ্ছে না শহীদ। আন্দাজ করে মারবে নাকি? ভাবলো শহীদ। কিন্তু এমন সময় সে টের পেলো অক্টোপাসটা একটা চোখ হারিয়ে ছটফট করছে অসহ্য-যন্ত্রণায়। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে সে শহীদকে।

দু'সেকেণ্ডের মধ্যে উল্টোদিকে ফিরলো শহীদ। এই সুযোগ। পালাতে হবে যমের হাত থেকে। যন্ত্রণাটা সয়ে এলেই চতুর্গুণ শক্তিতে আক্রমণ করবে আবার শয়তানটা। তার আগেই সরে যেতে হবে নিরাপদ দূরত্বে। মানে সামনের পাথরটার উপরে গিয়ে উঠতে হবে শহীদকে। তবেই এ যাত্রা রক্ষা পাবার আশা করা যায়।

সাঁতরাতে লাগলো শহীদ প্রাণপণে। হাত দশেক দূরে এখনো পাথরটা। ঘাড় বাঁকিয়ে পিছন দিকে তাকালো সে এরইমধ্যে একবার। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো পানিতে স্পষ্ট দেখলো শহীদ আবার পিছু পিছু ছুটে আসছে অক্টোপাসটা আট পায়ে সাঁতার কেটে। ধক্ করে উঠলো শহীদের বুকটা। যুদ্ধ করার মতো শক্তি আর এক বিন্দুও অবশিষ্ট নেই তার শরীরে। অক্টোপাসটা এবার যদি তাকে ধরে ফেলে তবে নির্ঘাৎ অকালমৃত্যুকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু মরলে চলবে কেন। যেমন করেই হোক, ধরা পড়ে যাবার আগেই গিয়ে উঠতে হবে তাকে পাথরটার উপরে।

পিছন দিকে তাকালো না শহীদ আর। ডুব দিয়ে সাঁতরে চললো সে দম বন্ধ

করে। আর পাঁচ হাত। কিন্তু অক্টোপাসটা এসে পড়েছে কাছাকাছি। আর মাত্র তিনহাত। অক্টোপাসটা ছুঁয়ে ফেললো প্রায় শহীদের ডান পা-টা। দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে শহীদ ছোরাটা। কিন্তু ছোরাটা হাতে না নিয়ে হঠাৎ সে ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল ডান দিকে খানিকটা। অক্টোপাসটাও গতি পরিবর্তন করলো নাছোড়বান্দার মতো। আবার পাথরটার দিকে এগোলো শহীদ। ধরে ফেলেছে শহীদ পাথরটা।

শক্ত করে চেপে ধরলো শহীদ পাথরটার গা। ছোরাটা ফেলে দিলো মুখ থেকে পাথরের উপরে। ডান পা-টা তুলে ফেললো সে হাঁটুমুড়ে পাথরটার উপর। কিন্তু বাঁ পা-টা ওঠাবার আগেই স্পর্শ পেলো সে অক্টোপাসটার। কিন্তু এবার আর ধক্ করে উঠলো না শহীদের বুক। পানির জানোয়ার ডাঙার মানুষকে পানিতে পেয়ে বাহাদুরি ফলাতে পারে বৈকি। সেখানে তার শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মানুষ যদি একবার ডাঙায় উঠে আসতে পারে, তবে জলচর দানবকে হার মানতেই হবে।

হেঁচকা টান মারলো শহীদ। একটানেই মুক্ত হলো পা-টা। ফিরে তাকাবার ইচ্ছে হলো না শহীদের। পাথরটার মাঝ বরাবর চলে এলো সে হামাগুড়ি দিয়ে। তারপর অসম্ভব ক্লান্তিতে ধপাস করে শুয়ে পড়লো পাথরের উপর। মরার মতো পড়ে রইলো সে হাত পা ছড়িয়ে। ক্লান্তিতে মরে যাচ্ছে যেন সে। হাঁপাচ্ছে সশব্দে।

আশা কি এতো সহজে ছাড়া যায়? শিকার নিরাপদ আশ্রয়ে উঠে পড়ার পরও পাথরটার চারপাশে ঘুরঘুর করছিলো অক্টোপাসটা। পানিতে নামতেই হবে একসময় না একসময় বাছাধনকে। দেখে নেবে সে তখন।

মিনিট সাতেক পর পানিতে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ পেলো শহীদ। ইতিমধ্যে খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। প্রায় দূর হয়ে গেছে ক্লান্তি। মাথা তুলে তাকালো সে পানির দিকে। প্রবল একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে হাত তিনেক দূরের পানিতে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না শহীদ দূর থেকে। কৌতূহল জাগলো ব্যাপারটা কি জানার জন্যে। উঠে বসলো ধীরে ধীরে। তারপর পাথরটার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো।

পানির নিচে তাকিয়ে হেসে ফেললো শহীদ আপনমনে। উচিত সাজা হচ্ছে শয়তান অক্টোপাসটার। আক্রমণ করে বসেছে ওকে বিরাট একটা হাঙর। রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে সে।

প্রাণপণ চেষ্টা করছে অক্টোপাসটা পালাবার জন্যে। কিন্তু অতো বড় হাঙরের হাত থেকে যাবে কোথায় সে। মিনিটখানেকও লাগলো না হাঙরটার অক্টোপাসটাকে ফেড়ে টুকরো টুকরো করতে। খেতে শুরু করলো সে টুকরোগুলো মজা করে। চোখ ফিরিয়ে নিলো শহীদ।

ভর-পেট ব্রেকফাস্ট করে বিশ্রাম নিচ্ছে হাঙরটা। নিঃসাড় পড়ে আছে সে পানির

নিচে মাটির উপর শরীরটা বিছিয়ে দিয়ে। আজকের ভোজন-পর্ব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তার।

নেমে পড়া যায় পানিতে? ভাবলো শহীদ। হাঙ্গরটা তো এখন নড়তে চড়তে পারবে বলে মনে হয় না। নাকি ভর-পেটেও লোভ সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়বে ওর পক্ষে? কিন্তু তার নিজের যে পেটে পড়েনি কিছু এখনও। ইঁদুর ছুটোছুটি করছে পেটের ভিতর কখন থেকে। ব্যবস্থা কিছু একটা করার উপায়ও নেই এখন। হারামজাদা হাঙ্গরটা যদি খেয়েদেয়ে সরে যেতো এতক্ষণ, তাহলে ও পাহাড়টা টপকাবার চেষ্টা শুরু করে দিতে পারতো। পাহাড়ের ওপাশে সম্ভবত আবার সমুদ্র শুরু হয়নি। দ্বীপ যদি হয় এটা তবে গাছপালা দু'টো একটা নিশ্চয়ই আছে। কিংবা ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তবে দ্বীপটায় মানুষের বসবাসও আছে। সেটাই সম্ভব সবচেয়ে বেশি। সেক্ষেত্রে একটা আশ্রয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিছু না হোক, খিদেটা মিটবে। কিন্তু…

এইতো ভালমানুষের পো নড়ছে! বেশ বেশ, এখন নিজের আড্ডায় ফিরে যাও তো ধন। খুব তো ভুরিভোজন হয়েছে, আর কেন শুধু শুধু পড়ে থাকা।

হাঙ্গরটা নড়েচড়ে উঠলো। শহীদ আশায় আশায় তাকিয়ে রইলো। ভাবলো এবার চলে যাবে এখান থেকে। কিন্তু না। নড়েচড়ে ভালো করে মাথাটা নরম মাটিতে পেতে দিলো হাঙ্গরটা। এখনও বিশ্রাম পুরোপুরি হয়নি তার।

বিরক্তি চেপে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো শহীদ। কিন্তু কতোক্ষণ আর বসে থাকা যায়। ভেবেচিন্তে হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করলো সে। হাঙ্গরটাকে মেরে ফেলা ইচ্ছে নয় শহীদের। একটা গুলি করে ভয় পাইয়ে দিতে চায় সে জানোয়ারটাকে। ভয় পেয়ে যদি পালিয়ে যায় তবেই বাঁচোয়া। পানির বাধা অতিক্রম করে গুলিটা চরম আঘাত হানতে পারবে না। হাঙ্গরটা সামান্য জখম হবে বড়জোর। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ পানির নিচে হাঙ্গরটাকে। লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপে দিলো শহীদ।

আশঙ্কাটা শহীদ আগেই করেছিল। আংশিকভাবে সত্য প্রমাণিত হলো তার সন্দেহ। হাঙ্গরের পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করেছিল সে। লাগলো গিয়ে লেজে। তবে কাজ হলো। ঘুম ভেঙে গেল হাঙ্গরটার। যেন বিদ্যুৎগতিতেই সে দূরে সরে গেল খানিকটা রক্তের একটা রেখা রেখে। পিছন ফিরে তাকালো একবার। কি দেখলো কে জানে, তবে চলে গেল সে নতুন আর কোনো খেল্ না দেখিয়ে।

হোলস্টারে রিভলভারটা রাখলো শহীদ। ছুরিটা দু'পাটি দাঁতের সাহায্যে মুখে ধরে রাখলো। তারপর পাথরটার উপর উঠে দাঁড়ালো সিধে হয়ে।

ভালো মতো দেখে নিলো শহীদ পানির নিচেটা। ছোটো ছোটো সামুদ্রিক মাছ এসেছে এখন এদিকটায়। হাঙ্গরটা নেই তাহলে কাছে পিঠে। থাকলে মাছগুলোকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতো না। অন্য কোনো বড় জানোয়ারও নেই আশা করা যায়। এক-আধটা বড় মাছ থাকতে পারে বড়জোর। যদিও তাও নজরে

পড়লো না শহীদের। তাছাড়া হিংস্র জানোয়ার না থাকলেই হলো। শহীদ পানিতে নামলে মাছগুলো ভয় পেয়ে পালিয়েই যাবে প্রাণ নিয়ে শ'শ'হাত দূরে।

ধীরে ধীরে নামলো শহীদ পানিতে। তিনটে বড় আকারের পাথর সাঁতরে পেরিয়ে যাবার পর পাহাড়টার গায়ে পৌঁছুতে পারা যাবে। অজানা বিপদের আশঙ্কা করে বুকটা একবার কেঁপে উঠলো শহীদের। কিন্তু উপায় নেই। পাহাড়টার উপর চড়তে না পারলে চলবে না।

হাঙ্গরটাকে গুলি না করে উপায় ছিলো না। কিন্তু গুলি করাও উচিত হয়নি। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা উচিত ছিলো। ব্যাপারটা শহীদ বুঝলো ঠিকই, কিন্তু অনেক পরে। নির্বিঘ্নে দুটো পাথর সাঁতরে পার হয়ে সাত-আট হাত এগিয়ে যাবার পর বিপদটা টের পেলো সে। জখমি শরীর নিয়ে ফিরে আসছে হাঙ্গরটা। তা না হলে মাছের দলগুলো অমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পালাচ্ছে কেন? এতোক্ষণে মাছগুলো শহীদকে দেখে পালাচ্ছিল দু'পাশে। কিন্তু এখন পিছন থেকে দলে দলে দু'পাশ দিয়ে শহীদকে ছাড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে তারা। হাঙ্গরটাই হবে, ভাবলো শহীদ। ছুরিটা মুখে ধরা আছে বটে। কিন্তু এবার আর কাজ হবে না ওটা দিয়ে। হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে হাতে নিলো শহীদ। থামলো না সে। পিছন ফিরে তাকিয়ে সময় নষ্টও করলো না। মনে মনে আত্মরক্ষামূলক পন্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। হাঙ্গরটা এসে পড়ার আগেই যেন সামনের পাথরটায় উঠে পড়তে পারে সেটাই সে চায়। যুদ্ধ নয় আর। দুর্বল সে পানির মধ্যে। দুর্বলের পক্ষে যুদ্ধ করতে চাওয়া বোকামি।

আট-নয় হাত দূরে আর পাথরটা। দ্রুত সাঁতার কেটে এগোচ্ছে শহীদ। সে ভেবেছিল পিছনে তাকিয়ে সময় নষ্ট করবে না। কিন্তু তাকাতেই হলো তাকে। কে যেন ফিসফিস করে সতর্ক করে দিলো তাকে—আর বোকামি করো না, শহীদ খান; প্রস্তুত হও প্রাণ বাঁচাতে।

যুদ্ধই করতে হবে।

পিছন ফিরে তাকাতেই বুঝতে পারলো শহীদ, যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এবং এক্ষেত্রে যে আগে আক্রমণ করবে সুযোগ বুঝে সে-ই জয়ী হবে।

হাঙ্গরটাই! এতক্ষণ দূরে সরে গিয়ে লুকিয়ে ছিলো সে। যথেষ্ট কারণ ছিলো তার মনে সন্দেহ এবং প্রতিহিংসাবোধ জাগার। আহারের পর আয়েশ করে ঘুমোচ্ছিল। আর তো কিছু করেনি সে, কেন তাকে নিষ্ঠুরভাবে জখম করা হলো! দূরে সরে গিয়েও লক্ষ্য রেখেছিল সে এদিকটায়। টের পেয়ে ছুটে আসছে। দেখে নেবে কতো বড় শক্তিশালী শত্রু তার।

বিচলিত হবার মতো তেমন কিছু নয় ব্যাপারটা। গুলিটা লেজে লাগলেও বেশ কাহিল করেছে হাঙ্গরটাকে। এগিয়ে আসছে বটে তবে জেদই বেশি তার, শক্তি তেমন নেই। হাত তিনেক দূর থেকে গুলি করলো শহীদ। মাথায় লক্ষ্যস্থির করেছিল সে। মাথাতেই লাগলো গিয়ে গুলিটা। দ্বিতীয় গুলি করতে দেরি করে

ফেললো শহীদ। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে দেয়া উচিত ছিলো তার। তবে দ্বিতীয় গুলিটাও ফসকালো না। চোখে মেরেছিল। হাঙ্গরটা তখন তড়পাতে শুরু করে দিয়েছে মাথায় গুলি খেয়ে। চোখে লাগলো না তাই গুলিটা। শহীদ বুঝতে পাড়লো গুলিটা হাঙ্গরের গায়ে লেগেছে। কিন্তু ঠিক কোথায় বিঁধেছে দেখতে পেলো না সে। হাঙ্গরটা তখন ভীষণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে তীব্র যন্ত্রণায়।

দ্রুত ফিরলো শহীদ। সরে যেতে হবে দূরে। ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করলো সে পাথরটার দিকে। কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাবে কে?

দু'সেকেণ্ডও কাটলো না। পানিতে প্রকাণ্ড একটা তোলপাড় তুলে লাফ দিলো হাঙ্গরটা।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভুগছে সে। লাফটা দিলো আক্রমণ করার জন্যে নয়। ব্যথা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তার পক্ষে। পানি থেকে হাত দুয়েক উপরে উঠে পড়লো হাঙ্গরটা কাতরাতে কাতরাতে। বুঝতে পেরেছে শহীদ ব্যাপারটা। ডুব দিলো সে সঙ্গে সঙ্গে পানির নিচে। ঠিক তারপরই হাঙ্গরটা পড়লো আবার পানিতে। পড়লো ঠিক শহীদের পিঠের ওপরে।

ব্যথায় কুঁচকে গেল শহীদের মুখটা। ধাক্কা খেয়ে মাটির সঙ্গে গিয়ে ঠেকলো তার অসাড়প্রায় শরীরটা। ছিটকে পড়ে গেল ধাক্কা খাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ছুরি। মানসিক শক্তি বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলো শহীদ। শক্ত হয়ে উঠলো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো। শক্ত হাতের মুঠি থেকে পড়তে দিলো না সে রিভলভার-টাকে। ট্রিগারের উপর চেপে বসেছে একটা আঙুল। পরপর দুটো গুলি বেরিয়ে যেতে একটু ঢিল করলো শহীদ হাতের আঙুলগুলো।

পিঠটা অসাড় মতো হয়ে গেছে। হাঙ্গরটা দ্বিতীয় আর একটা লাফ দিয়ে সরে গেছে দূরে। হাঙ্গরটার কথা ভাবছে না শহীদ। মাটি থেকে উপর দিকে উঠছে সে এখন একটু একটু করে দম ছেড়ে। মনের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে সে। পরাজয় নয়, জয়ী হওয়া চাই। মানুষ সে, এতো সহজে হার মানলে চলবে কেন তার। বেঁচে থাকতে হবে তাকে। বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করতে করতেও হেরে যাওয়া চলবে না তার। জয়ী হতেই হবে তাকে। হবেও সে জয়ী।

মনে মনে এইসব কথা ভেবে ভেবে শক্তি সঞ্চয় করলো শহীদ। ফল হলো বৈকি। ভেসে উঠলো শহীদ ধীরে ধীরে পানির উপরে। শ্বাস নিলো সে বুক ভরে। আশ্চর্য হলো সে। শ্বাস নেবার সময় ব্যথাটা বাড়লো না তো পিঠের! আঘাত তাহলে মারাত্মক কিছু একটা নয়। ব্যাকবোন ভাঙেনি তা শহীদ জানে। যদি ভাঙতো তাহলে আর পানির উপরে ভেসে উঠতে হতো না তাকে জীবন্ত অবস্থায়। সলিল সমাধি লাভ করতো সে নিঃসন্দেহে।

আসলেই চোটটা মারাত্মক নয়। ব্যথাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল তা ঠিক। লেজের ভারটুকু লেগেছিল প্রকৃতপক্ষে তার পিঠের উপর। শুধু ভারটুকু নয়, আসলে চাবুকের মতো তীব্রবেগে লেজটা তার পিঠে পড়েই সরে গিয়েছিল। ফলে

চাবুকের কাজ হয়েছিল পিঠের মাংসে। অবশ্য লেজটা চাবুকের চেয়ে চওড়া ছিলো অনেক বেশি।

আস্তে আস্তে সাঁতরে গিয়ে পাথরটার কাছে থামলো শহীদ। অলক্ষুণে হাঙ্গরটার হদিস পায়নি সে আর। মরে গেছে সেটা এতোক্ষণে। পিঠের উপর আলতো ভাবে এক হাত বুলিয়ে দেখলো শহীদ। উঁচু হয়ে উঠেছে খানিকটা জায়গা। না দেখেই শহীদ বুঝতে পারলো উঁচু মতো জায়গাটায় রক্ত জমে আছে। অবশ মতো হয়ে রয়েছে এখনও।

পাথরটার উপর উঠলো না শহীদ। আশঙ্কা করেছিল সে অনেক বেশি চোট পেয়েছে। কিন্তু তা নয়। ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও চলে ব্যথাটা। সুতরাং এবার সাঁতরাতে লাগলো সে পাহাড়টার সামনে গিঁয়ে পৌঁছুবার জন্যে।

সামনে আর কোনো পাথর নেই। পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে মাথার উপরে। সূর্য উঠে এসেছে অনেকটা। কালো এবং উঁচু পাহাড়টার কালো ছায়া পড়েছে সমুদ্রের স্বচ্ছ পানিতে। বুকে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করলো শহীদ। টপকাতে হবে খাড়া পাহাড়টা, বড় সহজ কাজ নয় সেটা।

ঠিকই ভেবেছিল শহীদ। বড় কঠিন কর্ম পাহাড়টায় চড়া। সিধে উঠে গেছে পাহাড় কম পক্ষে সোয়াশো ফিট।

গর্ত আছে বটে। পাথরের চোখা চোখা এবং মোটা হাতল মতো বেরিয়ে আছে অনেক। কিন্তু অনেকটা জায়গাতেই ওগুলো নেই। সেখানে হয়তো দুটো একটা গর্ত-টর্ত পাওয়া যাচ্ছে।

রিভলভারটা হোলস্টারে না ভরে পকেটে রেখেছে শহীদ। ধরবার মতো পাথর পেলে তাই ধরছে এবং পায়ের ভর সেইরকম একটা দুটো পাথরের উপর দিয়ে অতিকষ্টে একটু একটু করে উপর দিকে উঠছে সে। আর যেখানে ধরবার মতো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে নিরুপায় হয়ে সে গর্ত-টর্ত খুঁজে ঝুলতে ঝুলতে এবং পা দুটো দুমড়ে নিয়ে কোনো একটা গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও গর্তে হাত ঢোকাতে রীতিমত ভয় জাগছে তার। সাপটাপ থাকা খুবই সম্ভব গর্তগুলোতে। কিন্তু এই রিস্কটুকু না নিয়েও উপায় নেই।

পঁচিশ তিরিশ ফিট ওঠার পর প্রথমবারের মতো নিচের দিকে তাকালো শহীদ। এখান থেকে পড়লে কি ফল হতে পারে? প্রশ্নটা মনে জাগতে হাসলো শহীদ। গর্ত ধরে ঝুলছে সে। ঠিক ঝুলছে বলা চলে না। পায়ের নিচে একটা মজবুত পাথর আছে তার। ডান হাতটা সরিয়ে নিলো গর্তটা থেকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছলো সে। তারপর পকেটে রেখে দিলো রুমালটা। হাতটা আবার ঢুকিয়ে দিলো সে গর্তের ভিতর। ঢুকিয়েই···

গর্তের ভিতর হাতটা ঢোকাতেই শিউরে উঠলো শহীদ। আঙুলগুলো নরম মতো কোনো জিনিসের উপর চেপে বসেছে স্পষ্ট অনুভব করলো সে। সাপ! সাপের মাথার উপর হাত পড়েছে তার।

ঝট করে টেনে নিলো শহীদ হাতটা। সাপই! কেউটে একটা। হাতটা টেনে নিতেই সাপটা হাতের সঙ্গে বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে। গর্তে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো শহীদ। কিন্তু সাপটা পড়লো তার মাথায়। সাথে সাথে দ্বিতীয় হাতটাও গর্ত থেকে বের হয়ে এলো শহীদের। শরীর শিরশিরিয়ে ওঠার ফল এটা। পঁচিশ-তিরিশ ফিট উপর থেকে শূন্যে কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে পানিতে পড়লো শহীদ। সাপটা পড়লো ক'সেকেণ্ড পরই।

ভাগ্যটা কি তাকে শুধুই নিরাশ করে দিতে চাইছে? নাকি এসবই কোনো একটা ভয়াবহ বিপদের সঙ্কেত? বাধ্য হয়ে মনে মনে প্রশ্ন করলো শহীদ নিজেকে।

আঘাত লাগেনি তার কোথাও। পানিতে পড়ার ফলে তেমন ব্যথা লাগার কথাও নয়। কিন্তু এতো বড় বাধা-বিঘ্ন কেন? কি আছে ঐ পাহাড়ের ওপাশে? এসবই কি কোনো ভয়ানক বিপদের সঙ্কেত?

আর মাত্র গজ তিনেক! উঠে এসেছে শহীদ পাহাড়টার প্রায় উপরে। অতি সাবধানে উঠছে এখন। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে সে ক্লান্তি দূর করার জন্যে। সাবধান হয়ে একটু একটু করে ধীরে ধীরে উঠছে সে। তাড়াহুড়ো করলেই সর্বনাশ ঘটার আশঙ্কা। আবার যদি সে ফসকে গিয়ে পড়ে যায় তবে আর সাহস হবে না পাহাড়ে চড়ার।

আধঘন্টা সময় নিয়ে বাকি তিনগজ উচ্চতা অতিক্রম করলো শহীদ। প্রচণ্ড ধকল গেছে শরীরটার উপর দিয়ে। খিল ধরে গেছে হাতপায়ের গাঁটে গাঁটে। চারদিকে একবার দেখে নিয়ে শুয়ে পড়লো শহীদ পাথরের উপর। পাহাড়ের এদিকের অংশটা সমতল। খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে তিনদিকে পাথরের প্রকাণ্ড খণ্ড পড়ে আছে। দৃষ্টি চলে না।

দশমিনিট বিশ্রাম নিলো শহীদ। ভিজে কাপড়-চোপড় প্রায় শুকিয়ে এসেছে রোদ লেগে। কিন্তু সে কথা ভাবছে না সে। খিদে, প্রচণ্ড খিদেয় প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে যেন তার।

মহুয়াকে ডাক দিয়ে বলবে নাকি খেতে দিতে? হেসে ফেললো শহীদ নিজের ঠাট্টায় নিজেই। পরক্ষণেই দপ করে নিভে গেল তার ঠোঁট থেকে উজ্জ্বল হাসির রেশটুকু নিঃশেষে। কোথায়, কিভাবে কেমন আছে সে? একা মেয়েমানুষ সে। বেঁচে যদি থাকেও···বেঁচে আছে তো? চমকে উঠে বসলো শহীদ। ঝাপসা হয়ে আসছে তার দৃষ্টি। জ্বলজ্বলে একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের পর্দার মতো। করুণ, অসহায় একটা মুখ। ভয়ার্ত, আতঙ্কিত একটা মুখ। মহুয়ার মুখ দেখতে পেলো শহীদ। ভেসে চলেছে সে সীমাহীন বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে একা। একা! কেউ নেই তার দৃষ্টির আওতায়। কিছু দেখা যাচ্ছে না কোনদিকে। শুধু জল আর জল। জল আর সমুদ্রের একটানা গর্জন। অথৈই জল আর গম্ভীর, গম্ভীর একটানা গর্জন আর দানবীয় ঢেউ একটার পর একটা। ভাসছে

মহুয়া তার লাইফবয়ের উপর। মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে তার।

আবেগে বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠলো শহীদের। দু'হাতে মুখ ঢেকে অশ্রু সংবরণ করলো সে। শক্তি দরকার, ধৈর্য দরকার। নিরাশ হলে চলবে না তার। মাথার উপর কর্তব্যের বোঝা চেপেছে আজ তার। উদ্ধার করতেই হবে মহুয়াকে। বুদ্ধি হারালে চলবে না আজ। মহাপরীক্ষা শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে। উত্তীর্ণ তাকে হতেই হবে এই পরীক্ষায়। সশরীরে বাঁচিয়ে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেশে। যতটুকু ক্ষমতা আছে তার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করবে সে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো শহীদ—আমি দমবো না শত বিপদ, শত বিপত্তিতেও।

এপাশে এসে ভরসা পেলো শহীদ। পাহাড়ের উপর থেকেই জঙ্গলটা দেখতে পেলো সে। উঁচু পাহাড়ের সারি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আরো দূরে। মাঝখানটায় বনভূমি। না, কোনো মানুষজন দেখা যাচ্ছে না চারদিকে। কই, বাঁশের ছাউনি বা মাচা জাতীয় কিছুও নজরে পড়ছে না।

গভীর নয় জঙ্গলটা। বেশি বড়ও নয় আয়তনে। একদিক থেকে অপরদিকে পৌঁছুতে মিনিট সাতেক লাগলো তার। আতা গাছ পেলো সে কয়েকটা। পাকা আতা। গাছে ওঠার কষ্টটুকু সইতে হলো বটে, কিন্তু পরিবর্তে ক্ষুধা মিটলো। খিদে মিটতেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো শহীদ। বনভূমি শেষ হয়ে এসেছে দেখেও দমলো না সে। এগোলো পাহাড়গুলোর সারির দিকে।

সিধে হাঁটছিল শহীদ। দ্রুত পায়েই হাঁটছিল সে। মাঠটা তেপান্তরের মতোই। শেষ হতে চায় না কোনমতে। হঠাৎ দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লো শহীদ। সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল সে। দক্ষিণ দিকে চোখ পড়তেই সমুদ্র দেখতে পেলো। তার মানে পাহাড়ের সারির পর সমুদ্র শুরু হয়েছে আবার। তাহলে? নিরাশার ছায়া পড়লো শহীদের মনে। তাহলে আর এদিকে গিয়ে লাভ কি? ভুল করেছে সে। পশ্চিম দিকে না এসে উত্তর দিকে এগোনো উচিত ছিলো তার।

কিন্তু উত্তর দিকে সে কোনো পথ দেখতে পায়নি। কথাটা মনে পড়লো শহীদের। এবার সে সত্যিসত্যি চিন্তিত হয়ে পড়লো। দ্বীপটা কি এতোই ছোটো? সমুদ্রের উপর বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে আছে এই দ্বীপটা? লোকজন নেই নাকি?

দেখা দরকার সবটা। বলা যায় না, উত্তর দিকে এগোবার একটা পথ পেয়েও যেতে পারে সে। আসলে হয়তো দ্বীপটা ততো ছোটো নয়, যতো ছোটো মনে করছে সে। সে তো ভালো করে উত্তর দিকের পাহাড়টার দিকে খোঁজও করেনি। জঙ্গল দেখে এদিকেই মনোযোগ ছিলো তার।

আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো শহীদ ছেড়ে আসা পাহাড়টার দিকেই।

যাবো, নাকি যাবো না? ঢুকবো, নাকি ঢুকবো না?

দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না শহীদ। উত্তর দিকের পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। খুঁজতে খুঁজতে আচমকা সে পেয়ে গেছে এই সুড়ঙ্গটা। দু'মানুষ সমান উঁচু হবে সুড়ঙ্গের মুখটা। পনেরো হাত সমতল ভূমি দেখা যাচ্ছে। তারপর ধুলোবালি মাটির চিহ্ন নেই। রয়েছে পাথরের অসমান জমি। অবশ্যি পাথরের জমিটা দেখা যাচ্ছে মাত্র সাত-আট হাত। তারপর বাম দিকে মোড় নিয়েছে সুড়ঙ্গটা। যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকুও তেমন আলোকিত নয়। ছায়া ছায়া মতো। সুড়ঙ্গটা যেখানটায় মোড় নিয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে সেখানটায় রীতিমত অন্ধকার। দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে শহীদের। সে ভাবছে—যাবো, নাকি যাবো না? ভিতরে ঢুকবো, নাকি ঢুকবো না?

ওয়াটারপ্রুফ পেন্সিলটর্চটা পকেটে আছে কিনা দেখলো শহীদ। হাতে নিয়ে জিনিসটা নাড়াচাড়া করতে করতে মৃদু হেসে শহীদ নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যালো, তুমি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান?'

উত্তর হলো, 'কোনো সন্দেহ নেই তাতে।'

'তবে তুমি মরে গেছো বলে আমার বিশ্বাস,' নিজেকে বিদ্রূপ করে কথাটা বললো শহীদ। তবে মনের ভিতর থেকে সত্যিকার প্রশ্ন করলো শহীদ খান ভ্রূকুঁচকে, 'মানে! এসব কথার মানে কি? দিব্যি বেঁচে রয়েছি আমি…'

'বেঁচে থাকলে সুড়ঙ্গটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল ভাবতে না তুমি।'

শহীদ খান এবার বললো, 'ঠিক আছে, এই দেখো শহীদ খান বেঁচে আছে কি না। সে আসলে ভয় বলে কোনো জিনিসকে চেনে না। উচিত অনুচিত ভেবে দেখে মাত্র।'

দৃঢ় পদক্ষেপে সুড়ঙ্গটার দিকে এগিয়ে গেল শহীদ। কুড়ি-বাইশ হাত হাঁটার পরই পেন্সিলটর্চটা জ্বালতে হলো তাকে। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌!'

মাথা হেঁট করে রাখলো শহীদ। চামচিকে আর বাদুড়েরা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। কতো যুগ হয়তো কেউ প্রবেশ করেনি তাদের রাজত্বে।

সারাক্ষণ জ্বেলে রেখে পেন্সিলটর্চটা অপব্যয় করতে চায় না শহীদ। মাঝে মাঝে জ্বালছে সে সেটা। সামনেটা দেখে নিচ্ছে সতর্ক দৃষ্টিতে। তারপর পা ফেলছে আন্দাজ মতো। মিনিট সাতেক হাঁটলো শহীদ এভাবে। তারপর সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো মনে মনে। পেন্সিল টর্চটা নিভিয়ে দিলো সে। সামনে দেখা যাচ্ছে দিনের আলোর ছটা। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে এসেছে।

আশায় আশায় এগোলো শহীদ। ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তার মন। কৌতূহল জাগছে। কি আছে সুড়ঙ্গের শেষে?

একটা করুণ কাহিনী আছে সুড়ঙ্গের শেষে। ভয়ঙ্কর একটা ইতিহাস আছে

চরম বিপদের সূচনা আছে। মুখ-ব্যাদান করে অপেক্ষা করছে এই দ্বীপের কুটিলতা—হিংস্রতা।

থমকে দাঁড়ালো শহীদ। নিষ্পলক তাকালো সে সামনে। এ-ও কি সম্ভব?

ছয়

বসে আছে একটি মানুষ। না, ভুল বলা হলো। কোনো একদিন এখানে এসে বসেছিল মানুষটা। ঠিক তেমনি বসে আছে সে আজও। ঠিক একই ভঙ্গিতে, একই উদ্দেশ্যে। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, শরীরে তার এক কণা মাংসের চিহ্ন মাত্র নেই। সব ঝরে গেছে সময়ের সাথে সাথে। কঙ্কালসার নয়, সম্পূর্ণ কঙ্কাল সে এখন। মরে ভূত হয়ে গেছে কত যুগ আগে কে জানে!

কে ও? কোথা থেকে এসেছিল এখানে। পাথরটার সামনে এভাবে এসে বসেছিলই বা কেন সে? বসার ভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে না লোকটা হাঁটতে-চলতে পারতো না। তবে?

কঙ্কালটার সামনে উঁচু মতো পাথর একটা? ভ্রূ কুঁচকে কি যেন লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলো শহীদ। কিসের আঁচড় ঐ পাথরটার গায়ে! লেখা মনে হচ্ছে যেন!

পরিষ্কার আলোর অভাব বোধ করলো শহীদ। পেন্সিল টর্চটা আবার পকেট থেকে বের করে পায়ে পায়ে এগোলো সে পাথর এবং কঙ্কালটার দিকে।

কঙ্কালটার মাথা ঠেকে আছে পাথরটার গায়ে। হঠাৎ একটা ছোরার ফলা চকচক করে উঠলো মেঝেতে। স্টেনলেস স্টীল। তুলে নিলো শহীদ ব্লেডটা। মনোযোগ দিয়ে দেখলো সে জিনিসটা। আশ্চর্য! বাঁটটার সবটুকু নেই কেন ছোরাটার? শহীদের মনে হলো কে যেন দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলেছে কাঠের বাঁটটা। পেন্সিলটর্চটা এদিক ওদিক ঘোরালো শহীদ। আরো একটা জিনিস পাওয়া গেল। শার্টের বোতাম একটা। অর্ধেকটা নেই। কে যেন দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। পাথরটার গায়ে আলো ফেললো এবার শহীদ।

অবিশ্বাস করার উপায় নেই। জ্বল জ্বল করে উঠলো শহীদের চোখের সামনে কয়েকটি লাইন। ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে কয়েকটা কথা পাথরটার গায়ে। অতি যত্নে, অনেক পরিশ্রম স্বীকার করে এই মৃত মানুষটি লিখে গেছে অদ্ভুত কয়েকটা কথা। করুণ সে কাহিনী। ভয়ঙ্করও বটে। ভরে উঠলো শহীদের বুকটা এই অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটির প্রতি করুণায়। দুঃখ হলো তার মানুষটার দুর্ভাগ্য দেখে। শিউরে উঠলো সে মানুষটির কষ্টের কথা কল্পনা করে। না খেতে পেয়ে সে মরেছে তিলে তিলে। তবু তার সাহস হয়নি···

মৃত মানুষটি ইংরেজীতে লিখে গেছে পাথরটার গায়ে ছোরার ফলা দিয়ে-বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমার নাম আলবার্ট হোয়াইটম্যান। সুইডেন আমার জন্মভূমি। অরনিথলজির ছাত্র ছিলাম আমি। জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে

পড়াশোনা করেছিলাম।

'উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে আমি এবং আমার দুজন বন্ধু অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের জন্যে সুইডেন থেকে যাত্রা আরম্ভ করি। সে-সময় ছুটি উপলক্ষে দেশেই ছিলাম আমরা। ছুটি শেষ হয়ে আসার দেরি ছিলো। সময়ও কাটছিল না ভালভাবে। তাই আমরা তিন বন্ধু মিলে ঠিক করি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ভ্রমণে বের হবো।

'আগস্ট মাসের এক তারিখে জাহাজে চড়ি আমরা। ঠিক তার বিশদিন পর ভীষণ একটা সাইক্লোনে ডুবে যায় আমাদের জাহাজ। জাহাজের যাত্রীরা কে কোথায় ভেসে গেল তা আমার জানা নেই। তবে আমরা তিন বন্ধু সবসময় একই সঙ্গে ছিলাম। একটি লাইফবোটে উঠে পড়েছিলাম আমরা। আমাদের দুর্ভাগ্য, অন্য কোনো যাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে।

'রাতের বেলা ডুবে গিয়েছিল আমাদের জাহাজ। সকাল যখন হলো, তখন দেখলাম আমরা একটা দ্বীপের সামনে পৌঁছেছি। আনন্দই হয়েছিল দ্বীপটা দেখে। কিন্তু আমরা কেউই জানতাম না এই দ্বীপটা আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে মৃত্যুগহ্বরে। মা-বাবা-ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল এই ভয়ঙ্কর দ্বীপটা আমাদেরকে। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

'বেশি কথা লিখতে পারবো না আমি। গত তিনদিন কিছু খাবার জোটেনি আমার। সংক্ষেপে দু'চার কথা জানাচ্ছি শুধু। যাতে যদি কোনো মানুষ এখানে আসে সে যেন

আমার লেখা পড়ে সাবধান হয়। এটা একটা হিংস্র অসভ্য জংলীদের দ্বীপ। আমার এক বন্ধুকে এরা বলি দিয়েছে আমার সামনে। অপর বন্ধুটিকে এরা জংলীদের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তারও আয়ু মাত্র এক বছর। ছেষট্টি সালের আগস্ট মাসের কুড়ি তারিখে একেও বলি দেয়া হবে। এটাই ওদের নিয়ম। কোনো সভ্য মানুষ যদি জাহাজডুবির পর এই দ্বীপের একটি নির্দিষ্ট পাথরে ওঠে এবং তাকে দেখে যদি পছন্দ হয়ে যায় এদের, তবে এক বৎসরের জন্যে তাকে রাজ-জামাতা করে আরাম-আয়েশে রাখা হয়। তারপর বছর ঘুরলেই হত্যা করা হয় তাকে। যে পাথরে অবস্থান করলে জামাতা হিসেবে এক বৎসরের জন্যে মেনে নেয় ওরা সেটি দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে মাইলখানেক এগোলেই পাওয়া যাবে। সমুদ্রের কাছেই আছে সেই পাথরটা। পাথরটাকে ওরা 'খাংখাবি কাংখাবি' বলে ডাকে। যার অর্থ দেবতার চাঁদি। আমার সেই বন্ধু জানে না যে তাকে এক বৎসর পর হত্যা করা হবে। লুকিয়ে পালিয়ে আসার সময় আমি তাকে আমার সঙ্গে আসতে বলেছিলাম। সে রাজি হয়নি। এমনকি সে একথা জানার পরও আমার প্রতি কোনো সহানুভূতিও জানায়নি, আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে শত্রুর মতোই নির্বিকার ছিলো। সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে···আমার শেষ অনুরোধ, দক্ষিণ দিকে যেন কেউ ভুলেও না যায়···'

আর পড়া গেল না। দুর্বল হয়ে পড়েছিল লোকটা। হাত কাঁপছিল নিশ্চয়ই তার। আঁকাবাঁকা ভাবে কি কি যেন লিখতে চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু অস্পষ্ট সে আঁচড়গুলো। সম্ভবতঃ ওই পর্যন্ত লিখেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েছিল দুর্ভাগা!

চোখ মুছলো শহীদ। বললো, 'ধন্যবাদ, ভাই আলবার্ট হোয়াইটম্যান। আমি তোমার জন্যে মর্মাহত এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, সাবধানবাণী লিখে রেখে যাবার জন্যে। সৃষ্টিকর্তা তোমার আত্মাকে সুখ-স্বস্তি দান করুন।'

কি মনে করে আলবার্ট হোয়াইটম্যানের ঠিকানা লিখে নিলো শহীদ একটা ওয়াটারপ্রুফ নোটবই বের করে। তারপর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো সে ত্বরিত বেগে। দক্ষিণ দিকে যেতে হবে শহীদকে। তাড়াহুড়ো করে হাঁটছে সে। দক্ষিণ দিকেই আছে সেই পাথরটা। যেটার নাম 'খাংখাবি কাংখাবি।'

তারিখটা শহীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আলবার্টের বন্ধুকে জংলীরা রাজ-জামাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালের আগস্ট মাসের কুড়ি তারিখে। আজও আগস্ট মাসের কুড়ি তারিখ। উনিশশো ছেষট্টি সাল এটা। পুরো এক বছর হয়েছে আলবার্টের বন্ধু রাজ-জামাতা হয়েছে। আজ, আজই তার এই পৃথিবীতে শেষ দিন। জংলীদের নির্মম নিয়ম অনুযায়ী আজই তাকে বলি দেয়া হবে সেই 'খাংখাবি কাংখাবি' পাথরের উপর।

প্রায় ছুটতে ছুটতে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে শহীদ। বাঁচাতে হবে লোকটাকে। আলবার্টের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বটে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে লোকটাকে রক্ষা করা শহীদের কর্তব্য। লোকটাকে বাঁচাবে সে জংলীদের কবল থেকে।

একটা নদীর সামনে পথটা শেষ হয়েছে। পাহাড়ী নদী। স্বভাবতই খরস্রোতা। জঙ্গল দেখা যাচ্ছে নদীর ওপারে। গাছগুলো কেমন লতাপাতা বিশিষ্ট। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ওগুলো কি। একটা আশঙ্কা দেখা দিলো শহীদের মনে। কিন্তু আমল দিলো না সে আশঙ্কাটাকে। ভাবনা-চিন্তা করার সময় কম। যতো তাড়াতাড়ি 'খাংখাবি কাংখাবির' কাছে পৌঁছুতে পারে ততোই ভালো। নয়তো যা সর্বনাশ ঘটবার ঘটে যাবে।

ঝাঁপ দিলো শহীদ পানিতে। ছোট্ট নদীটা। তেমন চওড়া নয়। তা সত্ত্বেও স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওপারে পৌঁছুতে বেশ সময় লাগলো। কিন্তু একি! সাপ!

সতর্ক হয়ে উঠলো শহীদ। কিন্তু এখন আর সতর্ক হয়ে কি হবে। এসে যখন পড়েছে তখন এগোতেই হবে সামনে। গাছে গাছে ঝুলতে দেখতে পেলো শহীদ অদ্ভুত জাতের একধরনের অসংখ্য সাপ। সবুজ। মধ্যমা আঙুলের মতোই সরু। এবং হাত দুয়েকের বেশি লম্বা নয় কোনোটা। গাছের ডালে ডালে ঝুলে আছে সাপগুলো। নট নড়ন চড়ন। যেন সাপ নয় ওগুলো। লতাপাতা বলে ভ্রম হয়।

ধীর পায়ে, এতোটুকু শব্দ না করে হাঁটছে শহীদ। জঙ্গলটা ততো গভীর নয়। মাটির দিকে তাকিয়েই হাঁটছিল শহীদ। গাছের সাপগুলো সাড়াশব্দ না পেলে

কিছু বলবে না। আরামে ব্যাঘাত না ঘটলেই হলো ওদের। কিন্তু মাটিতে যেগুলো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সেগুলোর গায়ে শুধু একটু আঁচড় লাগলে হয়। অমনি ঠুকরে দেবে। দেখতে হবে না আর, সাপগুলোর গায়ের রঙয়ের মতোই সবুজ হয়ে যাবে শরীরের রঙ বিষক্রিয়ায়। ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুমুখে টুঁ-শব্দটিও না করে।

এবং সেই ব্যবস্থাই শহীদের জন্যে করা হয়েছে! এগিয়ে আসছে সড়সড়িয়ে একটা সাপ। রঙিন একটা প্রজাপতিকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল আসলে সাপটা। নিশ্চিন্ত মনে বসেছিল প্রজাপতিটা ঘাসের ডগায়। হঠাৎ শহীদের পায়ের শব্দে উড়ে গেল সেটা। বিগড়ে গেল সাপটার মেজাজ। শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে তাকালো সে শহীদের দিকে। তারপর 'আয় তোকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি' মনে মনে বলে এগিয়ে আসতে লাগলো।

এদিকের জায়গাটা সংকীর্ণ। দু'দিকে গাছ। মাঝখানে সরু ঘাসের জমি। নিঃশব্দ পদক্ষেপে হাঁটার চেষ্টা করছিল শহীদ। গাছগুলো বেশ বড় বড়ই। কিন্তু ডালপালাগুলো খুবই নিচু। সাপগুলো ঝুলছে মাথার উপরেই। তা হোক, শহীদ ভয়ের কিছু দেখতে পেলো না। আসলে মাটির নিচের সাপটিকে সে তখনও লক্ষ্য করেনি।

হাত দেড়েক দূরে থাকতে বিপদটা টের পেলো শহীদ। ফলে কি করছে না করছে ভেবে দেখার আগেই উপর দিকে লাফ দিলো সে। ধরে ফেললো একটা নিচু গাছের ডাল। ঝুলতে লাগলো পা দুটো শূন্যে রেখে।

শত্রুকে চোখের সামনে থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে অবাক হলো সাপটা। দাঁড়ালো না সে। একটা হৃষ্টপুষ্ট পোকা দেখে পেটুক সাপটা ছুটলো সেদিকে। ঠিক এমনি সময়ে শিউরে উঠলো শহীদ। ডালের উপরে তার হাত দুটো স্পর্শ করে হেঁটে চলে যাচ্ছে একটি সাপ। ভর-পেট খাওয়া-দাওয়া করে চলার গতি তার ধীর। ডালটা খামোকা কেঁপে না উঠলে নড়তো না সে। শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইলো শহীদ। সময় যেন শেষ হতে চায় না। সাপটা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

অবশেষে কোনো বিপদ না ঘটিয়েই চলে গেল সাপটা। ঝুপ করে নামলো শহীদ মাটিতে। তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে দৌড় দিলো দক্ষিণ দিকে। দেরি হয়ে গেছে অনেক। যা থাকে কপালে, দৌড়েই পার হয়ে যাবে সে ভয়ঙ্কর জঙ্গলটা।

বেশিক্ষণ দৌড়ুতে হলো না শহীদকে। মিনিটখানেক দৌড়াবার পরই দেখা পেলো সে আর একটা পাহাড়ী নদীর। নদীটা পেরিয়ে আবার ছুটলো সে। খানিকক্ষণ পরই সামনে সমুদ্রের দেখা পাওয়া গেল। কি চকচক করছে ওটা? ওটাই কি 'খাংখাবি কাংখাবি' পাথর?

কোনো সন্দেহ করার উপায় নেই। কাছাকাছি পৌঁছেই শহীদ নিরাশ হলো। যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে। সূর্যের আলো পড়ে ঝকমকিয়ে উঠেছে পাথরটা।

শহীদ দেখলো তাজা লাল রক্তে কে বা কারা যেন লেপে গেছে পাথরটা। শুকিয়ে যায়নি এখনও।

দেরি করে ফেলেছে শহীদ। আলবার্টের বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর কপালে যা ঘটবার ছিলো তাই ঘটে গেছে: জংলীরা তাকে বলি দিয়ে চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু লাশটা কই?

চারপাশে তাকাতে তাকাতে জঙ্গলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখলো শহীদ। লাশটা কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে 'খাংখাবি কাংখাবি' পাথরের উপরে যে রক্ত দেখা যাচ্ছে সে রক্ত কোনো মানুষের নয়। খুবই সম্ভব সেটা, ভাবলো শহীদ। এ রক্ত হয়তো কোনো জানোয়ারের। জংলীরা হয়তো কোনো জানোয়ারকে বলি দিয়ে নিয়ে চলে গেছে পুড়িয়ে খাবার জন্যে।

আপনমনে হাঁটতে শুরু করলো আবার শহীদ। জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করবে সে। নিশ্চয় করে জানতে হবে আলবার্টের বন্ধুর কি দশা হয়েছে।

এদিকে কেন এলো শহীদ! আলবার্ট বলেছিল দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে জংলীদের গ্রাম। কিন্তু এ যে দেখা যাচ্ছে কাদার সমুদ্র! গ্রামটা তো এদিকে নয় তাহলে। ভুল দিকে চলে এলো নাকি সে?

ঠিক তাই। গভীর জঙ্গলে সূর্য ঠিক কোনদিকে ছিলো বুঝতে পারেনি শহীদ। দক্ষিণ দিক ছেড়ে পূর্বদিকে চলে এসেছে সে। সামনে এগোবার কোনোই উপায় নেই। কিন্তু আধঘন্টা ধরে হেঁটে আবার ফিরে যাওয়াও তো বিরক্তিকর।

অথচ সামনে এগোতে গেলে বিপদও ঘটতে পারে। জঙ্গলটা হঠাৎ এইখানে এসে শেষ হয়ে গেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে কালো রঙয়ের থকথকে কাদা। লম্বা একটা নদীর পানি সরে গিয়ে যেন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেদিকেই কাদা আর কাদা। কাদার নদীটা চওড়াও কম নয়। শ'খানেক গজ হবে সম্ভবত। তা হোক, পা ফেলে ফেলে পেরিয়ে যাওয়া যায় হয়তো।

কি করবে ভাবছিল শহীদ। হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে কাদার নদীটার কাছ থেকে। পিছনেই তার বনভূমি। পা বাড়াবার জন্যে মনস্থির করতে পারছিল না সে। এরকম কাদা আগে কখনও দেখেনি সে। পেরিয়ে যাবার কথা ভাবছে বটে, কিন্তু সাধারণ কাদা যদি না হয়ে থাকে? চোরা কাদা হয় যদি? তাহলে আর দেখতে হবে না। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যেতে হবে। বিপদের আশঙ্কা জেনেও রিস্কটা নেয়া কি উচিত হবে?

সাবধান শহীদ খান!

খশখশ করে শব্দ হলো কেমন যেন পিছন দিক থেকে। আর কে যেন শহীদের কানে কানে বলে গেল-সাবধান বাছা!

প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার শুনতে পেলো শহীদ। অসম্ভব দ্রুত হাতে হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে ফেলেছিল সে আগেই। গর্জনটা কানে ঢুকতেই বোঁ করে

পিছন দিকে ফিরলো সে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের নলটা একটু উপর দিকে তুলে গুলি করলো শহীদ।

শূন্যেই একটা ডিগবাজি খেলো চিতাটা। অতিরিক্ত জোরে লাফ দিয়েছিল সে। শহীদের পাঁচ হাত দূরে ফুটবলের মতো ড্রপ খেলো হলুদ চক্র আঁকা চিতাবাঘটা। ড্রপ খেয়ে সরাসরি কাদায় গিয়ে পড়লো।

গুলিটা লেগেছিল বাঘটার বুকে। ছটফট করতে লাগলো চিতাটা। শহীদ ভাবলো গুলি লাগার ফলেই ওরকম ছটফটাচ্ছে চিতাটা। কিন্তু না! ডুবে যাচ্ছে চিতাটা কাদার ভিতর। চোরা কাদাই! তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেণ্ডের ব্যাপার। ডুবে গেল বাঘটা কাদার ভিতর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। না, ফিরে যেতে হবে শহীদকে। এই কাদা পেরিয়ে কেউ কোনো দিন যেতে পারবে না ওপারে।

শহীদের জন্যে অপেক্ষা করছিল আরও একটা চমক। ঘুণাক্ষরেও যা সে জানতো না তাই জানলো সে। একদিকে আনন্দ এবং অপরদিকে অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসলো তাকে। সত্যিকথা বলতে কি, চোখে শর্ষে ফুল দেখছিল যেন সে। কি করবে কি ভাববে তা পর্যন্ত নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো তার পক্ষে। প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে 'খাংখাবি কাংখাবি' পাথরটার সামনে।

ফিরতি পথে পাথরটার সামনে দিয়েই যাচ্ছিলো শহীদ। পাথরটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলো সে অন্যদিক দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করার জন্যে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। অবিশ্বাসে চোখ দুটো কুঁচকে উঠলো তার প্রথমে। উত্তেজনা বোধ করলো সে রীতিমত। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে হলো তাকে পাথরটার দিকে। সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো সে। কোনো সন্দেহই রইলো না আর। স্পষ্ট অক্ষরে লেখা, পড়তে অসুবিধে হবার কারণ নেই। সম্ভবত কোনো ছুঁচালো পাথর দিয়ে লেখা হয়েছে শব্দটা–'কামাল'।

কামাল! তবে এই দ্বীপে এসে উঠেছে? আকাশে উড়ে গিয়ে ডিগবাজি খেতে ইচ্ছে করলো শহীদের। মুখটা ভরে উঠলো আনন্দের হাসিতে। ফুটে উঠলো প্রিয় বন্ধুর ছবিটা চোখের সামনে। কামালের হাত মুখ নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটিও দেখতে পেলো শহীদ। এক চোখ টিপে কামালের রসিকতা করার ধরনটা মনে পড়ে যেতে স্নেহসূচক সম্বোধন করলো শহীদ কামালকে, 'পেটুকবাজ! খাওয়া-দাওয়ার খবর কি হে তোমার? পেটে কিছু পড়েছে তো?'

কিন্তু মুহূর্ত পরই দপ করে নিভে গেল শহীদের উজ্জ্বল মুখটা। পাথরটার উপর কামাল নিজের নাম লিখেছে। আর রক্তও লেগে রয়েছে পাথরটার উপর। না! না! এসব কি ভাবছো শহীদ। তা কেন হবে। এ নিশ্চয় আলবার্টের সেই বন্ধুর রক্ত। বা কোনো জানোয়ারের। কামাল কি করেছে জংলীদের যে তাকে বলি দেয়া হবে?

কিন্তু শান্ত হলো না শহীদের মন। বারবার লেখাটা এবং রক্তের দাগের উপর

দৃষ্টি আছড়ে আছড়ে পড়লো তার। যতোই আশঙ্কাটা দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে সে, ততোই যেন জাঁকিয়ে বসছে মাথার ভিতর সেটা—কামালকে বলি দিলো নাকি জংলীরা!

এ এক অবর্ণনীয় মানসিক কষ্ট। বিচলিত হয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো শহীদ। কোনো কথাই স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখার অবস্থা নয় তার। জংলীদের গ্রামে গিয়ে পৌছুতে হবে তাকে। এটুকু মাত্র সে বুঝতে পারছে। তারপর কি হবে না হবে, কি করতে পারবে সে বা কি করতে পারবে না তা সে জানে না। প্রয়োজনও বোধ করছে না জানার।

জঙ্গলটা অসম্ভব ঘন। হাঁটছিল শহীদ তা সত্ত্বেও যথাসম্ভব দ্রুত। তিন তিনবার গাছের মাথায় চড়ে জংলীদের গ্রামটা কোন্দিকে দেখার চেষ্টা করেছে সে। প্রথম দু'বার ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয়বার হদিস পেয়ে গেছে গ্রামটার। সেইদিকেই হাঁটছে সে হাঁপাতে হাঁপাতে। কোনো ক্লান্তি নেই যেন তার। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তার নিজের শারীরিক কষ্টের প্রতি। হেঁটে চলেছে সে তার প্রিয় বন্ধুকে কাছে পাবার জন্যে। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নয় এখন। জংলীদের হাতে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না তাহলে।

টপ টপ করে দু'ফোঁটা তাজা রক্ত পড়লো শহীদের কাঁধে। আশ্চর্য হয়ে তাকালো নিজের কাঁধের দিকে। রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গেল। কোথা থেকে রক্তের ফোঁটা পড়লো? মাথা তুলে তাকালো শহীদ উপর দিকে। ধক্ করে উঠলো অন্তরাত্মা। কামাল নাকি!

না। শ্বেতাঙ্গ একজন। কামাল নয়, একজন শ্বেতাঙ্গের ধড়টা ঝুলছে গাছের উপর। মাথাটা ঝুলছে পাশের একটি ডালে। বুঝতে বাকি রইলো না শহীদের এ কার লাশ। আলবার্ট হোয়াইটম্যানের বন্ধু ছিলো লোকটা।

কিন্তু সময় নষ্ট করলে চলবে না আর। কামালকে বলি দেয়া হয়নি, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। কিন্তু জংলীদের গ্রামে কামালকে যে পাওয়া যাবে তার কি নিশ্চয়তা? সে হয়তো অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বনভূমির আর কোনো দিকে।

মহা ভাবনায় পড়ে গেল শহীদ। গাছটার তলা থেকে সরে এসে মাথা হেঁট করে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো সে। জংলীদের গ্রামে গিয়ে কি কোনো লাভ হবে? কামাল হয়তো ধরা পড়েনি ওদের হাতে। সে যদি জংলীদের গ্রামে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তবে···

খোঁচাটা লাগলো প্রথমে শহীদের বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে। তারপর পিঠের সাত-আট জায়গায় এবং পাঁজরের দু'দিকেও অনেকগুলো মৃদু খোঁচা অনুভব করলো শহীদ।

পকেটে হাত চলে গেল শহীদের ত্বরিত বেগে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। বর্শার খোঁচাগুলো চেপে বসলো কাপড় ভেদ করে মাংসের উপর। সেই সাথে বিরাশি

সিক্কার একটা রদ্দা পড়লো তার কাঁধে। অবশ হয়ে গেল একদিকের কাঁধ। তা সত্ত্বেও পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এনেছে শহীদ। কিন্তু কাজ হলো না। একজন জংলী মজা করার জন্যে, যেন মামার বাড়ির আবদার-শহীদের দু'দিকের কাঁধের উপর দিয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে চাপ দিলো প্রথমে। তারপর দু'মণ ওজনের জংলীটা শহীদের কাঁধ ধরে ঝুলে পড়লো। হেসে উঠলো একজন জংলী শহীদকে ভার সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল রিভলভারটাও। তুলে নিলো সেটা জংলীরা। তারপর বর্শার খোঁচা মারতে মারতে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো শহীদকে তাদের গ্রামের দিকে।

পনেরো-কুড়িজন জংলী দেখে শান্ত ছেলের মতোই হাঁটতে লাগলো শহীদ। সত্যিকথা বলতে কি, এদের হাত থেকে পালাবার মতলব আঁটছিল না সে। পালানো অসম্ভব তা তার বুঝতে বাকি ছিলো না।

সাত

এক রাজা। তার সাত মন্ত্রী। রাজার এগারো দু'গুণে বাইশজন স্ত্রী। সাত মন্ত্রীর সাত দু'গুণে চোদ্দ। পোষা কাকাতুয়া আছে রাজার এক ডজন। আর আছে তিনটে বাঁদর। মন্ত্রীদের প্রত্যেকের আছে একটি করে পোষা ইঁদুর। তাদের পকেটেই থাকে সেগুলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজার মাথার প্রশস্ত টুপিটি। টুপি নয়, যেন উদ্যান একটা। বাঁশেরই তৈরি জিনিসটা। তবে দু'হাত চওড়া সেটার জমি। লম্বায় আড়াই হাতের চেয়ে কম নয়। খাবার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে টুপিটার সমতল জমিতে। পায়রারা বসে সেখানে দানা খুঁটছে।

বাঁশের কেল্লায় রাজার বাস। কেল্লার মাঝখানে বিরাট বড় একটা ঘর। ঘর না বলে মাঠ বলাই ভালো। ঐ ঘরটাই হলো দরবার বা কাচারি ঘর।

বৈকালিক দরবার বসেছে কাচারি ঘরে।

জংলীরাজ 'হিরিরিরি' আসন গ্রহণ করেছেন সবেমাত্র। কাকাতুয়া পাখিগুলো ঘরের বারোটা কোণে একটি একটি করে শিকল দিয়ে বাঁধা। এখানে বলে রাখা ভালো যে কাচারি ঘরটা সাত আট মানুষ হবে উঁচু এবং মোট বারোটা কোণ ঘরটার। রাজা হিরিরিরি-র তিনটে বাঁদরও এই রাজসভায় উপস্থিত। বলা বাহুল্য, বাঁদরগুলো তাদের বাঁদরামি এক দণ্ডের জন্যেও বন্ধ রাখেনি। ছাদের উপরদিকে তিনটে বাঁশের সংস্থান করা আছে। সেখান থেকে একটা বাঁদর মুখ ভেংচাচ্ছে রাজাকে আদর করে। দ্বিতীয়টি একটি পা সারাক্ষণ রাজার দিকে তুলে ধরে রেখেছে। তৃতীয়টি অভিনয় শিল্পে ওস্তাদ বলে মনে হয়। রাজা যা করছে সে-ও তা অনুকরণ করে চলেছে হুবহু। রাজা হাসলে সে-ও হাসে। রাজা রাগলে সে-ও রাগে।

আগেই বলা হয়েছে কাচারি-ঘরের বারোটা কোণ। বারোটা কোণের মাঝে

মাঝে দুটো করে দরজা আছে উন্মুক্ত। মোট চব্বিশটা দরজা। প্রতি দরজায় গম্ভীর-মুখ শান্ত্রী দাঁড়ানো। হাঁড়িপনা মুখ করে, হাতে চিত্রাঙ্কিত ঢাল নিয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা অনড়। ঢাল আছে, কিন্তু তলোয়ার নেই তাদের। তলোয়ারের বদলে প্রত্যেকের হাতে একটি করে দশসেরী গদা।

রাজ-সভার প্রতি অধিবেশনে প্রজারা একবার করে হাজিরা দিয়ে যায়। কড়া নিয়ম এটা। প্রত্যেককেই দিনে দু'বার করে এই হাজিরা দিতে হবে। সকালে একবার, তারপর আর একবার বিকেলে।

বিকেলের অধিবেশন চলছে এখন। দ্বীপের প্রজারা বেশিরভাগই উপস্থিত রাজসভায়।

নির্দিষ্ট রুটিন করা আছে রাজার কর্মের কোন্ সময় তিনি ঠাট্টা করে সময় কাটাবেন, কোন্ সময় তিনি বিচার পর্ব সারবেন, কোন্ সময় নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দেবেন তিনি, আবার কোন্ সময় শুধু শুধু হাসবেন—কোন কারণ ব্যতীতই হাসবেন তিনি একনাগাড়ে নির্দিষ্ট একটা সময় ধরে। এবং তিনি যে একাই শুধু হাস্য পর্বের একমাত্র অভিনেতা হবেন তা নয়। রাজসভায় তখন যারা উপস্থিত থাকবে তাদের প্রত্যেককেই রাজার সাথে তাল রেখে হাসতে হবে।সাত মন্ত্রীরা এবং রাজার স্ত্রীরাও হাসতে বাধ্য। ছোটো ছেলেপিলে থাকলে তারাও বাদ যাবে না। না হাসলে রাজার যখন নিষ্ঠুরতা প্রমাণ দেবার সময় আসবে তখন এই অপরাধের সাজা দেয়া হবে।

বিচারপর্ব সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

রাজা হিরিবিরি বসে আছেন উঁচু একটা মঞ্চের উপর বিরাট বাঁশের সিংহাসনে। সাত মন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক তাঁর পিছনে সারবন্দী হয়ে। বসবার ইন্তেজাম তাদের কপালে নেই। রাজার স্ত্রীরা বসে আছেন রাজার পদতলে। বাইশজন দুম্বা মার্কা মহিলা মুখে রঙয়ের কারুকার্য নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন কটমটিয়ে। মন্ত্রীদের স্ত্রীরা সকলেই এখন অনুপস্থিত। সাতজন মন্ত্রীর চোদ্দজন স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সতীনে সতীনে চুল ছেঁড়াছেঁড়ি শুরু করেছিল। রোজকার ব্যাপার এটা। রাজা স্বয়ং তাদের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বের করে দিয়েছেন রাজসভা থেকে। মন্ত্রীরা সকলেই আজ বেজায় খুশি রাজার এই বিচারে।

রাজার পাশেই বসে আছে রাজকন্যা মিল্‌তি রিব। সদ্যপ্রাপ্ত নতুন স্বামীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে। বসার নিয়ম রক্ষা করে আসন গ্রহণ করেনি সে। নতুন স্বামীর দিকে পাশ ফিরে বসেছে সে। ডান পা-টি তুলে দিয়েছে সে নতুন স্বামীটির কোলের উপর। নতুন স্বামী বেচারি এই দেশে নতুন তাই কি করলে আর কি না করলে বলি দেয়া হবে তাকে তা সে জানে না। সেজন্যেই সম্ভবত সে রাজকন্যার পা-টি অতি যত্নের সঙ্গে টিপছে। বিদেশী রাজ-জামাতা বসেছে রাজকন্যার পাশের আসনটিতেই। এই বিদেশী নতুন রাজ-জামাতাটি আসলে বাঙালী—বাংলাদেশেই তার বাস। নাম কামাল আহমেদ। ঢাকার প্রাইভেট

ডিটেকটিভ শহীদ খানের সহকারী। শহীদ খানের সেই স্বনামখ্যাত বন্ধুই এ—কামাল।

জংলীদের নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিদেশীকে সমুদ্র তীরবর্তী 'খাংখাবি কাংখাবি' পাথরের উপর দেখা গেলে তাকে এক বৎসরের জন্যে রাজ-জামাতা করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত কামালের লাইফবয়টা জোয়ারের সময় সেই সম্মানীয় 'খাংখাবি কাংখাবি' পাথরের উপর উঠে থেমে গিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় পাথরটার উপর পড়েছিল কামাল। এমন সময় পাহারাদার একজন জংলী তাকে দেখতে পেয়ে সত্তুরবার তার পা চেটে নিয়ে ছুটে আসে রাজাকে সুখবরটা জানাতে। রাজা তখন তার তিন বাঁদরকে মাথায় তুলে খেমটা নাচ নাচছিলেন। সুখবর শুনেই রাজকন্যাকে ডাকলেন তিনি। নিজের মাথা থেকে বাঁদর তিনটিকে চালান দিলেন তিনি যুবতী কন্যার মাথায়। তারপর নাপিত ডেকে কেটে ফেললেন নিজের মাথার সব চুল। নিয়ম অনুযায়ী করলেন এটা। চুলগুলো পাঠিয়ে দিলেন তিনি নতুন রাজ-জামাতার কাছে। সে এগুলো কয়েকটা গোছা করে বেঁধে মালার মতো পরবে নিজের গলায়। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা। আসলে রাজা যে নতুন এই বিদেশী মানুষটিকে জামাতা হিসেবে স্বীকার করে নিলেন এই দুর্গন্ধযুক্ত চুলের মালাই তার প্রমাণ।

রাজার চুল নিয়ে ছুটলো মন্ত্রীরা। তাদের সঙ্গে চললো বাইশজন রানী পরস্পরের সঙ্গে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করতে করতে। আর পাঠানো হলো রাজ-কন্যাকে। রাজকন্যার যাবার নিয়মও বাঁধা। হেঁটে হেঁটে যাবে সে সকলের আগে আগে। তার পিছনেই থাকবে একজন নাপিত। নাপিতেরও দরকার আছে। রাজ-জামাতার মস্তক-মুণ্ডন করবে সে। নাপিতের পিছনে একটি চারবেহারার পাল্কি। রাজ-জামাতাকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে এতে করে। পিছনে পিছনে আরও অনেক কিছু চললো।

নাপিত অচেতন কামালের মাথা মুড়িয়ে দিলো। ঘুম ভাঙেনি এখনও তার। রাজকন্যা মিল্‌তি রিব নিজের হাতে গোছা বানিয়ে পরিয়ে দিলো গলায় চুলের মালা। এরপরই জ্ঞান ফিরলো কামালের।

জ্ঞান ফিরলো বটে কামালের। কিন্তু সচেতন হতে দেয়া হলো না তাকে। রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী আরো নানা ক্রিয়াকাণ্ড বাকি ছিলো। একটি একটি করে সমাধা হতে লাগলো সেগুলো।

প্রথমেই রাজকন্যা মিল্‌তি রিব হাঁটু মুড়ে প্রণাম জানালো কামালের জ্ঞান ফিরতে। হতভম্ব কামাল চোখ কচলাতে লাগলো বেদম। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার বলে মনে হলো না তার চোখে। স্বপ্নেই এসব কাণ্ড ঘটতে পারে, তার ধারণা হলো।

মিল্‌তি রিব প্রণাম সেরে কামালের চোখ দুটো বন্ধ করে দিলো আঙুলের চাপ দিয়ে। চোখ বন্ধ করে রইলো কামাল। চোখ বন্ধ করেই কেমন যেন সন্দেহ হলো তার একটা। বাঁ হাতটা মিলতি রিব কোলের উপর টেনে নিয়ে রঙ মাখাচ্ছে। ডান

হাতটা মাথার উপর ওঠালো সে। তার সন্দেহ হয়েছে মাথাটা অতিরিক্ত হালকা হালকা ঠেকছে।

নিজের কামানো মাথায় হাত পড়লো কামালের। বজ্রাঘাত পড়লো যেন মাথায়। একেবারে চাঁছাছোলা মাথাটা! চুল বলতে এক গাছিও নেই।

কিন্তু হতভম্ব হবার আরো উপকরণ তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। একটু পরই মিলতি রিব তার চোখ দুটোর পাতা খুলে দিলো আঙুল দিয়ে। একি! চমকে উঠলো কামাল তার সামনে দুটো কালকেউটেকে ফণা তুলে দুলতে দেখে। কামালকে আঁতকে উঠতে দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠলো মিল্তি রিব। তারপর দু'হাতে করে দু'বাটি দুধ নিয়ে এসে কামালের হাতে দিলো সে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সম্ভবত কামাল। কিন্তু ভিতর ভিতর নাভিশ্বাস উঠছে তার তখন। হার্টবিটগুলো পরস্পরের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। কাঁপা হাতে বাটি দুটো নামিয়ে রাখলো সে পাথরের উপরে। ব্যস! অমনি কেউটে দুটো মাথা হেঁট করে খেতে শুরু করলো বাটির দুধ। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো এবার কামালের। বোঝা গেল কেউটে দুটো পোষা।

বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে কামাল বুঝলো, স্বপ্ন নয় এসব। নিষ্ঠুর বাস্তব।

পাল্কি চড়ে রাজ-সভায় যেতে যেতে কামাল মিল্তি রিব-কে প্রশ্ন করলো, 'তোমার নাম কি, কন্যা?'

'জালকি ফালকি ফঃ!'

মিল্তি রিব কামালের প্রশ্ন বুঝতে পারলো না। সে তার নিজের ভাষায় বললো, 'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে গো!'

কামাল হাসি সামলে জিজ্ঞেস করলো, '"জালকি ফালকি" তোমার নাম বুঝি।'

মিল্তি রিব এবার তার ভাষায় আদর করে যা বললো তার অর্থ তুমি আমার সুন্দর গাধা!

কামালকে কথায় পেয়ে বসেছে। চুপ করে বসে থাকতে পারছে না সে অপূর্ব সুন্দরী জংলী রাজকন্যার সামনে। কবিত্ব করে এবার সে বললো, 'কোথায় নিয়ে চলেছো আমাকে, সুন্দরী?'

রাজার তিন বাঁদরও সঙ্গে ছিলো মিল্তি রিব-এর। অভ্যাস মতো বাঁদরামি করছিল তারা। কামালের কথা শুনে কি অর্থ গ্রহণ করলো মিল্তি রিব খোদা মালুম। তিনটে বাঁদরকেই কাছে ডেকে কামালের কাঁধে চড়িয়ে দিলো সে। থ মেরে গেল এবার কামাল। এরপর একটা পাকা কলার খোসা ছাড়িয়ে কামালের মুখের সামনে ধরলো রাজ-কন্যা। কিন্তু কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি! বাঁদরগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো কলাটার উপর। দেখতে না দেখতে অদৃশ্য হলো সেটা। এরপর রাজকন্যা সরিয়ে দিলো বাঁদরগুলোকে অন্যত্র। আবার সে একটা কলা কামালের মুখের সামনে ধরলো।

খিদে যা পেয়েছিল কামালের তা বলার নয়। একটি মাত্র কলা দেখে নিরাশ হলো সে। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সে বললো, 'শুধু কলা হলে চলবে না, আরো কিছু খেতে দাও আমায়। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

উল্টা বুঝিলি রাম! মিল্‌তি রিব মনে করলো তার নতুন স্বামী বলছে—খিদে নেই আমার। তুমি আমাকে খাবার জন্যে অনুরোধ করো না, সুন্দরী!

কলাটা ফিরিয়ে নিলো রাজকন্যা মিল্‌তি রিব। পরিতৃপ্তির সাথে নিজে খেতে লাগলো সেটা। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে রইলো কামাল। তারপর মনে মনে সে বললো, 'মেয়েটা দেখছি আমার চেয়েও পেটুক!'

অবশ্যি রাজ-প্রাসাদে গিয়ে অপরিমিত ভোজন সেরে নিয়েছে কামাল। সত্যি কথা বলতে কি, রাজ-প্রাসাদে ঢুকে অবধি এখন পর্যন্ত খাবার উপর দিয়েই আছে সে। কলা সংক্রান্ত দুর্ঘটনাটার কথা ভুলে গেছে বেমালুম। পাকা কলার অগুণতি ছড়া এখন তার সামনে রাখা রয়েছে।

কলা বলে কথা নয়। আপেল, আতা, বেল, মুলো, মটরশুঁটি, ছোলা ইত্যাদি স্তূপ করা তার সামনে। মাংসের মধ্যে—ভেড়া, হরিণ, শুকর, বক, বনমুরগী ইত্যাদি আগুনে ঝলসানো হচ্ছে একদিকে। যখন যেটা হচ্ছে সেটাই নিয়ে আসা হচ্ছে জামাতার সামনে। পানীয় আছে নানা জাতের। মাদকদ্রব্যও বাদ যায়নি।

আট

রাজার এখন হাস্য উদ্গীরণ করার সময়। হাসাহাসি চলছে কর্ণবিদারী কণ্ঠে। মন্ত্রী পরিষদ, প্রজা, মহিলা, পুরুষ, ছেলে এবং মেয়ে—সকলেই হাসছে রাজার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু রাজার গলার হাসি! তুলনা হয় না। সকলকেই লজ্জা পেতে হয় তাঁর গলার জোর দেখে।

প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারলো না কামাল। সকলকে বেদম বেগে হাসতে দেখে সে ভাবলো, আরে! ব্যাপারখানা কি? পাগল হয়ে গেল নাকি এরা সবাই?

এক মিনিট কাটলো, দুমিনিট কাটলো। এমনিভাবে পাঁচ মিনিট কাটলো দেখতে দেখতে। কিন্তু হাসি আর থামে না কারো। এদিকে রাজ-কন্যা মিল্‌তি রিব কামালের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আসন থেকে ঢলে পড়ছে সে হাসির দমকে। মিল্‌তি রিব-এর পাগলিনী পারা হাসি দেখে বোকার মতো কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো কামাল। যার দিকেই তাকায় সে, তাকেই দেখে মহা রগড় দেখে সে যেন কোনমতেই হাসি চাপতে পারছে না। কিংবা কেউ যেন সকলের পেটে বা বগলে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মজা পাবার জন্যে।

ছোঁয়াচে ব্যারাম এই হাসি। প্রথম মৃদু একটু হাসলো কামাল জংলীগুলোকে পাগল-ছাগল মনে করে। তারপর দেখতে না দেখতে সে নিজেই পাগল-ছাগলে রূপান্তরিত হলো। রাজকুমারী মিল্‌তি রিবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু করলো সে

তার হাসি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাজা হিরিরির-কেও ছাড়িয়ে গেল হাসির উচ্চগ্রামের দিক দিয়ে।

মহা সর্বনাশ! একবার শুরু হলে এ যে আর থামতে চায় না রে বাবা! হাজার চেষ্টা করেও মুখ বন্ধ করতে পারছে না কামাল। হাঁপিয়ে গেছে সে। দরদরিয়ে ঘামছে। ক্রমে চোখ দুটো হয়েছে ফালাফালা । কিন্তু তা সত্ত্বেও থামাতে পারছে না সে নিজের হাসি। এমন সমস্যায় কামাল ছাড়া আর কেউ পড়েছে কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ, হঠাৎ-ই হাস্যরোলটা যেন দম আটকে থমকে গেল।

রাজা থামলেন। মন্ত্রীরাও হাসি থামালো। রানীদেরও মুখ থেকে উবে গেল হাসি। রাজাকে হাস্য সংবরণ করতে দেখে প্রজাদেরও অট্টহাস্য দম আটকে থমকে গেল। সবশেষে থামলো কামালের হাসি।

কি ব্যাপার!

উঠে দাঁড়ালেন রাজা হিরিরিরি ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে। কড়া দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে তাঁর দক্ষিণ দিকের একটা দরজার সামনে। দক্ষিণ দিকের ঐ দরজা দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে একজন বিদেশী লোককে। তাকে ঘিরে এগিয়ে আসছে রাজার অনুচরেরা ঢাল এবং গদা হাতে নিয়ে। বিদেশী একজন শত্রুকে বন্দী করে ধরে নিয়ে আসছে তারা। শত্রুর কাঁধে একটা বোঝা দেখা যাচ্ছে। মৃত ভাল্লুক সেটা একটা। এবং বলাই বাহুল্য, জংলীদের এই বিদেশী শত্রু আসলে আমাদের পূর্ব-পরিচিত গোবর্ধন গফুর।

গফুরকে দেখার আগে কামাল দেখতে পেলো মি. সিম্পসনকে। মি. সিম্পসনের কাঁধেও বোঝা দেখা যাচ্ছে। তাঁর বোঝাটা রীতিমত ভীতিপ্রদ। দু'দুটো জংলীর লাশ তাঁর কাঁধের উপর। পুব দিকের একটি দরজা দিয়ে রাজার অনুচরেরা তাঁকে নিয়ে এসেছে বন্দী করে।

ফুলঝুরির মতো ঝিলিক মারলো কামালের চোখের তারা দুটো। কিন্তু ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে মি. সিম্পসনের দিক থেকে। যেন কোনো কালেই মি. সিম্পসনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো না। মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকালো কামাল নির্বিকার ভঙ্গিতে। দ্বিতীয়বার ঝিলিক মারলো তার চোখের তারা। গফুরকে দেখতে পেয়েছে সে। গফুরও কামালকে দেখতে পেয়েই ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো হাউমাউ করে, 'কামালদা, মেরে ফেললো এরা আমাকে—বাঁচাও আমায়!'

নিষ্ঠুরের মতো মুখ করলো কামাল। চিনতে পারেনি যেন সে গফুরকে। মুখ ফিরিয়ে নিলো উত্তর দিকে। উত্তর দিকে তাকাতেই কামালের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো পলকের জন্যে। শহীদ! উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দী অবস্থায় শহীদ খান।

'কামাল!' মি. সিম্পসন ডেকে উঠলেন আকুল কণ্ঠে। শহীদকেও যেন চিনতে পারেনি কামাল। মি. সিম্পসনের ডাকে তাঁর দিকে ফিরলো কামাল আস্তে আস্তে ঘাড় বাঁকিয়ে। তারপর রাজার দিকে তাকালো সে মৃদু হেসে।

হায় হায় করে উঠলো মি. সিম্পসন এবং গফুর। কামাল তাদেরকে চিনতে

পারলো না!

'বউয়া'!

চিৎকার করে কি যেন বললেন রাজা হিরিরিরি। অমনি ছুটলো দুজন অনুচর। রাজ-সভা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল তারা। ফিরলো আধ মিনিটের মধ্যেই। কামাল দেখলো জংলী দুজন একটা মোটাসোটা শূকর ধরে নিয়ে এসেছে।

মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন রাজা হিরিরিরি। জংলী দুজন শূকরটাকে একটা বড় পাথরের উপর চিৎ করে ধরে রেখেছে। এগিয়ে গেলেন রাজা সেই দিকে। সমস্ত রাজ-সভা অধীর উত্তেজনায় দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে উন্মত্ত রাজার দিকে। পাঁচশো জংলীর এক হাজার চোখ হিংস্র দৃষ্টিতে মাঝেমাঝেই একবার করে দেখে নিচ্ছে তিন তিনজন বিদেশী শত্রুকে। টুঁ-শব্দটি নেই কারো মুখে।

একটি গদা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন রাজা চিৎ করে ধরা শুকরটার কাছে। মি. সিম্পসনের দিকে আঙুল দেখিয়ে রাজা চিৎকার করে উঠলেন, 'কারাই বা কা কিরি চস্‌স্‌-হিরিরিরি।' অর্থাৎ রাজা হিরিরিরি ঐ বিদেশীটার শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কথাটা বলেই হাতের দশসেরী গদাটা দিয়ে পাগলের মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে শূকরটার ঘাড়ে-মাথায় আঘাত করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এই ভাবে মি. সিম্পসনকে শাস্তি দেয়া হবে।

এক মিনিট ধরে চললো এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড! রাজার গলা থেকে গুম গুম একটা অদ্ভুত শব্দ বের হতে লাগলো প্রতিটি আঘাত করার সময়। আর অসহায় শূকরটার আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠলো যেন ভয়ে।

শূকরটাকে হত্যা করেই খেমটা নাচ শুরু করলেন রাজা হিরিরিরি। এমনিতেই তিনি অর্ধনগ্ন। নাচের ঠমকে এবার তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু কোনোই খেয়াল নেই তাঁর ঐ তুচ্ছ ব্যাপারে। নাচে পেয়েছে এখন তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ নাচার পর থামলেন রাজা। গাছের বাকলটা আবার কোমরে জড়িয়ে নিয়ে আঙুল বাড়িয়ে গফুরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর আবার তার চিৎকার শোনা গেল, 'কারাই বা কা, রাপুন রা।' অর্থাৎ 'ঐ লোকটাকে খেমটা নাচ নাচাও এক্ষুণি।'

দুজন জংলী গফুরকে ধরে রাজসভার মাঝখানে নিয়ে এলো। তারপর ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো কি করতে হবে। ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝতে পারলো গফুর। কিন্তু নাচবে কেন সে? ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে কামালের দিকে তাকিয়ে। ঠোঁট দুটো আধ ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেছে তার-কামালদার ব্যবহারে এতোই অবাক হয়েছে সে।

খোঁচাটা লাগলো পিছন দিক থেকে। ঠিক বাঁ পায়ের হাঁটুর পিছন দিকে। হাঁটু মুড়ে পড়েই যাচ্ছিলো গফুর। ধরে ফেললো একজন জংলী। পড়ে যাওয়া চলবে না। দাঁড়িয়ে থাকো। দাঁড়িয়ে থাকাও চলবে না আসলে-নাচো!

রাজার হুকুম-নাচো! ইঙ্গিতে আবার সে কথা বুঝিয়ে দেয়া হলো গফুরকে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে কামালের দিকে। কামাল অন্য একটা কাজে ব্যস্ত। রাজকন্যা 'মিল্‌তি রিবে'র মুখে মটরশুঁটি তুলে দিচ্ছে সে।

দুজন জংলী এগিয়ে এলো গফুরের দিকে এবার। তাদের দুজনেরই হাতে একটি করে গরম আগুনে শিঁক।

উপায় নেই কোনো। নাচতেই হবে। তা না হলে…গরম শিঁক দুটোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো গফুর। তারপর আর কাল বিলম্ব না করে নাচ শুরু করলো সে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর। দেহটার ওজন কম নয়। তার উপর কাঁধে দু'মণি ভাল্লুকটা চাপানো রয়েছে।

চোখ ফেটে জল এসে পড়লো গফুরের। অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো সে তার দাদামণি শহীদ খানের দিকে। শহীদ তখন ইঙ্গিত করে কি যেন বলছে মি. সিম্পসনকে। নাচতে নাচতে ডুকরে উঠলো গফুর—কামালদা, ভুলে গেলে আমাদেরকে!

এমন সময় রাজা হিরিরিরি-র দিকে তাকিয়ে তার পোষা বাঁদর তিনটি কিচ কিচ করে উঠলো। উপর দিকে তাকালেন রাজা। উপর দিকে তাকাতেই তিনটে বাঁদর বাঁদরামি করে একটি করে পা রাজসভার মাঝদিকে তুলে ধরলো। খিটখিটিয়ে হেসে ফেললেন রাজা হিরিরিরি। তারপর একজন অনুচরকে ডেকে কি যেন বললেন তিনি। জংলী অনুচরটি শহীদের কাছে এগিয়ে এলো ভারি পদক্ষেপে। তারপর ইঙ্গিত করে বোঝালো—একটি পা মাটিতে না রেখে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে। বিনাবাক্যব্যয়ে শহীদ মেনে নিলো সেটা।

শহীদের শাস্তির ব্যবস্থা সারা হতেই একজন মন্ত্রী কিচিরমিচির করে কি যেন বললো রাজা হিরিরিরি-র কানে কানে। বিদঘুটে হাসি ফুটলো রাজার মুখে। অনুচরেরা ছুটলো রাজার ইঙ্গিত পেয়ে। কাকাতুয়া পাখিগুলো নিয়ে এসে দাঁড়ালো তারা মি. সিম্পসনের কাছে। পাখির ডানার মতো হাত দুটো দুদিকে মেলে দিতে ইঙ্গিত করা হলো মি. সিম্পসনকে। নিরুপায় হয়ে শহীদের দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন। মাথা ঝাঁকালো শহীদ। অর্থাৎ যা করতে বলে ওরা আপাতত তাই করে যান।

হাত দুটো ডানার মতো মেলে দিতেই প্রতি হাতে ছ'টি করে কাকাতুয়াকে বসিয়ে দেয়া হলো। অমনি বিদঘুটে ডাক জুড়ে দিলো তারা। অবশ্যি মি. সিম্পসনের গাম্ভীর্য তাতে নষ্ট হলো না একবিন্দুও।

এদিকে গফুরের নাচ চলছে একনাগাড়ে।

চালাকি করে একবার ধপাস করে বসে পড়েছিল গফুর। ভাল্লুকটাকে ফেলে দিয়েছিল কাঁধ থেকে। কিন্তু তার এই ফাঁকিবাজির দরুন বর্শার খোঁচা খেতে হয়েছে তাকে আবার একটা। এখন তার দিকে একজন জংলী নজর রেখেছে বর্শা উঁচিয়ে। বসে পড়লে বা নাচে ঢিলেমি দেখলেই খোঁচা মারবে সে যেখানে সেখানে। সুতরাং ফাঁকি দেবার কথা এখন ভাবতে চাইছে না গফুর। এই দুর্ভোগ তার কপালের লিখন। সইতেই হবে যতক্ষণ প্রাণ আছে। এতকথা ভেবে ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বটে গফুর। কিন্তু দরদর করে চোখ দুটো থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে

তার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মাঝে মাঝে বলছে সে, 'কামালদা, তুমি একটা জংলী মেয়েকে পেয়ে ভুলে যেতে পারলে আমাদেরকে!'

তিনচার মিনিট পরই মি. সিম্পসনের হাত দুটো ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলো। পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সিনিয়র অফিসার মি. সিম্পসনের গাম্ভীর্য ভেঙে খান খান হয়ে গেল এবার। করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি কামালের দিকে। তারপর অতি দুঃখে জানতে চাইলেন চিৎকার করে, 'কি অপরাধ করেছিলাম আমরা তোমার কাছে, কামাল! আশ্চর্য, তোমাকে চিনতে পারিনি এতো দিনেও!'

কামাল শুনতেই পায়নি যেন মি. সিম্পসনের কণ্ঠস্বর। একটা হরিণের ঝলসানো রান তুলে নিলো সে নিজে। আর একটা দিলো রাজকুমারী মিলতি রিবকে। দুজনে চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে একই সঙ্গে কামড় বসালো মাংসে।

ট্রেনিং দেয়া কাকাতুয়া। মি. সিম্পসনের হাত দুটো ব্যথায় নড়েচড়ে উঠলেই কাকাতুয়াগুলো মি. সিম্পসনকে চক্কর মেরে ওড়ে একবার। তারপর ঠোকর মারে মি. সিম্পসনের মাথায়। আবার এসে বসে হাতে।

গফুরকেও মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে আসা হয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে নাচছে সে অসমান তালে। রাজসভার সকলে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে গফুরের ভুঁড়ির নাচন দেখে। সকলের দৃষ্টি এখন গফুর এবং মি. সিম্পসনের দিকেই নিবদ্ধ।

কতক্ষণ এই ভেলকিবাজী চলতো বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো রাজসভায়। সাত-আটজন জংলী একজন আর একজনের মাথার উপর চড়ে হুড়মুড় করে প্রবেশ করলো সেখানে। কে কার মাথার উপড় চড়ে আছে বোঝা মুশকিল। দুজনের দুজোড়া পা শূন্যে ঝুলছে দেখা গেল। মাঝখানের মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না। তার উপর সাত-আটজন জংলী ঝুলে আছে চিনেজোঁকের মতো। বিকট কণ্ঠে চিৎকার করছে তারা রাজার দিকে তাকিয়ে। অথচ অতগুলো মানুষের সচল পুঁটলিটা ছুটে চলে এলো মঞ্চের মাঝখানে। তারপরই অকস্মাৎ সবগুলো ঝুলন্ত জংলীই যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়লো চারপাশে। কেউ চিৎ হয়ে কেউ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়লো তারা। কাতরাতে লাগলো ব্যথা পেয়ে। এতোক্ষণে দেখা গেল মাঝখানের মানুষটিকে—কুয়াশা!

অনড় দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা জঞ্জালগুলোকে ফেলে দিয়ে। হাতে তার লেসারগানটা ধরা রয়েছে এখনও। অবয়বে ক্লান্তি এবং দুশ্চিন্তার পাণ্ডুর মেঘ।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালো কুয়াশা। রাজসভার সকলে বিশালদেহী এই মানুষটিকে দেখে থমকে গেছে। রাজা হিরিরিরি পর্যন্ত ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

শহীদকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসি ফুটলো কুয়াশার ঠোঁটে। মি. সিম্পসনকেও দেখতে পেলো সে। হাসলো। গফুর এই সুযোগে নাচে ক্ষান্ত দিয়েছে। ঘাড় থেকে ফেলে দিয়েছে সে ভালুকটাকে। কুয়াশা তার দিকে তাকিয়েও হাসলো। কিন্তু মহুয়া নেই তো! চঞ্চল দৃষ্টিতে উঁচু মঞ্চের দিকে তাকালো কুয়াশা। মহুয়া নয়,

কামালকে দেখতে পেলো সে রাজকীয় পরিবেশে। চোখ ফিরিয়ে নিলো কামাল কুয়াশা তার দিকে তাকাতেই।

ইঙ্গিতে কুয়াশা জানতে চাইলো শহীদের দিকে মুখ করে, মহুয়ার খবর জানো?

মাথা নেড়ে শহীদ ম্লান মুখে জানালো—না। ঠিক এমনি সময়ে ওদের সকলের দুশ্চিন্তার কারণ দূর হয়ে গেল। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো প্রধানমন্ত্রীর দুই স্ত্রী মহুয়াকে নিয়ে।

অপূর্ব একটি সুন্দরী রমণী দেখে জংলীরা বোবা হয়ে গেল যেন। কারো মুখে টুঁ-শব্দ নেই। বাচ্চারা পর্যন্ত ট্যাঁ-ফোঁ করতে ভুলে গেল। কিন্তু হিরিরিরি হলেন গিয়ে হাজার হাজার প্রজার রাজা! তিনি কখনো শত্রুপক্ষের রূপ-গুণ দেখে মোহিত হতে পারেন না। তার পক্ষে কর্তব্যই প্রধান ব্যাপার।

'কির কির হাপুস!'

চিৎকার করে উঠলেন তিনি। অমনি রুখে দাঁড়ালো প্রধানমন্ত্রীর দুজন স্ত্রী পরস্পরের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তিন হাত দূরে ছিলো ওরা পরস্পরের। পাগলিনীর মতো দু'হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়লো একজন অন্যজনের ঘাড়ে। শুরু হয়ে গেল চুল ছেঁড়াছিঁড়ি।

আধমিনিট পরই রাজার আদেশে বন্ধ হলো দুই সতীনের যুদ্ধ। রাজা হিরিরিরি মহুয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে কুৎসিত হাসিতে ভেঙে পড়লেন। অর্থাৎ মহুয়াকে এই ভাবে চুল ছেঁড়াছেঁড়ির লড়াই করতে হবে। সম্ভবত রাজার ধুমসী স্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধটা করতে হবে মহুয়াকে। দেখা গেল ভাঁটার মতো দুটো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহুয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে উঠে দাঁড়ালো সে।

কিন্তু রাজা তাকে বসার আদেশ দিয়ে সদ্যপ্রাপ্ত জামাতার দিকে তাকালেন। কুয়াশাকে দেখিয়ে কামালকে তিনি ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ঐ লোকটার শাস্তির ব্যবস্থা তুমি করো তো, বাপু!

সুযোগটা পেয়ে কৃতার্থের হাসি হাসলো কামাল রাজার দিকে ফিরে। মিল্তি রিবের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো সে। একে একে তাকিয়ে দেখলো সে একপেয়ে শহীদকে, ডানা মেলা মি. সিম্পসনকে, অর্ধ আবৃত ভুঁড়ি সমেত গফুরকে, অচঞ্চল কুয়াশাকে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত মহুয়াকে। তারপর ফিক ফিক করে হাসলো সে রাজকন্যা মিল্তি রিবের দিকে তাকিয়ে।

মিল্তি রিবের মুখেও মিটিমিটি হাসি। কামাল এবার তার সামনে রাখা খাদ্য-সম্ভারের দিকে তাকালো।

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন এই সময়, 'কামাল, কিছু একটা করো, ভাই! পারছি না যে আর!'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকালো কামাল মি. সিম্পসনের দিকে। আগুন ঝরছে যেন তার দৃষ্টিতে। জামাতার ক্রোধ তাদেরই মতো জোরালো দেখে তৃপ্ত হলেন রাজা হিরিরিরি। মন্ত্রীদের দিকে তাকালেন তিনি তাঁর ধারণার সমর্থন পাবার

জন্যে। মাথা নেড়ে একই সঙ্গে সায় দিলো সাতজন মন্ত্রী।

মি. সিম্পসনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঝুঁকে পড়লো কামাল পায়ের সামনে স্তূপীকৃত খাদ্য-সম্ভারের দিকে। একটা আপেল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো সে সেটা মি. সিম্পসনের দিকে। দু'হাত দিয়ে ধরে নিলেন সেটা মি. সিম্পসন। উড়ে গেল কাকাতুয়াগুলো ভয় পেয়ে। প্রচণ্ড খিদেয় মারা যাচ্ছিলেন যেন মি. সিম্পসন। আপেলটা ধরেই কামড় লাগালেন তিনি। ইতিমধ্যে আর একটি আপেল তাঁকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছে কামাল। অসতর্ক থাকায় সেটি এসে লাগলো মি. সিম্পসনের কপালে।

কোনদিকেই এখন খেয়াল নেই কামালের। সে যেন পাগল হয়ে গেছে অন্ধ ক্রোধে। একটি করে আপেল তুলছে সে ঝুঁকে পড়ে আর মুখে বলছে–খাও খাও! ধরো আরও খাও!

শহীদ, কুয়াশা এবং গফুরকেও ছুঁড়ে মারলো কামাল অনেকগুলো আপেল। কিন্তু মহুয়ার বেলায় আর আপেল হলো না। শেষ হয়ে গেছে সব আপেল। কিন্তু থামলো না কামাল। হরিণের ঝলসানো একটা রান তুলে নিলো সে। ছুঁড়ে মারলো সেটা মহুয়ার দিকে।

কামালের চিৎকার শুনে জংলীরা ভাবছে গালাগাল দিচ্ছে সে ধৃত শত্রু-গুলোকে। এবং খাবার ছুঁড়ে মারার অর্থ করলো তার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। জামাতার এসব যোগ্যতা দেখে রাজা হিরিরিরি তো খুশিতে আটখানা হয়ে পড়লেন। এমন সময় দু'হাত তুলে সকলকে চুপ করতে বললো কামাল। ফিসফাস করে রাজ-জামাতার প্রশংসা করছিল প্রজারা। আদেশ পেয়ে চুপ করলো তারা।

'উল্লু কা পাঠ্‌ঠা, শালার বেটা শালা, পেঁচামুখো বান্দর, শুয়োরখেকো হারামখোর...'

এতগুলো গাল দিয়ে দম নিয়ে নিলো কামাল। তারপর আবার শুরু করলো, 'শালার বেটা শালা হিরিরিরি-র বাচ্চা, তুমি হারামজাদা আমার নিজের লোক-গুলোকে এভাবে শাস্তি দেবার কে হলে শুনি?'

জামাতার মুখে নিজের নাম শুনে খুশিতে ডগমগ রাজা হিরিরিরি। সব কথা বুঝতে পারেনি সে। কিন্তু নিজের নাম শুনেই ধারণা করে নিয়েছে সে আসল ব্যাপার। জামাতা শত্রুদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে নিশ্চয় রাজা হিরিরিরি-র প্রভাব প্রতিপত্তি কতো ভীষণ। জামাতার গুণাবলী যতোই দেখেন ততোই মোহিত হতে থাকেন রাজা।

'জংলী কেউটে হিরিরিরি, জানিস কাকে কাকে ধরে এনেছে তোর পিচ্চিগুলো? শহীদ খান, হুঁ হুঁ বাবা, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ও। মি. সিম্পসনকে চিনিস তুই নেংটা ভূত? আর কুয়াশা! জানিস পচা-মগজে হিরিরিরি-র পো, কুয়াশা তোর কি করতে পারে? তুই শালা আমার মাথা চেঁছে বেল করেছিস কোন্ আক্কেলে?'

বক্তৃতায় পেয়েছে কামালকে। একনাগাড়ে বক্তৃতা দিলো সে রাজা হিরিরিরি এবং তার প্রজাদের উদ্দেশে। স্রেফ বিশুদ্ধ গালাগালি বের হলো তার মুখ থেকে।

এর মধ্যে কতো মাথা খাটিয়ে কতো যে নতুন নতুন গালাগালির জন্ম দিলো সে তা গুণে শেষ করা যায় না। এমনকি গফুরও লজ্জা পেলো তার কামালদার এমন অসাধারণ প্রতিভা দেখে।

ইতিমধ্যে কুয়াশার হাত থেকে লেসারগানটা কেড়ে নিয়েছে কামাল। বক্তৃতার সবশেষে সে বললো, 'আচ্ছা কুয়াশা, তোমাদেরকে আজকের মতো বাঁচিয়ে দিচ্ছি। আজ তোমাদেরকে জেলখানায় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো। তোমাদেরকে এদের হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় এই লেসারগান। এখন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বলে দাও।'

কুয়াশাকে এই সব কথা বলার সময়ও কামালের চোখ-মুখ যেন ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে। হিরিরিরি জামাতার বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা দেখে একটা কাণ্ড করে বসলো। তার মাথার বেঢপ টুপিটা খুলে পরিয়ে দিলো সে নিজ হাতে কামালের মাথায়। টুপিটার উপরটা বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে সমতল। দানা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে। কয়েকটা পায়রা দানা খুঁটতে উড়ে এলো কামালের মাথার টুপির উপরে।

হাসলো কামাল। রাজকন্যা মিলতি রিব এগিয়ে এলো এবার। হাতে তার রঙের পাত্র। পাখির পালক দিয়ে রঙ মাখিয়ে দিলো সে কামালের সারা মুখে। রঙ মাখানো হয়ে যেতে কামাল রঙের পাত্রটা নিয়ে রাজা হিরিরিরি এবং রাজকন্যা মিলতি রিব-এর মুখে রঙ মাখালো খুব করে। প্রজাদের মুখে হাসি আর ধরে না রাজ-জামাতার কাণ্ড দেখে। কামাল হাসিমুখে তাকালো তাদের দিকে। তাকিয়ে বললো, 'উল্লু কা পাঠ্ঠা!'

জংলীরা একবাক্যে বলে উঠলো, 'মিখা মিখা!' অর্থাৎ 'ধন্য! ধন্য!!'

আবার সে কুয়াশাকে বললো, 'কুয়াশা, লেসারগানটা ব্যবহার করার নিয়মটি কি?'

মুখ খুলেছিল কুয়াশা। কিন্তু পাঁচশো লোক এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। শত্রুদের কথা শুনতে আপত্তি তাদের। কামাল সকলের দিকে তাকালো। আবার একটা গাল দেবার জন্যেই মুখ খুলতে চাইছিল সে। কিন্তু তার আগেই...

'ও মাগো।' মহুয়ার ভীত কণ্ঠস্বর।

ধুমসী রানী এগিয়ে যাচ্ছে লড়াই করার জন্যে মহুয়ার দিকে। হেলতে দুলতে মত্ত-হস্তিনী এগোচ্ছে যেন।

রাজা হিরিরিরি-র এখন নিষ্ঠুরতা প্রমাণ দেবার সময়। ধুমসী রানীকে ইঙ্গিত করছেন তিনি মহুয়ার দিকে এগোতে।

বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারলো সঙ্গে সঙ্গে কামাল। এতো তাড়াতাড়ি এমন একটা কঠিন সমস্যায় পড়তে হবে তাকে তা সে ধারণা করেনি। দিশেহারা হয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে তার। ধুমসী রানীকে কোনমতে সুযোগটা দেয়া যায় না। মহুয়াকে ফেড়ে ফেলবে সে।

'হিরিরিরি!'

গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠলো কামাল। রাজা তাকালেন জামাতার দিকে। হাসলো কামাল। তারপর পা পা করে এগিয়ে গেল সে রাজার কাছে। কি করবে কি ভাববে বুঝতে পারছিল না কামাল। কিন্তু হাঁটতে গিয়েই তাল সামলানো দায় হয়ে পড়লো তার পক্ষে। মাথায় সাত সের ওজনের টুপিটার জন্যে টলমল করে উঠলো তার শরীরটা। অমনি একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। টুপিটা হিরিরিরি তার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন কেন? মনে পড়লো কামালের ঘটনাটা। রাজার প্রতীক এই বিরাটাকার টুপিটা। কুয়াশাকে শাস্তি দেবার জন্যে টুপিটা পরিয়ে দিয়েছিলেন রাজা তাকে।

চিৎকার করে ডেকে উঠেছিল কামাল রাজার নাম ধরে। সকলে তাকিয়ে আছে এখন তার দিকে। ধুমসী রানীও দাঁড়িয়ে পড়েছে। কামাল রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে টুপিটা দেখালো। ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না হিরিরিরি-র। কিন্তু কামালকে বোকা বানিয়ে টুপিটা খুলে নিয়ে পরে নিলেন হিরিরিরি নিজের মাথায়।

অকস্মাৎ প্রধানমন্ত্রী তার পকেট থেকে পোষা ইঁদুর দুটো বের করে খেলাতে লাগলো। তারপরই ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলো তার প্রথম স্ত্রী রাজসভায়। ইঁদুর দুটো নজরে পড়ছে তার। চুল ছেঁড়াছিঁড়ির লড়াই দেখতে খুবই ভালবাসে প্রধানমন্ত্রী। ইঁদুর দুটো পকেট থেকে বের করেছে সে তার স্ত্রীর দৃষ্টিতে পড়ার জন্যেই। এই ইঁদুর বের করার অর্থ হলো—যুদ্ধক্ষেত্রে নামো!

প্রধানমন্ত্রী আসলে চান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধুমসী রানীর সামনে বিদেশী ঐ মেয়েটা তো কেঁচো। তাই নিজের স্ত্রীকে ডাকলো সে। রাজা এতে অসন্তুষ্ট হবেন না। তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করেন। কামাল সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে নিজেকে। রাজাকে ইঙ্গিত করে কি যেন বোঝাচ্ছে সে। নানারকম চেষ্টা করে মনের কথাটা বোঝাতে চাইছে কামাল। মাথা নাড়ছেন হিরিরিরি। কিন্তু কি বুঝছেন তিনি কে জানে।

সব সন্দেহ একটু পরই দূর হলো কামালের। তার কথা ঠিক বুঝতে পেরেছেন রাজা। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারী হলো। কুয়াশা, শহীদ, গফুর এবং মহুয়াকে বাঁধা হলো দড়ি দিয়ে ভালো করে। তারপর তাদের সকলকে পুব দিকের একটি দরজা দিয়ে রাজ-সভা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কামাল। রাজাকে সে বুঝিয়েছে বিদেশী শত্রুগুলোকে সাজা দেবে সে নিজের হাতে। আগামীকাল সকালে কার্যকরী করবে সে ওদের শাস্তির ব্যবস্থা।

রাজা তাকালেন একজন অনুচরের দিকে। কি যেন ইঙ্গিত করলো সে রাজাকে। রাজা অন্যদিকে তাকালেন। রাজার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে তার সবগুলো স্ত্রী উঠে দাঁড়ালো কর্কশ চিৎকার করতে করতে। যুদ্ধ হবে রানীতে রানীতে।

ইতিমধ্যে ধুমসী রানী প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে চিৎ করে ফেলেছে। আকাশ ফাটিয়ে

চিৎকার করছে সে।

নয়

গভীর থমথমে রাত। পৃথিবীর সব শব্দ যেন দম আটকে মরে গেছে। ঘরের ভিতর মশাল জ্বলছে একটা। অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরলো কামাল বিছানায়।

মিলতি রিব ঘুমাচ্ছে। মিষ্টি একটা হাসি ফুটে রয়েছে তার মুখে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে রাজকন্যা।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো কামাল বিছানার উপর। খড়ের বালিশের তলা থেকে লেসারগানটা বের করলো সে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো মিলতি রিব। চমকে উঠে তাকালো কামাল। ধরা পড়ে গেল নাকি!

কামাল বুঝলো স্বপ্নের মধ্যে হাসছে মিলতি রিব। লেসারগানটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লো সে মাচা থেকে ঘরের মেঝেতে। তারপর নিঃশব্দ হাতে খুললো দরজাটা। ঠিক এমনি সময় বিকট একটা শব্দ হলো কাছাকাছি কোথাও থেকে। থমকে গেল কামাল। চিৎকারটা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই আরো দূরে একই ধরনের চিৎকার উঠলো একটা। বুঝলো কামাল ব্যাপারটা। পাহারাদারদের গলা ওগুলো। সাড়া নিচ্ছে পাহারাদাররা পরস্পরের।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো দরজা। কিন্তু কোনো উপায় নেই। ঘড়িতে বাজে দুটো দশ। ভোর হবার আগেই সকলকে উদ্ধার করতে হবে। কোথায় রেখেছে জংলীরা ওদেরকে তা জানে না কামাল। খুঁজে বের করতে হবে বন্দীশালাটা। সুতরাং ভয়ে ভয়ে দেরি করে ফেললে চলবে না। দরজাটা খুলে ফেললো কামাল সাহস করে। সে মনে করেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে বাইরেটা। তা নয়। চাঁদ উঠেছে আকাশে। পরিপূর্ণ উজ্জ্বল চাঁদ। চারদিক আলোকিত হয়ে আছে।

মাথাটা বের করে বাইরেটা দেখে নিলো কামাল। বাঁশের উঁচু দেয়াল চারপাশে। এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছে পাথরের তৈরি ঘর। আঁকাবাঁকা পথ অনেকগুলো। কেল্লার ঠিক মাঝখানটায় আছে সে এখন। আশপাশের ঘরগুলোতে রানীরা থাকে।

কোন্দিকে যাওয়া যায়! কয়েক সেকেণ্ড গভীরভাবে চিন্তা করলো কামাল। তারপর পরিচিত রাস্তাটা ধরেই এগোল সে নিঃশব্দ পায়ে। এই রাস্তা দিয়েই রাজকন্যা মিলতি রিব তাকে শোবার ঘরে এনেছিল। এই রাস্তা ধরে হাঁটলেই পৌঁছুনো যাবে রাজ-সভায়।

একটা বাঁক পেরোতেই একজন জংলী কামালকে দেখতে পেলো। অনড় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। পাথর যেন সে একটা। তাকে দেখে মানুষ বলে মনে করা সম্ভব হলো না কামালের। চাঁদের আলোর মাঝে ঘরের এবং দেয়ালের ছায়া পড়েছে খাপছাড়া ভাবে। মানুষ বলে চিনতে পারলো না কামাল

জংলীটাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকুও যেন হচ্ছিলো না জংলীটার। তিনহাত দূর দিয়ে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে লাগলো সে।

গম্ভীর থমথমে মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো জংলীটা কামালের গতিপথের দিকে। কি যেন চিন্তা করলো সে। তারপর সচল মর্মর মূর্তির মতো অনুসরণ করলো সে কামালকে।

মিনিট পাঁচেক লাগলো কামালের রাজসভায় গিয়ে পৌঁছুতে। ফাঁকা রাজসভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করলো কামাল শহীদদেরকে কোন্ দরজা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খুব বেশি অসুবিধে হলো না তার দরজাটা খুঁজে বের করতে। খুলে ফেললো কামাল অর্গল লাগানো দরজাটা। বেরিয়ে এলো সে একটা ফাঁকা উঠানে রাজসভা থেকে।

এবার কোন্‌দিকে যাওয়া উচিত? ভাবলো কামাল। সামনের দিকে একটা এবং দু'পাশে দুটো রাস্তা আছে টের পাওয়া যাচ্ছে। উঠানটা পেরিয়ে সামনের দিকে এগোল সে। এদিকে কামাল যখন উঠানটার মাঝ বরাবর এসেছে ঠিক তখন পাঁচজন পাহারাদার জংলী রাজসভার একটি দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। একজন ছিলো, এখন পাঁচজন হয়েছে ওরা। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি যেন পাহারাদার জংলীগুলো। দশসেরী একটা গদা, পিঠে তীর-ধনুক, হাতে ঢাল নিয়েও নিঃশব্দ পায়ে অনুসরণ করে চলছে ওরা কামালকে। সন্দেহে থমথম করছে ফোলা মুখগুলো। চোখে শ্যেনের দৃষ্টি। কিন্তু মুখে টুঁ-শব্দটিও নেই। এমনকি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দও হচ্ছে না।

উঠানটা পেরিয়ে একপাশের রাস্তাটার ভিতর পানে তাকালো সে। এই রাস্তা ধরেই এগোবে কিনা বুঝতে পারলো না কামাল। এদিকে ঘড়িতে বাজছে এখন দুটো পঁচিশ। ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। অথচ কোন্‌দিকে এগোলে শহীদদেরকে পাওয়া যাবে জানে না সে।

দেরি করে লাভ নেই, ভাবলো কামাল। সেই সামনের রাস্তাটা ধরেই দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে। কিন্তু পিছন দিকে তাকালো না ও।

সিধে চলে গেছে রাস্তাটা। বাঁশের দেয়াল শেষ হয়ে এলো একসময়। দমে গেল মনে মনে কামাল। কোথায় যাচ্ছে সে? কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আসলে এই রাস্তাটা?

বাঁশের দেয়াল শেষ হয়ে শুরু হলো পাথরের দেয়াল। মিনিটখানেক পাথরের দেয়ালের মাঝখান দিয়ে হেঁটে কয়েকটা ঘর পেলো কামাল। ঘরগুলো পাথরেরই। তবে দরজাগুলো মোটা বাঁশের। প্রত্যেকটি ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখলো কামাল। শহীদরা কেউ নেই কোনো ঘরে। এগুলো আসলে রাজ-পরিবারের মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘর। রাজা এবং পাহারাদার ব্যতীত অপর কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষেধ এদিকে।

মোট পনেরটা ঘর। সাবধানে বাঁশের ফাঁকে চোখ রেখে ঘরগুলো জরিপ

করলো কামাল। কিন্তু বৃথাই।

ঘরগুলোকে পিছনে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করলো কামাল। হঠাৎ তার মনে হলো রাস্তাটা সোজা নয় এখন আর। কখন থেকে কে জানে বেঁকে গেছে রাস্তা দক্ষিণ দিকে।

একি! বিশ্বাস হতে চাইলো না কামালের নিজের ব্যর্থতাকে। আবার ফিরে এসেছে সে রাজসভার কাছে। উঠানটায় রাস্তা মোট তিনটে। একটি রাস্তা ধরে গিয়ে দ্বিতীয় একটি রাস্তা দিয়ে ফিরে এসেছে একই জায়গায়। তাহলে? কামাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো এতক্ষণে। তৃতীয় রাস্তাটা দিয়ে এগোলে নির্ঘাৎ শহীদদের হদিস পাওয়া যাবে। এগিয়ে গেল কামাল তৃতীয় পথটির দিকে। চঞ্চল হয়ে পড়েছে সে। কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তাটা ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো কামাল।

বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ চমকে উঠলো কামাল। বাঁশের গায়ে বাঁশ পুঁতে দেয়াল করা হয়েছে দুদিকে। বিমূঢ় কামাল চাঁদের আলোয় দেখলো চার-পাঁচটি বাঁশ বাদ দিয়ে দিয়ে একটি একটি করে বাঁশের মাথায় বসানো রয়েছে নরমুণ্ড। আশ্চর্য না হয়ে পারলো না কামাল। এতগুলো নরকঙ্কাল পেলো কিভাবে জংলীরা! কতদিনের সংগ্রহ এগুলো?

রাস্তাটা প্রায় আধমাইল। দ্রুত হেঁটে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরের সামনে এসে দাঁড়ালো কামাল। মনটা ভেঙে গেল তার। তবে কি শহীদরা এদিকেও নেই? কোথায় তাহলে রাখতে পারে ওরা শহীদদেরকে?

বিশাল প্রান্তরের সামনে একা দাঁড়িয়ে আছে কামাল। চাঁদের আলো পড়েছে চতুর্দিকে। দু'একটা গাছের ছায়া পড়েছে প্রান্তরের এদিক-সেদিক। মায়াময় স্বপ্নিল পরিবেশ। কামাল যেন স্বপ্নের ঘোরে চলে এসেছে কল্পনার জগতে। চিন্তা করতে করতে চোখ দুটো এদিক-সেদিক ঘোরাচ্ছিল সে। এমন সময় অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়লো তার। জংলীদের পাহারাদারের ঘরগুলো ঐ রকম দেখতে? আশ্চর্য হয়ে ভাবলো কামাল। দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা বোতলের মতো জিনিস। ঘর নাকি ওগুলো? কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না।

কোনো কোনো দ্বীপে বটল-ট্রি বলে একধরনের গাছের কথা শুনেছে কামাল। তাতে পানি রাখা হয়। হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো কামাল। একটা কথা মনে পড়ে গেছে তার। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে একধরনের গাছ আছে জানে সে। পানি জমিয়ে রাখা হয় সেগুলোতে। আবার জেলখানা হিসেবেও সেগুলো ব্যবহার করার নজির আছে। গাছগুলোর ভিতরে ফাঁকা হয় নাকি-রে বাবা! ভাবলো কামাল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না সে। ছুট লাগালো জিনিসগুলো কি দেখার জন্যে।

বটল-ট্রি-ই জিনিসগুলো। কিন্তু এগুলো আরো অনেক বেশি উঁচু ও মোটা। ডালপালা আছে বটে দু'চারটে। কিন্তু পাতা নেই।

লালচে মাটিতে চাঁদের ম্লান আলো পড়েছে। ছাড়াছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে

বটল-ট্রিগুলো। দুটো বটল-ট্রি পাঁচ হাত দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কোনোটা একটি অন্যটির কাছ থেকে পনেরো-বিশ গজ দূরে দূরেও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলো কামালের কান। কে কাঁদে!

মিহি একটা নারীকণ্ঠ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে একটু উঁচু হচ্ছে গলার স্বরটা। কোথায়? কোথায়, কে কাঁদছে এই চন্দ্রালোকিত নির্জন প্রান্তরে? পায়ে পায়ে এদিক ওদিক হাঁটলো কামাল। কেউ নেই কোথাও। তবে কে কাঁদে এমন করে?

ঘুরছে কামাল বটল-ট্রিগুলোর চারপাশে। একটু দূরে গেলেই মনে হয় পিছনের দিক থেকে আসছে কান্নাটা। ফিরে আসতে আসতে থেমে যায় ফোঁপানিটা। ঘেমে নেয়ে উঠলো কামাল রহস্যটা বুঝতে না পেরে। থেমে গেছে আবার মিহি গলার কান্নাটা। পায়ে পায়ে একটা বটল-ট্রির দিকে এগোল সে।

কাছে এলো কামাল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো সে সন্দিগ্ধ মনে। চকচক করছে তার চোখ দুটো উত্তেজনায়। এমন সময় ঠিক পিছন থেকেই কান্নাটা শুরু হলো। চমকে উঠে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো কামাল। অতি কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছে এবার সে কান্নাটা। বটল-ট্রির মাথার উপর তাকালো কামাল। তিন মানুষ উঁচু হবে গাছটা। ডালপালা রয়েছে দু'চারটে। কেউ নেই গাছের উপর।

কাঁদছে মেয়েটা এখনও। হঠাৎ কি যেন ভাবলো কামাল। আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। কান পেতে আবার শুনলো সে কান্নাটা। এবার আর কিছু বুঝতে বাকি রইলো না তার। মহুয়া কাঁদছে। বন্দী করে রাখা হয়েছে তাকে বটল-ট্রির অভ্যন্তরে।

'কে!'

কামালের প্রশ্ন শুনে থেমে গেল কান্নাটা।

'আমি কামাল বলছি, মহুয়াদি, কোথায় তুমি?'

'ডান দিকে তাকাও কামাল। ডান দিকে একটা বটল-ট্রি দেখতে পাচ্ছো কি?'

কুয়াশার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো কামাল। চট করে ঘুরে তাকালো ডান দিকে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে একটি বটল-ট্রি সাত হাত দূরে।

'হ্যাঁ কুয়াশা, দেখতে পাচ্ছি গাছটা আমি।'

কুয়াশা গাছের ভিতর থেকে বললো, 'লেসারগানটা নিয়ে এসেছো তো কামাল?'

'নিশ্চয়।'

কুয়াশা বললো, 'লেসারগান ছাড়া আমাদেরকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে না এই কয়েদখানা থেকে। আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা গাছে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। দরজা বলে কিছু নেই, তবে ঠিক মাথার উপরে ফাঁক আছে একটা। তিন মন ওজনের পাথর চাপা আছে গর্ত-মুখটায়। একজনের কর্ম নয় পাথরটা সরানো। লেসারগান দিয়ে গাছের উপরের খানিকটা অংশ অদৃশ্য করে দিতে হবে। বুঝেছো?'

'বুঝেছি। কিন্তু লেসারগান চালাতে জানি না যে আমি।'

'বলে দিচ্ছি, কি করতে হবে। বন্দুকটার নলের মুখে একটা লাল বোতাম আছে, সেটা খুলে হাতে নাও। নল থেকে সাত ইঞ্চি দূরে একটা পেরেক মতো বেরিয়ে আছে, তার পাশেই আছে একটি ছোট্ট গর্ত। গর্তটায় ভালো করে বসিয়ে দাও লাল বোতামটা। তারপর নল এবং হাতলটা দু'হাতে ধরে চাপ দাও, ভাঁজ হয়ে যাবে ওটা। একটা স্প্রিং দেখতে পাবে। টানো ওটাকে...

কুয়াশা বলে গেল একের পর এক, কামাল যথাযথ অনুসরণ করলো তার নির্দেশ।

'এবার অতি সাবধানে গাছের মাথার উপর তাক করো লেসারগানের মুখটা। দেখো, নিচের দিকে যেন নেমে না আসে বন্দুকের নল। কোনো ভয় নেই। আমার মাথার উপর কিছু পড়বে না, তোমারও কোনো ভয় নেই। ট্রিগার টিপে দাও এবার।'

ট্রিগার টিপলো কামাল অতি সাবধানে। কেঁপে গিয়েছিল হাত। ফলে গাছটার অর্ধেকটাই পুড়ে গেল। পলকের ব্যাপার। অদৃশ্য হয়ে গেল গাছটার উপরের অংশটুকু।

'এবার আমি বেরিয়ে আসছি। অপেক্ষা করো।'

বেশ খানিকক্ষণ সময় লেগে গেল কুয়াশার গাছটার ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে। উপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো সে। কি যেন শক্তমতো জিনিসে বাঁ পা-টা পড়লো তার। ঝুঁকে পড়ে দেখলো কুয়াশা জিনিসটা। লেসারগান! লেসারগানটা এভাবে পড়ে রয়েছে কেন? কামাল গেল কোথায়? ভয়াবহ একটা সন্দেহ জাগলো কুয়াশার মনে। লেসারগানটা কি ঠিক মতো সামলাতে পারেনি কামাল? যার ফলে সে নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে...

দ্রুত লেসারগানটা ভাঁজ করে মিটারের কাঁটা দেখলো কুয়াশা। না, আশঙ্কাটা সত্যি নাও হতে পারে। মাত্র এক সেকেণ্ড চালু ছিলো যন্ত্রটা। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তেমন কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনা না ঘটাই উচিত।

চারদিকে তাকালো কুয়াশা ভ্রূ কুঁচকে। জঙ্গল দেখা যাচ্ছে একদিকে। এক দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজলো কুয়াশা সেদিকে তাকিয়ে। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ শুনতে পেলো জঙ্গলের দিক থেকে। ছুটলো কুয়াশা দূরের জঙ্গলের দিকে। কামাল হয়তো বন্দী হয়েছে জংলীদের হাতে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ুতে শুরু করলো কুয়াশা। জঙ্গলটা বেশ দূরে। চাঁদের আলোয় জঙ্গলের কালো রেখা দেখে বোঝা যায়নি দূরত্বটা। যাই হোক, বটল-ট্রি-টা পেরিয়ে গেল কুয়াশা। এরপরই জঙ্গলটা শুরু হয়েছে। দশ হাত ভিতরে প্রবেশ করতেই শেষ বটল-ট্রি-র আড়াল থেকে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। দৌড়ুতে পারা যাচ্ছে না। সরু রাস্তা। তাড়াহুড়ো করলে হারিয়ে যাবে পথটা। চাঁদের আলোও এখানে তেমন নির্বাধায় প্রবেশ করতে পারেনি। গাছের ডালপালার ফাঁক গলে টুকরো টুকরো আলো পড়েছে। সুবিধের

চেয়ে অসুবিধে বেশি তাতে। দৃষ্টিভ্রম ঘটবার সমুহ আশঙ্কা।

হাঁটছে তো হাঁটছেই কুয়াশা। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো তার মন। সন্তর্পণে পা ফেললো সে এবার। কেমন যেন একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। কিন্তু থামলে চলবে না। ঘড়িতে বাজে চারটে। সকাল হয়ে এলো প্রায়। আবার দ্রুত করলো কুয়াশা চলার গতি। পরক্ষণেই ধাক্কাটা খেলো সে। প্রচণ্ড শক্তিধর মানুষের ধাক্কা। পিছন থেকে আচমকা লাগলো ধাক্কাটা। তাল সামলাতে পারলো না কুয়াশা। পড়ে গেল ছ'হাত দূরে গিয়ে মাটির উপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে মাটির উপর দাঁড়ালো সে। একটি শন শন শব্দ কানে গিয়েছিল কুয়াশার। মাটির দিকে তাকালো সে। তারপরই তাকালো একটি ছায়ামূর্তির দিকে—শহীদ!

'কি ব্যাপার, শহীদ?'

'তোমাকে অনুসরণ করছিলাম আমি, কুয়াশা।' শহীদ বললো, 'চিনতে পারিনি তোমাকে। শেষে চিনতে পেরেছিলাম বলেই রক্ষা, তা না হলে বিপদ ঘটতো একটা। ঐ দেখো কি অদ্ভুত ফাঁদ পেতে রেখেছে জংলীরা।'

আগেই দেখেছে কুয়াশা, মাটির উপর সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে তিনটে তীর এসে বিঁধেছে। জংলীরা এদিকে কাউকে যেতে দিতে চায়। তাই এই ফাঁদের ব্যবস্থা। এর কথা না জানলে প্রাণ যাবে নির্ঘাৎ।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি শহীদ। কিন্তু তুমি কোথা থেকে এলে বলো দেখি?'

শহীদ প্রশ্ন করলো, 'লেসারগান তুমি ব্যবহার করোনি নাকি? আমি যে গাছের ভিতরে বন্দী ছিলাম তার কাণ্ডটা তো মারণরশ্মির সাহায্যে তুমিই উড়িয়ে দিয়েছো...'

'আমি না, কামাল। আসলে ও আমাকে উদ্ধার করার জন্যে লেসারগান ব্যবহার করেছিল। নল এঁকেবেঁকে গিয়েছিল বলে তার অজান্তেই ব্যাপারটা ঘটেছে।'

শহীদ বললো, 'কিন্তু তুমি অমন ব্যস্ত হয়ে চলেছো কোথায়? কামালকেই বা রেখে এলে কোন্‌দিকে।'

তাড়াতাড়ি কি যেন ভাবলো কুয়াশা। তারপর বললো, 'সময় খুব বেশি হাতে নেই, শহীদ। কামালকে ধরে নিয়ে এসেছে জংলীরা এদিকে। আচ্ছা তুমি জানো মি. সিম্পসন আর গফুরকে কোন্ কোন্ গাছে বন্দী করে রাখা হয়েছে?'

'জানি।'

'তবে চলো, ওদেরকে আগে উদ্ধার করি। মহুয়া কোন্ গাছে বন্দী তা আমি জানি।'

শহীদ আশ্চর্য হয়ে বললো, 'কিন্তু কামালের কি হবে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করবো। এখন বেশিরভাগ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া দরকার। এসো ছুট লাগাও আমার সঙ্গে।'

ফিরে এলো আবার ওরা আগের জায়গায়। মহুয়াকে উদ্ধার করা হলো প্রথমে।

শহীদ গাছের উপরে উঠে মহুয়াকে নামিয়ে নিয়ে এলো। গফুর এবং মি. সিম্পসনকেও উদ্ধার করা হলো। দু'মিনিট পরপরই হাত ঘড়ি দেখছে কুয়াশা। চারটে বেজে পনেরো।

সকলে একত্রিত হলে কুয়াশা বললো, 'উত্তর দিকে চলে যাও তোমরা, শহীদ। সকলেই যাও শহীদের সঙ্গে। উত্তর দিকে গেলেই সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে পারবে তোমরা।'

'কামালদা কই?' গফুর বললো।

মহুয়া বললো, 'সত্যি তো!'

কুয়াশা বললো, 'কামালের জন্যেই তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না আমি। জংলীরা ধরে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু তাই বলে তোমাদেরকে নিরাপদে দূরে সরিয়ে না দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছি না আমি। উত্তর দিক ধরে সাবধানে চলে যাও তোমরা। দিকটা ভালো করে খেয়াল রেখো, শহীদ।'

'কিন্তু উত্তর দিকে গেলেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে কি করে?' জানতে চাইলো শহীদ।

মি. সিম্পসন বললেন, 'তারচেয়ে সকলে একসঙ্গে কামালকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা যাক। আমাদের সঙ্গে তো লেসারগান আছে, ভয় কি।'

'না, তা হয় না।'

কুয়াশা বললো, 'শোনো শহীদ, উত্তর দিক ঠিক রেখে যদি এগোতে পারো তোমরা তবে সমুদ্রতীরে ঠিক জায়গা মতো পৌঁছুবেই পৌঁছুবে। অনেক হিসেব-নিকেশ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমি।'

শহীদ বললো, 'সমুদ্রতীরে না হয় পৌঁছুলাম, কিন্তু তাতে লাভ কি? আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে আমাদের সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে?'

'ঘন্টাখানেকের কম নয়।'

শহীদ বললো, 'ততক্ষণ নিঃসন্দেহে সকাল হয়ে যাবে। জংলীরা যখন দেখবে যে কয়েদখানা থেকে পালিয়েছি আমরা তখন তো তারা সবচেয়ে আগে সমুদ্রের দিকেই ছুটবে দল বেঁধে!'

'তা ঠিক।'

মেনে নিলো কুয়াশা শহীদের কথা। তারপর বললো, 'কিন্তু সমুদ্রতীরে তোমরা একবার পৌঁছুতে পারলেই হলো। জংলীরা তারপর গিয়ে তোমাদের চুলও স্পর্শ করতে পারবে না।'

বাধা দিয়ে শহীদ বললো, 'কিভাবে?'

মি. সিম্পসন কঠিন সমস্যায় পড়েও কুয়াশাকে মৃদু ঠাট্টা করতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, 'তার আগেই বুঝি আমরা সমুদ্রের জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবো? এই কথাই তুমি বলতে চাইছো তো, কুয়াশা?'

কুয়াশা বললো, 'আত্মহত্যা নয়, আত্মরক্ষা করবেন আপনারা প্রত্যেকে। সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে একটা মিরাক্‌ল্‌। সৈনিক নোঙর করা

আছে উত্তর দিকের সমুদ্রতীরে।'

মিটিমিটি হাসতে লাগলো কুয়াশা কথাটা বলে। সকলে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকালো কুয়াশার দিকে। কিন্তু শহীদ কি যেন ভাবছিল কুয়াশার কথা শুনে। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে মৃদু হেসে সে বললো, 'ও বুঝেছি! অলরাইট, চললাম আমরা, কুয়াশা।'

'কি ছাই বুঝেছো হে তুমি? খুলে বলো না একটু রহস্যটা।' মি. সিম্পসন শহীদকে প্রশ্ন করলেন।

শহীদ বললো, 'লৌহমানব দুটোর কথা ভুলে গেছেন নাকি আপনি, মি. সিম্পসন?'

'না, ভুলবো কেন?'

'লৌহমানবের শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণের প্রয়োজন নেই তা আপনি জানেন তো?'

'জানি।'

শহীদ বললো, 'এরপরও বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা? আসলে লৌহমানব দুটোকে কুয়াশা ডুবন্ত সৈনিকে রেখে এসেছিল। এবং তারা সৈনিককে মেরামত করে, পাম্পের সাহায্যে পানি বের করে আবার চালু করে ফেলেছে। বুঝলেন?'

'শুধু তাই নয়, এখন সৈনিকের গতিও বেড়ে গিয়ে হয়েছে ঘন্টায় আশি মাইল।'

কথা সরলো না মি. সিম্পসনের মুখে। জংলীদের এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন তিনি। মুক্তি অবশ্য এখনো পায়নি তারা। কিন্তু সত্যিই একটা আশা পেলেন তিনি। কুয়াশার প্রতি আবার সেই অনুভূতিটা সৃষ্টি হলো নতুন করে তাঁর মনে—কি ভয়ঙ্কর বুদ্ধি এই সৃষ্টিধর্মী মানুষটার। মনে মনে বললেন তিনি—যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তার নাম কুয়াশা!

শহীদ বললো, 'তুমি একাই যাবে, কুয়াশা, কামালের জন্যে? আমিও সঙ্গে গেলে ভালো হতো না?'

'তোমাকে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দিচ্ছি আমি, শহীদ। কামালকে উদ্ধার আমি করবোই। যেমন করে হোক। কিন্তু তোমাকে রক্ষা করতে হবে এদের সকলকে।'

চুপ করে রইলো শহীদ। কুয়াশা বললো, 'যাও শহীদ, সময় ফুরিয়ে আসছে। আশা করি ভালভাবে পৌছুবে তোমরা। চলি, দেখা হবে শিগগিরই।'

মহুয়া করুণ কণ্ঠে ডাকলো, 'দাদা!'

মৃদু হেসে তাকালো কুয়াশা, 'কি রে?'

ভাই-বোনের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার অমর দৃশ্য অভিনীত হতে চলেছে চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ প্রান্তরে।

মহুয়া পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো কুয়াশার সামনে।

'দাদা!'

'কিছু বলবি?'

মহুয়া কুয়াশার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের সঙ্গেই দেশে ফিরবে তো তুমি?'

শব্দ করে স্নেহের হাসি হাসলো কুয়াশা। বললো, 'দেশে ফেরার কথা তুই এখন কেন ভাবছিস, মহুয়া। তুই কি ভুলে গেলি বোন বৈজ্ঞানিক Kotze-এর কথা? ভদ্রলোককে বিপদ থেকে মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হয়েছি না আমরা?'

মাথা নেড়ে মহুয়া সমর্থন জানালো। তারপর বললো, 'যাই হোক, তবু তুমি কথা দাও যে আমাদের সঙ্গেই দেশে ফিরবে। তা সে যেদিনই ফিরি আমরা।'

কুয়াশা মহুয়ার মাথায় হাত রাখলো একটা। বললো, 'কেন মহুয়া, তোর কি মনে মনে কোনো ভয় জাগছে?'

'না, দাদা!'

'তবে?'

চুপ করে রইলো মহুয়া।

'তোর কি মনে হয়, মহুয়া? আমি তোদের সঙ্গে দেশে ফিরতে পারবো না?'

গলা শুকিয়ে গেল মহুয়ার। কি বলবে ভেবে পেলো না সে। দাদার কথা ভাবতে গেলেই ভয় জাগে তার। মনে হয় তার দাদা বুঝি কোনো একটা বিপদে পড়বে, আর মুক্তি পাবে না কোনদিন সে বিপদ থেকে।

'বল, মহুয়া। দেরি করিয়ে দিসনে আমাকে, বোন।'

'আমার কি মনে হয়...' দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না মহুয়া।

'হ্যাঁ।'

'আমার কিছু মনে হয় না। আমার মনে হয়...মনে হয়, তুমি আমাদের সঙ্গেই দেশে ফিরবে।'

কুয়াশা বললো, 'তবে আর কি! দেখিস, তোর কথাই সত্যি হবে। আমি তোদের সকলের সঙ্গে সুস্থ অবস্থাতেই দেশে ফিরবো।'

মহুয়ার মাথা থেকে ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নিলো কুয়াশা। একটু সরে দাঁড়ালো মহুয়া। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে। শান্ত গলায় বললো, 'তোমরা যাও, আমিও চলি।'

তারপর আর দেরি না করে চন্দ্রালোকিত প্রান্তর ধরে কুয়াশার বিশাল মূর্তিটা দ্রুত এগোতে লাগলো। শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে ঘুরে দাঁড়ালো মহুয়া। সকলের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো সে উত্তর দিকে। শহীদ একটা হাত ধরে রেখেছে তার। চতুর্থবার পিছন ফিরে তাকালো মহুয়া। দেখলো কুয়াশার বিশাল মূর্তি ছুটতে ছুটতে হারিয়ে গেল একটা গাছের আড়ালে

জঙ্গলে প্রবেশ করছে আবার কুয়াশা।

কুয়াশা ১৫

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ১৯৬৮

এক

গাছের ছায়া এবং চাঁদের আলোর উপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে জঙ্গলটা অতিক্রম করলো কুয়াশা। আধঘণ্টা হয়ে গেছে শহীদদেরকে ছেড়ে এসেছে সে। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছে ওরা সম্ভবত। 'সৈনিকে' গিয়ে পৌঁছুতে আরও আধঘন্টা লাগবে ওদের। নিরাপদে 'সৈনিকে' পৌঁছুবে তো ওরা?

বিদায় বেলার দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না কুয়াশা। এই পৃথিবীতে তার একমাত্র আপনজন মহুয়া। মহুয়াকে কথা দিয়েছে সে। কথা দিয়েছে একই সঙ্গে দেশে ফিরবে তারা। সম্ভব হবে কি তা?

দ্রুত করলো কুয়াশা চলার গতি। কামালকে উদ্ধার করতে হবে। জংলীরা তার বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়ে গেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় কে জানে বন্দী করে রেখেছে তাকে। প্রত্যেকের জীবন নির্ভর করছে এখন আমার উপর, ভাবলো কুয়াশা। গুরুদায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছে সে নিজের কাঁধে। কামালকে সময়মতো উদ্ধার করতে না পারলে জংলীদের হাতে প্রাণ যাবে তার। এদিকে কামালকে খুঁজে বের করতে দেরি করে ফেললে শহীদরাও ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে। তাদের পালাবার খবর এতক্ষণে জানতে বাকি নেই জংলীদের। খবর ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপের সর্বত্র। হিংস্র অসভ্যরা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ওদের। 'সৈনিকের' খবর জানতে পারলে দলে দলে ছুটবে ওরা। কিছুই করার থাকবে না শহীদের। মৃত্যু অবধারিত।

বৈজ্ঞানিক Kotzeকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলো ওরা দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। পথিমধ্যে জাহাজডুবি হলো। প্রত্যেকেই জংলীদের দ্বীপে এসে ভিড়লো বিচ্ছিন্নভাবে। দেখা হলো সকলের সঙ্গে জংলীরাজ হিরিরিরি-র রাজসভায়। সকলকেই উদ্ধার করা হলো। কিন্তু কামাল বন্দী হয়েছে। উদ্ধার করতে হবে ওকে। মরিয়া হয়ে কামালের খোঁজে দলছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে কুয়াশা।

আরে! এ যে পাহাড়ের সারি! আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা। কামালকে কি তবে জংলীরা এদিকে ধরে আনেনি? কিন্তু ধস্তাধস্তির শব্দ তো এদিক থেকেই শুনতে পেয়েছিল সে। তবে কি রাস্তা ভুল করলো!

পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো কুয়াশার দৃষ্টি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে চেষ্টা করলো সে কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে কি না।

সুড়ঙ্গের গোল মুখটা যেন গিলতে আসছে। দরজা তো নেই-ই, পাথরের ঢাকনিও দেখা যাচ্ছে না। জংলীদের তৈরি এটা, ভাবলো কুয়াশা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে পাথরের গা। বিরাট আকার নিয়ে শূন্য পড়ে আছে সুড়ঙ্গটা। পনেরো বিশজন লোক একসঙ্গে ঢুকতে পারবে অনায়াসে। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এ সুড়ঙ্গ?

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো কুয়াশা। সতর্ক হয়ে পায়ে পায়ে এগোলো সে এবার। দশ হাত দূরে হবে সুড়ঙ্গটার মুখ। আরও দু'পা এগোলো কুয়াশা। একি!

হঠাৎ অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করলো কুয়াশা। টানছে তাকে! কি ব্যাপার, কে তাকে সামনের দিকে এমন ভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? দাঁড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করলো কুয়াশা। পারলো না। তার শরীরটাকে কোনো একটা অদৃশ্য শক্তি জোর করে সামনে টেনে নিচ্ছে। দাঁড়াতে পারছে না কুয়াশা। বিহ্বল হয়ে পড়লো সে। এর মানে কি! এগোতে চাইছে না সে আর একপাও। কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না এক জায়গায়।

তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ক্রমেই আকর্ষণটা। যতোই সামনে পা ফেলতে বাধ্য হচ্ছে কুয়াশা ততোই বাড়ছে টানটা।

এগোতে এগোতে সুড়ঙ্গটার ভিতরে প্রবেশ করলো কুয়াশা। সামনের দিকে আকর্ষণটা এখন আর অনুভব করছে না সে। কিন্তু শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তার পক্ষে। নিচের দিকে টেনে বসিয়ে দিতে চাইছে এখন অজ্ঞাত শক্তিটা। অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে থাকছে কুয়াশা। কি যেন চিন্তা করছে সে। এমন সময় লেসারগান ধরা ডান হাতটা ব্যথা করে উঠলো তার। এতক্ষণে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো। লেসারগানটাই আসলে নিচের দিকে নেমে যেতে চাইছে হাত থেকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কুয়াশার মুখ। পাথরের সুড়ঙ্গ নয় এটা, ম্যাগনেট হোলের পাল্লায় পড়েছে সে।

ম্যাগনেট, অর্থাৎ চুম্বক। আশ্চর্য হলো কুয়াশা। জংলীরাজ হিরিরিরি-র মাথা তো কম নয়। সে এই কৌশল জানলো কিভাবে? পাহাড়ী দ্বীপে না হয় চুম্বক পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে এ রকম ফাঁদ তৈরি করা তো যার তার কর্ম নয়।

লেসারগানটা ফেলে দিলেই অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে কুয়াশা এই ম্যাগনেট হোল থেকে। কিন্তু লেসারগানটাই এখন সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন। কি করা যায়?

খুব একটা কঠিন মনে হলো না সমস্যাটা কুয়াশার কাছে। লেসারগান দিয়ে সামনের দিকটা প্রথমে অদৃশ্য করে দিলো সে। লোহা গলে পানি হয়ে গেল এক নিমেষে। মিনিটখানেক লাগলো তার ম্যাগনেট হোল থেকে মুক্তি পেতে। সামনে এগোলো। গরম এবং পোড়া মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে কোনো অসুবিধেই হলো না তার।

দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো আবার কুয়াশা। কিছুক্ষণ পরেই দুপাশে বাঁশের দেয়াল দেয়া একটা রাস্তা দেখতে পেলো সে।

রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর রাস্তাটার তিনটে মোড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। কোন্‌দিকে যাওয়া যায় ভেবে পেলো না। এমন সময় শব্দটা কানে ঢুকলো তার। কয়েকজন জংলী উত্তেজিত স্বরে কথা কাটাকাটি করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

দমে গেল কুয়াশা। তিন দিকের রাস্তাই সোজা চলে গেছে সরলরেখার মতো। দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলে জংলীরা শব্দ শুনে টের পেয়ে যাবে। কিংবা নিঃশব্দে কোনো একটা রাস্তা ধরে পিছিয়ে গেলেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় না। দৃষ্টি একবার সেদিকে পড়লেই দেখে ফেলবে ওরা। যে রাস্তাটা দিয়ে লোকগুলো আসছে সেটাই শুধু আঁকাবাঁকা। একটা মোড় দেখা যাচ্ছে দশ হাত দূরে রাস্তাটির। লোকগুলো এখনও মোড়ের কাছে এসে পড়েনি বলেই রক্ষে, মোড়টা ঘুরলেই দেখতে পাবে জংলীগুলো কুয়াশাকে।

বাঁশের দেয়ালের উপরে তাকালো কুয়াশা। তিন মানুষ সমান উঁচু হবে দু'পাশের দেয়াল দুটো। লেসারগানটা শক্ত করে ধরে একদিকের দেয়ালের সামনা-সামনি হলো কুয়াশা। এসে পড়েছে প্রায় জংলীরা। আর দেরি করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করলো সে বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে। তরতর করে উঠে পড়লো কুয়াশা অর্ধেকটা। এমন সময় মোড়টা ঘুরে বেরিয়ে এলো কয়েকজন জংলী। অনড় রইলো কুয়াশা ঝুলন্ত অবস্থায়। এখন নড়াচড়া করলেই জংলীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে।

লোকগুলোকে দেখলো কুয়াশা। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পেরিয়ে গেল ওরা। উপর দিকে তাকালো না। কোনো সন্দেহ জাগেনি তাদের মনে। লোকগুলো হাত পঁচিশ এগোবার পরই নেমে পড়লো কুয়াশা। অনুসরণ করতে হবে লোকগুলোকে। কুয়াশা স্পস্ট দেখছে চাঁদের আলোয় খোদ রাজা হিরিরিরি এবং রাজকন্যা মিলতি রিব ও সাতজন মন্ত্রীকে। সংখ্যায় ওরা মোট ন'জন। কুয়াশার কোনো সন্দেহ রইলো না যে ওরা কামাল সংক্রান্ত খবর পেয়েই অমন উত্তেজিত ভাবে ছুটে যাচ্ছে।

পিছন পিছন নিঃশব্দ পায়ে সামান্য কিছুক্ষণ হাঁটতে হলো কুয়াশাকে। সব পরিশ্রমের ফল পেয়ে গেল সে। রাজা দলবল নিয়েই হঠাৎ একটা লোহার রেলিং দেয়া ঘরের পিছন দিকে থমকে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা দূর থেকে বুঝতে পারলো না কুয়াশা। অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলো সে দেয়ালের ছায়ায়। কিছুক্ষণ ধরে একটা ঝড় বইলো রাজা হিরিরিরি-র কণ্ঠ থেকে। আর কারও কথা শুনতে পেলো না কুয়াশা। অকস্মাৎ চমকে উঠলো সে। রাজা হিরিরিরি একটা গদা চেয়ে নিলেন একজন মন্ত্রীর হাত থেকে। তারপর কি যেন বললেন একবার চিৎকার করে। কোনো প্রত্যুত্তর শোনা গেল না। তারপর ঝট করে ঘুরে ঘরটার সামনে থেকে সরে

গিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি দুপদাপ পায়ের শব্দ করে। দলবলও পিছু নিলো তাঁর।

দ্রুত পদক্ষেপে লোহার রেলিং দেয়া ঘরটার কাছে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। কামালকে বসে থাকতে দেখতে পেলো সে। কুয়াশাকে দেখে রেলিংয়ের সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালো কামাল।

'এসেছো!'

'সরে যাও কামাল এককোণে। মারণরশ্মি ব্যবহার না করলে হাত দিয়ে এতো মোটা রড বাঁকানো যাবে না।'

সরে গেল কামাল একদিকে।

রাজা হিরিরিরি এবং তার দলবল হিংস্র হয়ে উঠেছে। কামালের বিশ্বাসঘাতকতার সাজা দেবেন রাজা হিরিরিরি এখুনি। ঘরের সামনের দিকে পৌঁছুবার জন্যে রওনা হয়ে গেছেন তিনি। ঘরের একমাত্র দরজাটা ঐ দিকেই।

বন্দী দশা থেকে বের করে কামালকে বাইরে নিয়ে এলো কুয়াশা। তারপর এক তিল সময়ও নষ্ট না করে ছুটতে লাগলো।

পরিচিত রাস্তা। ছুটছে ওরা দু'জন। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়েছে জংলীদের মধ্যে। বিশ্বাসঘাতক জামাতা ভেগেছে কয়েদখানা থেকে। হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে তারা। রামশিঙা ফোঁকার শব্দ আসছে কানে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে জংলীরা ঢাল, গদা, তীর-ধনুক এবং বর্শা নিয়ে।

কুয়াশা ভেবেছিল জংলীরা কামালকে না পেয়ে প্রথমে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করবে। তারপর হয়তো ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে জংলীরা দ্রুত। ক্রমেই উচ্চকিত হয়ে উঠছে হিংস্র চিৎকার। কিভাবে কে জানে বুঝতে পেরেছে ওরা কোন্‌দিকে ছুটলে দেখা পাওয়া যাবে শত্রুর।

বাঁশের রাস্তা ছাড়িয়ে এলো ওরা। আরো কিছুক্ষণ দৌড়ুবার পর জঙ্গলে প্রবেশ করলো। এদিকে অন্যদিক থেকেও জংলীরা ছুটে আসছে পিছন পিছন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা। বাধ্য হয়ে কামালকেও দাঁড়াতে হলো।

'জংলীরা এসে পড়েছে, কুয়াশা!'

উত্তর দিলো না কুয়াশা। পাশের কয়েকটি গাছ মারণরশ্মির সাহায্যে রাস্তার উপর শুইয়ে দিলো। তারপর কামালের হাত ধরে সরে দাঁড়ালো একপাশে। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে এসে পড়লো জংলীদের প্রথম দলটা। থমকে দাঁড়ালো তারা রাস্তার উপর প্রকাণ্ড কয়েকটা গাছকে শোয়ানো দেখে। কি কথা হলো ওদের মধ্যে কে জানে। অন্য একটা রাস্তা ধরে পুব দিকে চলে গেল ওরা দলে দলে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে। চিৎকার শুনে মনে হলো, কোথায় যেন জ্বলে-পুড়ে খাক

হয়ে যাচ্ছে ওদের।

দ্বিতীয় দলটিও মিনিটখানেক পর এসে পড়লো। তারাও কি মনে করে চলে গেল পুব দিকে।

'চলো এবার।' কামালকে কথাটা বলেই ছুটতে শুরু করলো কুয়াশা। বিশ মিনিট ধরে এক নাগাড়ে ছোটবার পর সেই বটল ট্রিগুলোর কাছে এসে পড়লো ওরা দুজন। থামলো না সেখানে। শহীদরা যেদিকে গেছে সেদিকেই ছুটে চললো প্রাণপণে। কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলো ওরা হাজার হাজার জংলীর উন্মত্ত চিৎকার। পিছন থেকে নয়। এবার শোরগোলটা আসছে সামনের দিক থেকে। শহীদদের খোঁজ পেয়ে গেছে জংলীরা। ছুটে যাচ্ছে দলে দলে। শহীদরা কি পৌঁছুতে পেরেছে 'সৈনিকে'?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কুয়াশা।

'কি ব্যাপার,' ব্যস্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো কামাল।

'ঐ বড় গাছটায় ওঠো, কামাল, জলদি! শহীদরা "সৈনিকে" গিয়ে পৌঁছেছে কিনা জানতে হবে।'

কথা বললো না কামাল। তরতর করে উঠে পড়লো সে কুয়াশার নির্দেশিত গাছটার মগডালে।

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! ওরা সবাই উঠে পড়েছে "সৈনিকে"। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কিন্তু···কিন্তু কুয়াশা, জংলীরা যে ঘিরে ফেলেছে "সৈনিককে"! ছোট ছোট নৌকোয় ছেয়ে গেছে সৈনিকের চারপাশ!'

চিৎকার করে কথা কটি বললো কামাল দূরের দিকে তাকিয়ে।

'জলদি নামো, কামাল। দেরি করো না। জলদি! জলদি!'

নামতে শুরু করলো কামাল। শহীদদের কথা ভেবে পেটের ভিতর হাত-পা গুটিয়ে যেতে চাইছে তার। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে। সকাল বেলার শীতল বাতাসেও ঘামছে সে। শেষ পর্যন্ত ওরা কি জংলীদের হাতেই নিজেদেরকে সঁপে দেবে?

অধৈর্য হয়ে উঠেছে কুয়াশা। বার বার তাড়া দিচ্ছে সে কামালকে তাড়াহুড়ো করে গাছ থেকে নামার জন্যে। কিন্তু যতো তাড়াতাড়ি গাছে চড়েছিল কামাল ততো তাড়াতাড়ি নামতে পারছে না। শহীদদের ভাগ্যে কি ঘটবে বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে।

গাছের অর্ধেকটা নেমেছে মাত্র কামাল। চিৎকার করে কুয়াশা বললো, 'লাফ দাও, কামাল! ধরে নেবো ঠিক আমি।'

চমকে তাকালো কামাল মুহূর্তের জন্যে কুয়াশার দিকে। তারপরই পনেরো-বিশহাত উপর থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে কুয়াশাকে লক্ষ্য করে।

কোলের উপর লুফে নিলো কুয়াশা কামালকে। মাটিতে নামিয়ে দিলো সে

তাকে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দিক পরিবর্তন করে ছুটলো সে দক্ষিণ পূর্ব দিকে। মুখে শুধু বললো, 'দৌড়োও আমার সাথে!'

অবাক হলো কামাল। কুয়াশা কি ভয় পেয়ে পালাতে চাইছে? দৌড়ুতে দৌড়ুতেই বললো সে, 'কিন্তু এ আমরা কোন্‌দিকে ছুটছি কুয়াশা? শহীদরা তো উত্তর দিকে রয়েছে। আমরা যাচ্ছি উল্টোদিকে!'

কুয়াশা না থেমেই বললো, 'হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকেই পালাতে হবে আমাদেরকে।'

'কিন্তু, কেন! শহীদদেরকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে চাইছো নাকি তুমি?'

ছুটতে ছুটতে মুখ টিপে হাসলো কুয়াশা। মুখে বললো, 'আপনি বাঁচো তো বাপের নাম। নিজেদেরকে রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব। সেটাই করি এসো।'

কুয়াশার পরিষ্কার কথা শুনেও অর্থ উদ্ধার করতে পারলো না কামাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছুটতে লাগলো সে কুয়াশার পাশাপাশি। বিশ্বাস করে সে কুয়াশাকে। চেনে।

মিনিট দশেক লাগলো ওদের দক্ষিণ দিকের সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছুতে। কামালকে হতভম্ব করে দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুয়াশা। ডুব সাঁতার দিয়ে দশ হাত দূরের একটা পাথরের সামনে গিয়ে মাথা তুললো সে। পাথরটার গায়ে রাখা ছিলো কুয়াশার অ্যাটাচি কেসটা। এই দ্বীপে এসে ওঠার আগেই সে ঐ পাথরটায় যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিল তার অ্যাটাচি কেসটা।

এক হাতে যন্ত্রপাতি সমেত ভারি অ্যাটাচি কেসটা উঁচিয়ে ধরে রেখে তীরে ফিরে এলো কুয়াশা। দ্রুত হাতে খুলে ফেললো সে অ্যাটাচি কেস। টেলিভিশনের সুইচ টিপে দেবার আগে খট্ খট্ করে কয়েকটা সুইচ টিপলো সে। তারপর টেলিভিশনের পর্দায় ছবি ফুটে ওঠার অপেক্ষায় একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

দুই

পিছনে তাড়া করে ছুটে আসছে জংলীরা।

শহীদ, মি. সিম্পসন, মহুয়া ও গফুর প্রাণপণে দৌড়ুতে দৌড়ুতে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছুলো। খুব বেশি পিছনে নেই জংলীর দল। কিন্তু শহীদরাও সৈনিকের কাছে পৌঁছে গেছে। এতটুকু দ্বিধা না করে সর্বপ্রথম পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন। গফুর তাঁর দেখাদেখি ঝাঁপ দিলো। শহীদ মহুয়ার হাত ধরে নামলো পানিতে।

শহীদ ও মহুয়া খানিকদূর যেতে যেতেই মি. সিম্পসন পৌঁছে গেলেন সৈনিকের কাছে। দড়ির সিঁড়ি ধরে ভেসে রইলেন তিনি। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে তাকিয়ে গফুরের উদ্দেশ্যে একটা হাত বাড়িয়ে ধরলেন তখুনি। গফুর মি. সিম্পসনের হাত ধরে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হাঁপাতে লাগলো সশব্দে।

'উঠে পড়ুন আপনারা! দেরি করছেন কেন?' মহুয়াকে নিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বললো শহীদ মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে। সৈনিকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা।

মি. সিম্পসন ও গফুর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ডেকের উপরে। শহীদ ও মহুয়াও উঠতে শুরু করলো। এদিকে জংলীরা এসে পড়েছে কাছে। তীর ছুড়ছে তারা।

নিরাপদেই সবাই উঠলো সৈনিকে। উঠেই শুয়ে পড়লো ডেকের উপর। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সকলেই হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। কথা বলবার শক্তিও কারও নেই যেন।

ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে সৈনিকের গায়ে বর্শা লাগার। মাঝে মাঝে এক আধটা বর্শা এসে বিঁধছে ডেকের উপর। ওরা বুঝলো ভয়ঙ্কর একটা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে ডেকের এপাশে মরার মতো এভাবে পড়ে থাকলে।

'গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে সরে যেতে হবে সবাইকে। রেলিঙের ঐ কোণে গেলে নিরাপদ হওয়া যায় কিছুটা।' জংলীদের চিৎকারে কান পাতা দায়। কথাটা চিৎকার করে কয়েকবার বললো শহীদ সকলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কারও কানে ঢুকলো না তার কথা। বুঝতে পেরে শহীদ নিজেই গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে সরে যেতে লাগলো। তার দেখাদেখি অন্যেরাও চলে এলো এক কোণে।

কোণের দিকে এসেই সন্দেহটা জাগলো শহীদের মনে। চারপাশ থেকে হৈ-হল্লার শব্দ আসছে কেন? জংলীরা তো তীরে দাঁড়িয়ে আছে। বা কেউ কেউ পানিতে নেমে পড়েছে। কিন্তু চতুর্দিক থেকে চিৎকারের শব্দ হবে কেন তাহলে?

ব্যাপারটা মি. সিম্পসনও টের পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন ডেকের উপর। রহস্যটা কি দেখতে হবে।

মি. সিম্পসনকে বাধা দিলো শহীদ, 'উঠবেন না, আমাকে দেখতে দিন ব্যাপারটা কি!'

হামাগুড়ি দিয়ে বসলো শহীদ। তারপর পা দুটো ভাঁজ করে আধা দাঁড়ানো অবস্থায় তীরের দিকে তাকালো। সমুদ্রে জংলীরা নেমেছে কিনা দেখতে পেলো না সে। তীরের উপর দেখা গেল শত শত জংলী দাঁড়িয়ে আছে। বসে নেই তারা। তীর ছুঁড়ছে, বর্শা মারছে সৈনিককে লক্ষ্য করে। পিছন ফিরে তাকালো এবার শহীদ। চমকে উঠলো। হায় হায় করে উঠলো তার অন্তরাত্মা। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না। প্রাণ যাবেই এযাত্রা। কোনো উপায় নেই হিংস্র এই জংলীদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচবার।

শহীদ দেখলো, সমুদ্রের এমন একটা দিকে সৈনিক নোঙর করা যে তার চারপাশে ছোটখাট অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে। সম্ভবত রাজা হিরিরিরি কোনো সঙ্কেত

ব্যবহার করে ঐ দ্বীপগুলোর জংলীদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন বিদেশী শত্রুদেরকে ঘায়েল করার জন্যে। ঐসব জংলীদের সাজ-পোশাক এবং অস্ত্রাদি অন্য রকম দেখেই এ ধারণা হলো শহীদের।

বড় জোর আর তিন মিনিট বেঁচে আছি আমরা। ভাবলো শহীদ। ছোট ছোট দ্বীপগুলো থেকে শত শত নৌকোয় চড়ে জংলীরা ঘিরে ফেলেছে সৈনিককে। খানিকটা দূরে আছে এখনও ওরা। কিন্তু বড় জোর তিন মিনিট লাগবে ওদের সৈনিকের কাছে এসে পৌঁছুতে।

শুয়ে পড়লো আবার শহীদ। একে একে তাকালো সে মহুয়া, মি. সিম্পসন ও গফুরের দিকে। মোচড় দিয়ে উঠলো তার বুকটা। কি করা যায়, কি করা যায়, কি করা যায়! দ্রুত চিন্তা করতে চেষ্টা করলো শহীদ। প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে নিজেকে স্থির রাখবার। আবার তাকালো সে সকলের মুখের দিকে। হাঁপাচ্ছে ওরা এখনও ক্লান্তিতে। জানে না, আর মাত্র দু'মিনিট পরই ওদের মৃত্যু ঘটবে।

গোলাগুলি ছুঁড়ে কোনো লাভই হবে না এক্ষেত্রে। তাছাড়া জংলীদের কাছেই রয়ে গেছে সব অস্ত্রাদি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো শহীদ। কথাটা এতক্ষণ মনে আসেনি বলে আশ্চর্য হলো সে। ভাবলো, এতোটা দিশেহারা হয়ে পড়া উচিত হয়নি তার—ছিঃ ছিঃ!

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলো শহীদ ডেক ধরে তিনতলার সিঁড়িটার দিকে। উঠে দাঁড়াতে শোঁ শোঁ করে কয়েকটা তীর চলে গেল শহীদের মাথার ইঞ্চিখানেক উপর দিয়ে। সাবধান হবার কথা মনেও হলো না শহীদের। মরিয়া হয়ে ছুটলো সে তিনতলার দিকে।

নিরাপদেই সৈনিকের তিনতলায় উঠলো শহীদ। একটি মাত্র কেবিন উপরে। কেবিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শহীদ দেখলো একটা লৌহমানব বিরাট বড় একটা যন্ত্রের হাতল ঘোরাচ্ছে বন বন করে। এই হাতলটার কথা মনে পড়ে যেতেই ছুটে এসেছিল শহীদ।

এদিকে শহীদ তিনতলার সিঁড়ির দিকে চলে যেতেই মি. সিম্পসন সচেতন হয়ে পড়লেন। কাউকে কিছু না বলে অমন করে ছুটলো কেন শহীদ? উঁকি মেরে সৈনিকের আশপাশে ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে নাকি সে? কথাটা মনে জাগতেই ডেকের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে রেলিঙের সামনে চলে এলেন।

শর্ষে ফুল ফুটলো মি. সিম্পসনের চোখের সামনে। সৈনিকের চারপাশের গা বেয়ে জংলীরা উপরে উঠে আসছে।

স্বচ্ছ একটা আবরণ পড়লো মি. সিম্পসনের চোখের সামনে। আর ঠিক তখুনি তার কপাল বরাবর ছুটে এলো একটি তীর। ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠতে গেলেন মি. সিম্পসন। পিছিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা।

'আর কুনো চিন্টা নেই!'

লৌহমানবের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল এমন সময়। পিছন ফিরে তাকালেন মি. সিম্পসন। দেখলেন হাতে একটা ট্রে নিয়ে মহুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লৌহমানব। নানারকম টিনের খাবার সাজানো রয়েছে ট্রের ওপর। মাংস, ডিম, হরলিকস। সৈনিক ডুবে গেলেও এয়ার-টাইট টিনের খাবারগুলো যেমন ছিলো ঠিক তেমনই আছে।

মি. সিম্পসনের কপালে জংলীদের ছোঁড়া তীরটা লাগেনি। যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে প্লাস্টিকের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে সৈনিককে। তীরটা এসে তাতেই ঠক্ করে লেগে ছিটকে পানিতে গিয়ে পড়েছে।

মহুয়া ও গফুরও জানে প্লাস্টিকের আবরণটা আনব্রেকেবল্। ডেকের উপর উঠে বসলো ওরা। মহুয়া লৌহমানবের হাত থেকে ট্রে নিয়ে নিলো। শহীদ ফিরে এলো এতক্ষণে। সকলে যে যার কেবিনে চলে গেল কয়েক মিনিটের জন্যে। মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এলো ওরা আবার।

এবার ডেকের উপর পাতা চেয়ারগুলোয় আরাম করে বসলো সবাই। মহুয়া একে একে প্রত্যেকের প্লেটে সাজিয়ে দিলো মাংস ও ডিম। এক কাপ করে হরলিকসও নিলো সবাই। কিন্তু গফুর রেলিঙের ধারে ছুটে গেল হঠাৎ। প্লাস্টিকের অপর দিকে একজন জংলীর হাত দেখা যাচ্ছে। জংলীটা প্লাস্টিকের উপর উঠে আসার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

রেলিঙের ধারে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো গফুর। খানিকবাদেই উঠে পড়লো জংলীটা। মুখটা দেখা যাচ্ছে তার। হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সৈনিকের ভিতরে। গফুরকে দেখতে পেয়ে মুখ ভেংচাবার কথা ভুলে গেল সে। উল্টো গফুর হরলিকসের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসিখুশি ভঙ্গিতে অনুরোধ করতে লাগলো জংলীটাকে তার সামান্য উপহার গ্রহণ করতে। জংলীটা বোবার মতো তাকিয়ে রইলো।

দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন জংলী উঠে এলো প্লাস্টিকের উপর। যে-ই উঠছে হতভম্ব হয়ে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। দু'একজন অবশ্যি অতটা ঘাবড়াল না। বর্শার খোঁচা দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো তারা প্লাস্টিকটা ভেদ করে ভিতরে ঢোকার।

গফুর একবার এ জংলীকে হরলিকস খাবার জন্যে সাধে, সে রাজি না হলে অন্য একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপার দেখে মি. সিম্পসনও উঠে এলেন রেলিংয়ের ধারে। তিনিও মজা করবেন মনে হচ্ছে।

আর ঠিক তখুনি দুলে উঠলো সৈনিক। টাল সামলে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা দুজন। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো শহীদ। কিন্তু মহুয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'এ কি!'

'কিছু নয়। কুয়াশার কৌশল এটা। সৈনিককে পরিচালিত করছে সে কোথাও থেকে।'

নিশ্চিন্তে আবার বসলো মহুয়া। শহীদ আবার বললো, 'কামালকে সম্ভবত উদ্ধার করতে পেরেছে কুয়াশা।'

ডুবে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কুয়াশার ক্ষুদ্রাকৃতি সাবমেরিন। জংলীগুলো প্লাস্টিকের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়লো পানিতে। ঠিক এই সময় যদি কেউ পানির উপরে থাকতো, তাহলে সে দেখতে পেতো হাজার হাজার অসভ্য জংলী হতবাক হয়ে গেছে। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে ওরা বিমূঢ় দৃষ্টিতে। শত্রুরা যে এভাবেও ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে তা চাক্ষুষ করেও ভাবছিল তারা এটা অবিশ্বাস্য!

সাত মিনিট পর।

প্রত্যেকে এক কাপ হরলিকস হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে! ডেকেই বসে আছে ওরা।

কারো মুখে কথা নেই। সকলেই আত্মস্থ হয়ে আছে। গত কয়েকদিনে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ওরা সকলেই। জীবনের আশা কি করেছিল কেউ?

জীবনের আশা করেনি একথা বললে ভুল হবে। অসাধারণ ক্ষমতা আছে এদের মধ্যে। ভয় পায়, দুর্বলতা জাগে, দুশ্চিন্তা করে- কিন্তু বিপদ মাথায় নিয়ে ওরা সংগ্রামও করতে পারে! ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। লড়তে পারে হাঙর এবং অক্টোপাসের সঙ্গে। নিজেদের দলকে রক্ষা করতে কঠিন পরিশ্রমেও কিছু হয় না। নিজের জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারে সঙ্গী সাথীকে বিপদ থেকে যেমন করে হোক বাঁচাতে।

অসমসাহসী এই বীরের দল ঘটনার নিষ্ঠুরতা দেখে ভীত হয়েছিল বৈকি। কিন্তু দমেনি ওরা। সংগ্রাম করেছে। বুদ্ধি খাটিয়েছে। উপযুক্ত ফলও পেয়েছে তার ফলে। ওদের মুক্তি ওদেরকে চেষ্টা করেই অর্জন করতে হয়েছে। সে কৃতিত্ব ওদেরই।

ভেসে উঠলো সৈনিক।

'ঐ তো কামাল!'

শহীদ হাসলো। মহুয়া বললো, 'দাদা!'

কুয়াশা এবং কামাল পানিতে নেমে এগিয়ে আসছে সৈনিকের দিকে। দশ হাত দূরে ভেসে উঠেছে সৈনিক।

ক্লান্তিতে শরীর কাহিল। ঘুম হয়নি গত আটচল্লিশ ঘণ্টা কারও। তবু স্বর্ণের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে ওদের সকলের মুখে। আবার একত্রিত হয়েছে ওরা। মনে পড়ছে এখন সকলের সেই কথাটা। রাতে অন্ধকারে মত্ত-মাতাল সমুদ্রে লাফিয়ে

পড়েছিল ওরা। তারপর ছড়িয়ে পড়েছিল একজন অন্যজনের কাছ থেকে। আবার সকলে একত্রিত হতে পারবে ওরা কেউ ভাবেনি। দিবাস্বপ্ন বলেই তো মনে হয়েছিল কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত।

আবার ফিরে পেয়েছে ওরা নিজেদেরকে। যার যার প্রকৃতি মতো কাজ করছে ওরা। ইতিমধ্যেই গফুর দু'বার গম্ভীর কণ্ঠে বলেছে, 'যাও দাদামণি, ঘুমিয়ে নাও এবার একটু। না হলে মারা পড়বে। শরীরের উপর দিয়ে গত দুদিন ধরে ধকল তো কম যায়নি!'

ডাঁট মারছেন মি. সিম্পসন সুযোগ পেলেই, 'জংলীগুলোকে নাকানিচোবানি খাইয়েছি খুব। মনে রাখবে ব্যাটারা বহুদিন।'

হাসছে মহুয়া সকলের দিকে তাকিয়ে। চোখে আবার ফিরে এসেছে উজ্জ্বল দীপ্তি। শহীদ ও কুয়াশা দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে। কথা নেই ওদের মুখে। নিঃশব্দে উপভোগ করছে ওরা মহান একটা জয়গানের সুর মন ভরে। মুক্তির আবেগে স্থির-অচঞ্চল ওদের দৃষ্টি পরস্পরের দিকে। কামাল সকলের দিকে তাকাচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'রাজা হিরিরিরি একমাত্র আমাকেই পছন্দ করেছিলেন রাজ-জামাতা হিসেবে একথা তোমরা কিন্তু কেউ ভুলে যেয়ো না। আমার মধ্যে কিছু একটা গুণ আছে বৈকি, তা না হলে…বুঝতেই পারছো! আর খাওয়া দাওয়ার কি ঘটা…!'

গফুর হাসছে। মহুয়া হাসছে। কুয়াশা এবং শহীদও হাসছে এক একবার তার কথা শুনে। মি. সিম্পসনও বাদ যাননি।

এমন সময় হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। রিস্টওয়াচের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে তাকাতে চেয়ার ছাড়লো সে।

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো কুয়াশা?'

'সিগন্যাল পাঠাচ্ছে কেউ। আচ্ছা, দেখে আসি আমি ব্যাপারটা।'

ডেক থেকে চলে গেল কুয়াশা কন্ট্রোলরুমের দিকে। ফিরে এলো সে মিনিট দু'য়েক পরই। মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না শহীদ। প্রশ্ন করার আগেই কুয়াশা বললো, 'একটা সুখবর আছে। শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের কথা নিশ্চয় কেউ ভুলে যায়নি—যেটা থেকে টর্পেডো মেরে সৈনিকের তলা ফুটো করে দেয়া হয়েছিল।'

'কি হয়েছে তার?' জানতে চাইলো কামাল।

কুয়াশা হাসতে হাসতে বললো, 'হয়নি এখনও, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হবে। স্থায়ী নরকবাস হবে ওদের।'

ব্যাপারটা এরপর ব্যাখ্যা করলো কুয়াশা। শত্রুপক্ষের ঐ সাবমেরিন থেকে কাছেপিঠের জলযানগুলোতে মেসেজ পাঠানো হচ্ছে এই বলে যে, আমাদের সাবমেরিনের দুটো এঞ্জিনই ফেল মেরেছে। পানির উপর ভেসে উঠতে বাধ্য হয়েছি

আমরা। কেউ আমাদেরকে উদ্ধার না করলে না খেতে পেয়ে মারা যাবো—প্লীজ হেলপ আস।

একটু থেমে কুয়াশা বললো, 'না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরার আশঙ্কা মিছে ওদের। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই নরকে পৌঁছে যাবে ওরা।'

'কোন্‌দিকে ভেসে উঠেছে সাবমেরিনটা?' শহীদ প্রশ্ন করলো।

'তোমরা যেখানে সৈনিককে নোঙর করা দেখেছিলে তার কাছেই। তবে আরো গভীর সমুদ্রে।'

মি. সিম্পসন লাফিয়ে উঠলেন এতক্ষণে। বললেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের মৃত্যু ঘটবে! তার মানে আমরা ওদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিশোধ নেবো আক্রমণ করে—তাই না, কুয়াশা?'

হো হো করে হেসে উঠলো কুয়াশা। বললো, 'না। তা আমরা করতে পারি না। আর করার দরকারও হবে না।'

'কেন!' কামাল প্রশ্ন করলো।

'আমরা কেন শুধু শুধু আক্রমণ করবো? আমরা আক্রমণ না করলেও তো ওরা শাস্তি পাবে।'

'কিন্তু, কিভাবে?'

মি. সিম্পসনের এই প্রশ্নের উত্তর দিলো শহীদ। মাথা নিচু করে গভীর ভাবে কি যেন দেখছিল সে নেভিগেশন সংক্রান্ত একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে। মুখ তুলে মি. সিম্পসনের উদ্দেশে সে বললো, 'ব্যস্ত হবেন না, মি. সিম্পসন। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন সব।'

শহীদ কুয়াশার দিকে তাকালো এবার। বললো, 'আর দেরি কেন, সৈনিক যাত্রা আরম্ভ করতে পারে এখন। একটা কথা, সৈনিক যেদিক থেকে এসেছে সেদিক দিয়েই মাঝসমুদ্রে পৌঁছায় যেন।'

'তারমানে!' কামাল প্রশ্ন করলো।

মি. সিম্পসন বললেন, 'ওদিকেই তো সাবমেরিনটা আছে। তারমানে তুমি বলতে চাও ওদেরকে আমরা সাহায্য করবো?'

মাথা নেড়ে হেসে ফেললো শহীদ। বললো, 'না, তা নয়।'

'তবে কি ওদেরকে আক্রমণ করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছো তুমি?' কুয়াশা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো।

শহীদ বললো, 'না না। আসলে পেরুতে যাবার জন্যে ঐ দিক দিয়েই যেতে হবে আমাদেরকে।'

'বুঝেছি, শহীদ।' চলে গেল কুয়াশা কন্ট্রোলরুমের দিকে।

চলতে শুরু করলো সৈনিক একটু পরই।

*

দু'মিনিটেই আশি মাইল স্পীড উঠলো সৈনিকের। তুফানের মতো এগিয়ে চললো সে বিজয় কেতন উড়িয়ে জল কেটে কেটে।

সাবমেরিনটাকে সামান্য সময়ের জন্যে দেখতে পেলো ওরা। শহীদ এবং কুয়াশা আগে থেকে অনুমান করেছিল একটা ব্যাপার। মি. সিম্পসন ও কামাল ধরতে পারেনি ব্যাপারটা।

ভাসছে সাবমেরিনটা মাঝ দরিয়ায়। পিঠটা দেখা যাচ্ছে তার। অসংখ্য মাছির মতো জংলী উঠে পড়েছে তার উপর। বর্শা দিয়ে খোঁচাচ্ছে তারা সাবমেরিনটাকে। ইতিমধ্যেই অনেকটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কাজে। আর বড় জোর পাঁচ মিনিট। ঢুকে পড়বে ওরা সাবমেরিনের ভিতর দলে দলে।

নিরুপায় দাঁড়িয়ে আছে সাবমেরিনটা। সেটার গায়ে নৌকো ঠেকিয়ে ঘিরে ফেলেছে জংলীরা চতুর্দিক থেকে। বর্শার ঘা বসাচ্ছে হরদম।

রসগোল্লার টুকরো একটা অংশের উপর লাখ খানেক পিঁপড়ে চড়লে যেমন মনে হয় সাবমেরিনটা এবং হিংস্র জংলীগুলোকে দেখে তাই মনে হলো শহীদের।

'ওদের জন্যেই আমরা প্রাণ হারাতে বসেছিলাম,' মি. সিম্পসন বললেন।

কামাল বললো, 'এখন কেমন মজা, টের পাচ্ছে ব্যাটারা।'

শহীদ কিছু বললো না। পাশ কাটিয়ে দ্রুত পেরিয়ে গেল সৈনিক সাবমেরিনটাকে। কুয়াশা বললো, 'ওরা আমাদের বিপদে ফেলে দেরি করিয়ে দিয়েছে। পেরুতে পৌঁছে যদি দেখি বৈজ্ঞানিক Kotze-এর যে সর্বনাশ ঘটবার আশঙ্কা আছে তা ঘটে গেছে তাহলে দুঃখের সীমা থাকবে না আমাদের।'

একটু থেমে পিছন ফিরে দূরবর্তী সাবমেরিনটার দিকে তাকিয়ে আবার কুয়াশা বললো, 'ওদেরকে আমরা অনায়াসে জংলীদের কবল থেকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু...'

শহীদ বললো, 'কিন্তু ওরা নিজেরাই সে পথ বন্ধ করে রেখেছে।'

তিন

জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর বজ্রপাত ঘটালো কানের পাশে, 'হ্যাণ্ডস আপ—অল অভ ইউ—হ্যাণ্ডস আপ!'

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে সৈনিক থেকে নামছিল কুয়াশা। স্থির হয়ে গেল সে। শহীদ ধীরে ধীরে হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা ডেকের উপর রেখে হাত তুললো মাথার উপর।

কানের পর্দায় আঘাত করলো তীক্ষ্ণ অপর একটি কণ্ঠ। ডানপাশ থেকে এলো শব্দটা, 'সাবধান! কোনো চালাকি চাই না!'

পকেটের পাশে ডান হাতটা স্থির হয়ে রয়েছে মি. সিম্পসনের। মানা করলো কুয়াশা চোখের ইঙ্গিতে। মি. সিম্পসন নিরুপায় হয়ে হাত দুটো তুললেন মাথার উপর। কামাল অলস ভঙ্গিতে চুলহীন মাথাটা দু'হাত দিয়ে ঢাকলো। মহুয়া এবং গফুর মাথার উপর হাত তুলেছে সবার আগে।

ধীরে ধীরে চারপাশটা দেখে নিলো কুয়াশা। মোট কুড়িজন। পিছনে পাঁচজন। একটু ডান দিক ঘেঁষে একটা উঁচু পাথরের উপর সাতজন। বাম দিকে চারজন। লোকগুলো জার্মান। প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান। পিস্তল রয়েছে কেবল একজনের হাতে। দলপতি বোধহয় ঐ লোকটিই। সে-ই হুকুম জারি করেছে প্রথম।

এবারও সেই লোকটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের মধ্যে "কুয়াশা" কে?'

অস্বাভাবিক বেঁটে লোকটার দিকে তাকালো কুয়াশা। পাথরে খোদাই করা মুখ যেন। শত শত বর্ষের রোদ বৃষ্টি সয়ে সয়ে তামাটে হয়ে গেছে গায়ের রঙ। কুঁতকুঁতে ছোট্ট দুটো চোখ। ফিকফিক হাসছে। বেঢপ পটলের মতো নাকটা বারবার কুঁচকে উঠছে লোকটার। তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে আর সবাই কুয়াশাদের দিকে।

'তুমি! তুমিই তাহলে দুর্ভাগা কুয়াশা?'

কথা বললো না কুয়াশা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে লোকটির চোখের মণিতে। চোখ ঘুরিয়ে নিলো লোকটি। বুঝতে পেরেছে সে ব্যাপারটা। কুয়াশা হিপনোটিজমের সাহায্য নিয়ে দাবার চাল পাল্টে দিতে চাইছে।

'নেমে এসো হে! জলদি জলদি নেমে এসো তুমি।'

অস্বস্তিকর গলায় বললো লোকটি অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে।

শহীদ অ্যাটাচি কেসটার দিকে তাকালো চোখ নামিয়ে। লৌহমানব দুটো কন্ট্রোল রুমে আছে। কিন্তু অ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলতে না পারলে তাদেরকে কোনো কাজেই লাগানো যাবে না। লেসারগানটা আছে কুয়াশার কেবিনে। শেষ উপায়, সৈনিককে যদি পানির নিচে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সে-ও অসম্ভব। পানি এখানে খুব বেশি নেই। সৈনিক সম্পূর্ণ ডুববে না এই পানিতে। না, ধরা পড়ে গেছে ওরা! তীরে ভিড়েই তরী ডুবলো বুঝি।

'ওয়ান, টু।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো কুয়াশা।

'গুড বয়!'

দশ পর্যন্ত গুনে গুলি চালাবে স্থির করেছিল লোকটি। কুয়াশাকে নেমে আসতে দেখে হাসলো সে।

কুয়াশা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চাপা স্বরে শহীদকে বললো, 'এরা সম্ভবত আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে। যদি তাই হয় তবে ভালোই। তোমরা কিন্তু আমার

জন্যে অপেক্ষা করো না। চলে যেও বৈজ্ঞানিকের ঠিকানায়। নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড!'

কথা বলতে পারলো না শহীদ। হতভম্ব হয়ে পড়েছে সবাই এই বিপদের মুখে পড়ে। পেরুর সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেছে তারা। সৈনিককে ডুবিয়ে দিয়ে সদলবলে টাকনা শহরে যাবার কথা তাদের। সেখান থেকে বিমানে নিউ সাজামোতে পৌঁছুবে। তীরে সকলকে নামিয়ে দেবার জন্যেই সৈনিক এখানে এসে থেমেছিল। চারপাশে অসংখ্য পাথরের খণ্ড। পানির গভীরতাও খুব কম। অতি ধীরে ধীরে সৈনিক তীরের কাছ বরাবর এসে থেমেছিল। সকলে নেমে যাবার পর লৌহমানব দুটোকে দিয়ে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করা হবে। প্রথমে নামছিল কুয়াশা। জায়গাটা ভালো করে দেখে নিতে চেয়েছিল সে। টাকনাতে যাবার রাস্তাটা কোথায় আছে সেটা জানার প্রয়োজন ছিলো। শহীদরা সকলে প্রস্তুত হচ্ছিলো নামার জন্যে। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার্বত্য এলাকাটা জরিপ করছিল তারা। ঠিক এমন সময় সামনে-পিছনে এবং দু'পাশের পাথরের আড়াল থেকে স্টেনগান নিয়ে বের হয়ে এলো লোকগুলো। অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হারিয়ে গেছে লাল সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে। নেমে এলো কুয়াশা সৈনিক থেকে গম্ভীর থমথমে মুখে। তিনজন লোক এগিয়ে এসে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললো কুয়াশাকে। সার্চ করলো তন্ন তন্ন করে। পেলো না কিছু।

'তোমার দলবলকে রেহাই দিলাম। ওদেরকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না আমরা। মাথাটাকেই ধরে নিয়ে যাবার আদেশ পালন করবো আমরা।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো বেঁটে জার্মানটা। ঝটপট বেঁধে ফেলা হলো কুয়াশাকে। লোকগুলো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকিয়ে নড়েচড়ে উঠলো। তীরের দিকে আসছে ওরা। পানিতে নেমেও স্টেনগানের মুখ স্থির রেখেছে সৈনিকের দিকে।

একজোট হলো লোকগুলো। যন্ত্র চালিতের মতো ঘুরে দাঁড়ালো। দুজন শুধু শহীদের দিকে তাকিয়ে পিছু হটে দলের সঙ্গে এগোতে লাগলো।

মিনিট খানেকের ব্যাপার। অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা। কুয়াশাকে নিয়ে লোকগুলো চোখের আড়ালে চলে যেতে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শহীদরা। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে ওরা পাহাড়ের বাঁধটার দিকে। ওদিকেই নিয়ে গেছে কুয়াশাকে।

সংবিৎ ফিরে পেতেই অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিলো শহীদ। খুলে ফেললো সেটার ডালা। সুইচ টিপলো দ্রুত। কিন্তু লৌহমানব ডেকে এসে পৌঁছুবার আগেই শব্দ পাওয়া গেল পাহাড়ের আড়াল থেকে—ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কুয়াশাকে নিয়ে চলে গেল শত্রুরা নাগালের বাইরে।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মি. সিম্পসন। শহীদের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, ‘কোনো লাভ নেই শহীদ! আর কিছু করার নেই আমাদের।’

‘আমরা বৈজ্ঞানিক Kotze-কে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবোই!’

কঠিন প্রতিজ্ঞা শহীদের বজ্রকঠিন কণ্ঠে, ‘কুয়াশার কথা রাখতে হবে আমাদেরকে।’

রুক্ষ ভূমি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সন্ধ্যার ছায়া নামছে গাঢ় হয়ে। পাহাড়ের গহ্বর, খাঁজ, বাঁক দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে কোনো কোনো জায়গায়। পিছনে পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো আকৃতি। দু'পাশেও তাই। সামনে উঁচু নিচু রুক্ষভূমি। চড়াই। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে বিরাট বিরাট পাহাড়ের প্রাচীর। ছুটছে লোকগুলো কুয়াশাকে নিয়ে।

তারা ফুটছে একটি একটি করে। অন্ধকারের গাঢ় কালিমা দূর হয়ে গিয়ে মায়াময় স্বপ্নের মহিমা নিয়ে ফুটে উঠলো কুয়াশার চোখের সামনে টাকনার পার্বত্য এলাকা। কি সুন্দর!

মৃদুমন্দ সমীরণ বয়ে যাচ্ছে। মিটমিট করে কি যেন গোপন ভাবের ইঙ্গিত জানাচ্ছে শত-সহস্র নক্ষত্র। চাঁদ উঠবে আর একটু পর। ঘোড়ার খুরের শব্দও সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ। অশ্রুত সুরে একটি গান গাইছে যেন এই পাহাড়ের প্রতিটি বাঁক, খাঁজ ও প্রাচীর। তাল দিচ্ছে ঘোড়ার পদশব্দ। সহস্র-কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রগুলোও যোগ দিয়েছে এই স্বপ্নিল উৎসবে। উদাস করে তুলছে মন। কার কথা যেন মনের অবচেতন কোণ থেকে উঁকি মারতে চাইছে। অবশ হয়ে যেতে চায় কুয়াশার মন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই বিচিত্র রূপ দেখে। তা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটি করুণ অভাব বোধ জাগে। কি যেন নেই তার। কি যেন সে পায়নি। তার জীবনে কিসের যেন অভাব রয়েছে একটা।

চাঁদ উঠলো আর একটু পরই। একুশটা ঘোড়া একুশজন মানুষকে নিয়ে টগবগিয়ে ছুটে চলেছে। ঘণ্টাখানেক ছুটেই দাঁড়িয়ে পড়লো ঘোড়াগুলো ঐ পাহাড়ের একটা গুহার সামনে। মশাল জ্বলছে গুহার ভিতর। ঘোড়াগুলো থমকে দাঁড়াতেই গুহার ভিতর থেকে বের হয়ে এলো একটি অস্বাভাবিক লোক। যেমনি লম্বা লোকটি, তেমনি শক্ত সমর্থ চেহারা। জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বের হয়ে এসেছে লোকটা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো কুয়াশা লোকটির দিকে। মশালের লালচে আভায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে লোকটিকে। বলিষ্ঠ একটা ব্যক্তিত্ব আছে লোকটির অবয়বে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি, রুমাল দিয়ে মাথার লম্বা চুল বাঁধার কায়দা এবং রোদে পোড়া তামাটে রং দেখে লোকটিকে সাধারণ একজন বলা অসম্ভব।

বেঁটে মতো জার্মানটি কি যেন বললো স্থানীয় ভাষায়। ধীরে ধীরে উত্তর দিলো

সে। বেঁটে লোকটি আবার কিছু বলতেই ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো কুয়াশার দিকে।

ঘোড়া থেকে নেমে চলে গেল লোকগুলো গুহার ভিতর। কুয়াশা এবং লোকটি রইলো শুধু। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে লোকটি কুয়াশার দিকে। হঠাৎ কুয়াশার উদ্দেশ্যে চোখ টিপলো লোকটি। আশ্চর্য হলো কুয়াশা। কি বলতে চায় লোকটি তাকে? কি ইঙ্গিত করলো?

কথা বলা সম্ভব হলো না দুর্ভাগ্যক্রমে। গুহা থেকে বের হয়ে এলো সেই বেঁটে জার্মানটা। ঝটপট কুয়াশার পিছনে চলে এলো লোকটি।

দু'হাত পিছনে রেখে বাঁধা হয়েছে কুয়াশাকে। পিছন দিক থেকে দু'হাতে ধরে নামিয়ে আনলো লোকটি কুয়াশাকে। লোকটির শক্তি দেখে বিস্মিত হলো কুয়াশা। ভাবলো কে এই লোকটি? এ তো জার্মান নয়। তবে এদের দলে জুটলো কিভাবে? তাছাড়া গোপন ইঙ্গিতই বা করলো কেন সে তাকে? লোকটি কি তবে বৈজ্ঞানিক Kotze-এর লোক?

ব্যাপারটা জানা গেল না। রহস্যই রয়ে গেল সবটা ব্যাপার। গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো কুয়াশাকে। এবার তাকে আরও শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো। পা জোড়া মুক্ত ছিলো, এবার তাও বাঁধা হলো।

জার্মানরা পেটুক হয় তা জানতো কুয়াশা। কিন্তু এতোটা আশা করেনি সে। দল বেঁধে বসে হাসি মস্করা করতে করতে ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়া-দাওয়া সারলো ওরা। এতোই অতিরিক্ত হয়ে গেল ওদের প্রত্যেকের খাওয়া যে নড়তে চড়তে পারছে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুহার মধ্যে শুয়ে পড়লো ওরা যে যার বিছানায়। কুয়াশার কথা যেন ভুলেই গেছে।

স্থানীয় সেই লোকটি তখনও শুতে যায়নি। সে এলো কুয়াশার বাঁধনটা পরীক্ষা করতে। বাঁধন পরীক্ষা করার সময় আরও একটা গোপন কাজ করলো লোকটা। মিনিটখানেকের মধ্যে যতটুকু কাবাব খেতে পারলো কুয়াশা, ততটুকু খাওয়াল লোকটি ওকে সকলের অজান্তে।

ইচ্ছে করেই কোনো কথা বলার চেষ্টা করলো না কুয়াশা। লোকটিও উঠে চলে গেল। গুহার বাইরে বের হয়ে একটা উঁচু মতো পাথরের উপর বসলো সে নিজের রাইফেলটি পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে। গুহায় পাহারা দেবার ভার তার উপর।

লোকগুলো শুয়েছে বটে। কিন্তু ঘুমোয়নি। এপাশ ওপাশ করছে কেউ কেউ। তিনজন সিগারেট ধরিয়েছে। কথা বলছে ফিসফিস করে দু'জন।

একটি মাত্র মশাল জ্বলছে গুহায়। লোকগুলোর মতো নরম বিছানা না পেলেও ঘুম এসে পড়লো কুয়াশার। রাত আন্দাজ বারোটার সময় চোখ জুড়ে ঘুম এলো তার। ঘুম ভাঙলো ঘণ্টা দুয়েক পরই। প্রলয়ঙ্কর আর্তনাদ, স্টেনগানের গর্জন, ধোঁয়া--চোখ মেলে হতভম্ব হয়ে পড়লো কুয়াশা এই দৃশ্য দেখে।

চার

আধ মিনিট ধরে প্রচণ্ড গুলির শব্দ হলো। শব্দ শুনেই চোখ মেলে তাকালো কুয়াশা। ধোঁয়া! ধোঁয়ায় ভরে গেছে গুহাটা।

'উঁ...উঁ...'

মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের অন্তিম গোঙানি শোনা গেল। মশালটা জ্বলছে আগের মতোই। কিন্তু ধোঁয়ায় এমন ভাবে ভরে গেছে গুহাটা যে, কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। হঠাৎ কুয়াশা দেখলো, ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে একজন লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। মুখ দেখা যাচ্ছে না লোকটার। লম্বা একটা শরীর তার কাছে এসে দাঁড়ালো। শুনতে পেলো সে, লোকটি অদ্ভুত শান্ত গলায় বললো, 'আশ্চর্য হয়ো না, বন্ধু। আমার নাম ফার্ণান্দো। আমি শ্রদ্ধেয় Dr. Kotze-এর লোক।'

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল লোকটার। বসে পড়লো সে কুয়াশার পাশে। হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলো কোমর থেকে ছোটো একটা ছুরি বের করে।

'চলো, কেটে পড়া যাক এখান থেকে।'

লোকটি কুয়াশাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে করতে বললো, 'জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি সবকটিকে। গুলির শব্দ তুলিকা পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। এসে পড়বে ওরা। তার আগেই কেটে পড়া উচিত, কি বলো?'

ধোঁয়া পাতলা হয়ে গেছে অনেকটা। আস্তে আস্তে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে গুহার ভিতরটা। অস্বাভাবিক লম্বা ফার্ণান্দোর কথা শুনতে পেলো কুয়াশা, কিন্তু বুকের ভিতর টনটন করছে তার ব্যথায়। মানুষের প্রাণের মূল্য কি সে তা জানে। মানুষ যে কোনো মূল্যে বাঁচতে চায়, এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্যে যুদ্ধ করতে হয় মানুষকে। ফার্ণান্দো বলছে সে বৈজ্ঞানিক Kotze-এর লোক। ভালোই। কিন্তু এতগুলো লোককে নিদ্রিত অবস্থায় মেরে ফেলার কি দরকার ছিলো? চুপি চুপি পালিয়ে গেলেই তো ওদেরকে ব্যর্থ করা হতো। কাপুরুষোচিত এই হত্যাকাণ্ড ঘটাবার কারণ কি!

কুয়াশাকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে অধৈর্য স্বরে ফার্ণান্দো বললো, 'রওনা হয়ে গেছে ওরা, চলো না হে!'

গম্ভীর গলায় কুয়াশা প্রশ্ন করলো, 'এদেরকে মারলে কেন তুমি?'

'মারলাম কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটা কুয়াশার কথা শুনে। বললো, 'মারবো না? ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কি করতো জানো! স্রেফ জাহান্নামে পাঠাতো। তোমাকে বাঁচানো দরকার, তাই তোমার বদলে ওদেরকেই জাহান্নামে যেতে হলো।'

কুয়াশা বললো, 'একজনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি বিশজন মানুষকে হত্যা করতে পারো না, মি. ফার্ণান্দো। তাছাড়া আমাকে মুক্ত করার আরও হাজারটা উপায় তৈরি করে নেয়া যেতো।'

কুয়াশার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না ফার্ণান্দো। প্রথমে সে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো কুয়াশার দিকে। তারপর হাসলো হোঃ হোঃ করে। এতগুলো লোককে হত্যা করে এক বিন্দু অনুতাপ জাগেনি লোকটার বুকে। সহজ, স্বাভাবিক, উচিত কাজ করার মতোই করেছে সে কাজটা। মানুষ মারার জন্যে কোনো লোকের কাছে জবাবদিহি করার কথা স্বপ্নেও ভাবে না সে।

হাসতে হাসতে একটা স্টেনগান এনে দিলো ফার্ণান্দো কুয়াশার হাতে। দমে গেছে কুয়াশা। এ লোকটা স্বীকার করবে না নিজের বোকামি। মানুষ মারা এর সহজাত প্রবৃত্তি। বোঝানো সম্ভব নয় একে যে, অকারণে মানুষ মারা উচিত নয়।

হাত বাড়িয়ে স্টেনগানটা নিলো কুয়াশা। তারপর কুণ্ডুলি পাকানো লাশগুলোর দিকে ধীরে ধীরে এগোলো সে। দু'পা মাত্র এগোতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো একজন লোক পড়ে থাকা লাশগুলোর মাঝখান থেকে। সিধে ছুটলো সে প্রাণপণে গুহামুখের দিকে। পা জখম হয়েছে লোকটার। ঠিকমত দৌড়ুতে পারছে না, খোঁড়াচ্ছে। গুহার বাইরে যেতে পারবে না লোকটা। তার আগেই গুলি খাবে মাথার পিছনে। ফার্ণান্দো তুলেছিলও স্টেনগানটা, কিন্তু ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ঘুরিয়ে দিলো কুয়াশা স্টেনগানের মুখ।

'কি ব্যাপার!' আবার আশ্চর্য হলো লোকটি কুয়াশার ব্যবহারে।

কুয়াশা শান্তভাবেই বললো, 'পালাচ্ছে, পালাতে দাও ওকে।'

বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ফার্ণান্দো, 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কুয়াশা। লোকটাকে পালাতে সাহায্য করলে কেন?' রাগ নয়, ফার্ণান্দোর গলায় একরাশ বিস্ময়।

কুয়াশা বললো, 'এখন আমাদের প্রথম কাজ কি বলো তো?'

'এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া,' ব্যস্ত ভাবে উত্তর দিলো ফার্ণান্দো।

কুয়াশা বললো, 'ঐ আহত লোকটিকে গুলি করলে আমাদের পালিয়ে যাবার কাজটা কি সুগম হতো?'

ফার্ণান্দো কি বলবে ভেবে না পেয়েই বুঝি চুপ করে রইলো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে। কুয়াশা লাশগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখে বললো, 'উনিশজনকেই শেষ করেছো, আশ্চর্য!'

গুম মেরে গেছে ফার্ণান্দো। গুহাটা ঘুরে দেখলো কুয়াশা একবার। স্টেনগানটা তার হাতেই ধরা আছে। আরো দু'একটা জিনিসপত্র নিলো সে। ফার্ণান্দোও দু'তিনটে পুঁটলি নিলো। প্রচুর পরিমাণে ডিনামাইট আছে পুঁটলিগুলোয়। 'চলো এবার।'

কুয়াশার কথা শুনে গুহামুখের দিকে পা বাড়ালো ফার্ণান্দো। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। পুঁটলিগুলো হাত থেকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে গুহার মাঝখানে ফিরে গেল সে আবার। তারপর ঝুঁকে পড়ে বিছানাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো ব্যস্তসমস্ত হয়ে।

'কি খুঁজছো?'

'একটা ছোটো ব্যাগ, অ্যাটাচি কেসের মতো দেখতে। কিন্তু...কিন্তু...'

ফার্ণান্দো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ব্যাগটা যেন না পেলেই নয় তার। পাগলের মতো উঠে দাঁড়ালো সে। ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে তার। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। টেনিসবলের মতো ড্রপ খেতে খেতে একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরছে সে।

ব্যাগটা গুহার ভিতর নেই তা অল্পক্ষণেই বোঝা গেল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো ফার্ণান্দো। 'সব মাটি হয়ে গেছে! হায় হায়!'

কুয়াশা বললো, 'কি ছিলো ব্যাগটায়? এতো মাথা ঘামাচ্ছো দেখে আমার মনে হচ্ছে মানুষ খুন করার চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাপার জড়িত আছে ব্যাগটার সঙ্গে।'

আহত গলায় ফার্ণান্দো বললো, 'তুমি তা অস্বীকার করতে পারো না, কুয়াশা। শ্রদ্ধেয় Dr. Kotze-এর থিসিসের একটা অংশ আছে সেই ব্যাগটায়। উহ্ হাতছাড়া হয়ে গেল এবারও।' মানসিক যন্ত্রণায় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ফার্ণান্দোর।

কুয়াশা বললো, 'Dr. Kotze-এর থিসিস? এখানে কিভাবে এলো সেটা?'

'চুরি করে এনেছিল ওরা। ওটাই আমি উদ্ধার করার জন্যে ছদ্মবেশে এদের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। এদের কারো কাছেই ছিলো ব্যাগটা—সেই ব্যাগেই আছে থিসিসটা—কিন্তু দেখছি না তো কোথায়...ঐ লোকটা পালাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই...ঠিক তাই!'

কুয়াশা বললো, 'তাহলে থিসিসটা উদ্ধার করার জন্যেই এদের দলে যোগ দিয়েছিলে তুমি? কিন্তু ব্যাগটা কার কাছে আছে, কোথায় আছে তা না জেনেই লোকগুলোকে মেরে ফেললে, কেমন!'

কথা খুঁজে পেলো না ফার্ণান্দো। হঠাৎ সচেতন হলো সে। বললো, 'যা হবার হয়েছে, চলো এবার চলে যাই। এখুনি এসে পড়বে ওরা।'

কুয়াশা বললো, 'বারবার বলছো তুমি, ওরা এসে পড়বে—এসে পড়বে। ব্যাপারটা কি আসলে?'

'ব্যাপারটা হলো...' গুহামুখের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফার্ণান্দো বললো, 'শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক Kotze-এর শত্রু এই লোকগুলো। তাঁকে যেমন করে হোক ধ্বংস করে

দেবার জন্যে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ক্রিমিন্যালের দল লোক নিয়োগ করেছে। লোকগুলো এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাহারা দিচ্ছে। তোমার আসার খবর তাদেরও জানতে বাকি নেই। কোনরকম সাহায্য যাতে না পায় কারো কাছ থেকে শ্রদ্ধেয় Kotze তার জন্যে এই সতর্কতা ওদের। তুলিকা পর্বত শৃঙ্গে এদের আরও লোক আছে। গুলির শব্দ শুনে সন্দেহ হওয়া খুবই সম্ভব। ব্যাপারটা জানার জন্যে অনেকক্ষণ আগেই রওনা হয়ে গেছে ওরা।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো কুয়াশা। কিন্তু কিছু বললো না সে ফার্ণান্দোকে।

ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিলো গুহার বাইরে। দুটো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে উঠে বসলো ওরা। দু'জনেরই হাতে একটি করে স্টেনগান। ফার্ণান্দো ডিনামাইটের পুঁটলিগুলো বেঁধে নিলো ঘোড়ার পিঠে। তারপর উঠে বসে ছুটিয়ে দিলো ঘোড়াটাকে দু'পাশের পাহাড় কেটে যে পথটা ডান দিক ধরে সোজা চলে গেছে সেইদিকে। কুয়াশাও বিনাবাক্যব্যয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ফার্ণান্দোর পাশাপাশি।

সন্দেহটা জেগেছিল কুয়াশার মনে। কিন্তু চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে বলে দিকটা নির্ণয় করে উঠতে পারছিল না। তাছাড়া সহজ পথ কোন্‌টা সে অভিজ্ঞতাও তার নেই। ম্যাপ তো নেই-ই সঙ্গে। সুতরাং ফার্ণান্দো যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটাই সঠিক পথ ভাবলো সে। দূর করে দিলো মন থেকে সন্দেহটা।

একবার শুধু জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা, 'কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা?'

ফার্ণান্দো কি যেন চিন্তা করছিল একমনে। চমকে উঠলো সে কুয়াশার কথা শুনে। বললো, 'কি বললে?'

'কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা?'

একমুহূর্ত পর উত্তর দিলো ফার্ণান্দো, 'কেন, শ্রদ্ধেয় Kotze-এর আস্তানায়।'

কুয়াশা বললো, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি, না উত্তর-পশ্চিম দিকে?'

'উত্তর দিকে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ফার্ণান্দো।

কুয়াশা আর কিছু জানতে চাইলো না। ফার্ণান্দোও কথা বললো না আর।

দু'ঘণ্টা একভাবে ঘোড়া ছুটলো ওদের! এক হাজার ফুট উপরে উঠে যাবার কথা ওদের। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ও পাথর কেটে রাস্তা তৈরি করা। একদিকে পাহাড়ের দেয়াল অন্যদিকে শূন্যতা। তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে নিচের দিকটা। ঐ অন্ধকারের বাধা থাকা সত্ত্বেও কল্পনা করে নেয়া যায় দৃশ্যটা। আড়াইশো ফুট নিচেই দেখা যাবে সরু একটা রাস্তা। তারপর ফাঁকা। আরও নিচে পাহাড়ের কালো শরীর। তারপর আবার রাস্তা। রাস্তার পাশে দেখা যাবে আবার

একটা সরু পথ। তারও নিচে রুক্ষভূমি নজরে পড়বে। টাকনা শহরটা খুব বেশি দূরে নেই আর। ছাড়িয়ে আসেনি তো ওরা। পাহাড়ের বাধা না থাকলে দেখা যেতো একগুচ্ছ ফুলের মতো শহরের ঘড়বাড়িগুলোকে পিছন দিকে। দেখা অবশ্য যাবে, তবে আড়াই হাজার ফুট উপরে উঠলে। সকাল হবার আগে তা আর সম্ভব নয়। আড়াই হাজার ফুট উপরে উঠে যাবে ওরা সকালের দিকে, কুয়াশা ভাবলো।

সোয়া চারটে বাজে। হঠাৎ ফার্ণান্দো ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো বেশ খানিকটা। এগিয়ে গেল সে কুয়াশাকে পিছনে ফেলে। একটু অবাক হলো কুয়াশা। দু'মুহূর্ত পরই ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। ফার্ণান্দোকে দেখা যাচ্ছে না সামনে!

চাবুক কষে ঘোড়ার গতি বাড়ালো কুয়াশা। কিন্তু খানিক এগিয়ে দমে যেতে হলো তাকে। মূল রাস্তাটা থেকে সরু একটা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের পুব দিকে। ফার্ণান্দোর ঘোড়ার পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে ঐ পুব দিক থেকেই।

কেন? ফার্ণান্দো না বলে না কয়ে ওদিকে গেল কেন? পূর্ব সন্দেহটা আবার ফিরে এলো কুয়াশার মনে। লোকটাকে ঠিক যেন চিনতে পারছে না সে। কোনো বদ মতলব আছে নাকি ওর? কিন্তু কুয়াশাকে অন্যপথে কোথায় নিয়ে যেতে চায় লোকটা? কি লাভ ওর তাতে?

দেরি করলো না কুয়াশা। ফার্ণান্দোকে ধরতে হবে। খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে এতো লুকোচুরির কারণ কি। উত্তর দিকের পথ ছেড়ে হঠাৎ পুব দিকে মোড় নিলো কেন সে?

খানিকটা রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে রীতিমত শঙ্কিত হলো কুয়াশা। ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে পুব দিকের রাস্তাটা। তার মানে গিরিপথ ছেড়ে যাচ্ছে তারা। সমতলভূমির দিকে নামছে ঘোড়া। এদিকে ফার্ণান্দোর ঘোড়ার পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

চাঁদ দেখা যাচ্ছে নিচু আকাশে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে দেখতে চেষ্টা করলো কুয়াশা সামনেটা। না, ফার্ণান্দোকে দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের বাধা নেই যদিও সামনে, তবু কোনো কোনো জায়গায় জমাট অন্ধকার মনে হচ্ছে। সম্ভবত বড় বড় পাথরের খণ্ড পড়ে আছে জায়গাগুলোতে।

তাই-ই। পাহাড় ছেড়ে রুক্ষ সমতলভূমিতে নেমে এলো কুয়াশার কালো ঘোড়াটা। চাঁদের আলো ম্লান এখন। কিন্তু সমতলভূমিতে নেমে আসার পরই কুয়াশা দেখতে পেলো ফার্ণান্দোকে। বেশ খানিকটা দূরে। অটল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তার ঘোড়াটা। নেমে পড়েছে ফার্ণান্দো ঘোড়া থেকে। চঞ্চল মনে হচ্ছে তাকে। তার সামনের পথ রোধ করে জমাট বেঁধে রয়েছে রাশি রাশি অন্ধকার। উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি।

ঘোড়া ছুটিয়ে ফার্ণান্দোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। নেমে পড়লো। নিচু হয়ে একটা দড়িতে পরপর সাজিয়ে কি যেন বাঁধছে ফার্ণান্দো। কুয়াশাকে দেখে

মৃদু হাসলো সে ঘর্মাক্ত মুখ তুলে। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলো সে।

'কি ব্যাপার জানতে পারি কি?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছে নিয়ে।

ভুরু কপালে তুলে তাকালো ফার্ণান্দো কুয়াশার দিকে। আশ্চর্য হয়েছে যেন সে কুয়াশাকে কথা বলতে দেখে। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ছোটো ছেলেকে ভূতের ভয় দেখাবার মতো করে কথা বলতে নিষেধ করলো সে কুয়াশাকে। ঠোঁট থেকে আঙুল সরিয়ে অন্ধকার পাহাড়ের দিকে ইশারা করলো ফার্ণান্দো। কথা বললো না।

সামনে তাকালো কুয়াশা। ঠিক এমন সময় সজাগ হলো তার কান দুটো। ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে পাহাড়ের দিক থেকে। ক্ষীণ চিৎকার উঠছে থেকে থেকে মনুষ্য কণ্ঠের।

কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে অন্ধকার পাহাড়ের দিক থেকে। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। বেশ দূরে আছে এখনও। অন্তত বিশ পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার হবে, কুয়াশার মনে হলো। ব্যস্ত ফার্ণান্দোর দিকে তাকালো সে এবার। কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ফার্ণান্দো। ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করলো কুয়াশা। ডিনামাইট! ফার্ণান্দো ডিনামাইটের পুঁটলিটা খুলে ডিনামাইট এবং প্লানজার যন্ত্রটা বের করছে।

'কি করছো তুমি?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো কুয়াশা।

'দেখতে পাচ্ছো না, কি করছি?' মিটিমিটি হেসে উত্তর দিলো ফার্ণান্দো। উঠে দাঁড়ালো সে এবার সিধে হয়ে কুয়াশার মুখোমুখি। কুয়াশার দু'কাঁধে হাত রেখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সে তার দিকে নিষ্পলক। তারপর ঘাম মুছলো কাঁধের উপর শার্টে মুখ ঘষে।

'ডাকাত ওরা। টাকনা থেকে সরকারী ট্রেন লুট করে ফিরে যাচ্ছে আস্তানায়।' ফিসফিস করে বললো ফার্ণান্দো।

'কি করতে চাও তুমি?'

বন্দী অবস্থায় যখন গুহায় ছিলো সে তখনকার কথা মনে পড়ে গেল কুয়াশার। অনেকগুলো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই রক্তপিপাসু লোকটি। আবার কি করতে চাইছে ও?

'সোনার প্রতি লোভ আছে তোমার?' গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ফার্ণান্দো। কুয়াশার উত্তর শোনার আগেই সে বললো 'আমার মতো তোমারও নিশ্চয় লোভ আছে সোনার প্রতি। ওরা সরকারী ট্রেন থেকে বস্তাভর্তি সোনা নিয়ে আসছে। ওগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি ওদের হাত থেকে।'

ফার্ণান্দোর কথা শুনে কুয়াশার মনে হলো, চাইলেই যেন দিয়ে দেবে সোনার

বস্তা ডাকাতগুলো।

'মামার বাড়ির লোক নাকি? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, খাতির-যত্ন করে তোমাকে দিয়ে যাবার জন্যেই সোনা নিয়ে আসছে ওরা।'

হাসলো না এবার ফার্ণান্দো। গভীর কণ্ঠে বললো, 'না, মামার বাড়ির লোক নয়। নয় বলেই ব্যবস্থা করবো। দিয়ে যেতে চাইবে না সত্যিই, কিন্তু দিয়ে যেতে বাধ্য হবে।' কুয়াশার সামনে থেকে সরে গেল ফার্ণান্দো কথাটা বলে। ডিনামাইট নিয়ে একটা বিরাট পাথরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

চট্ করে এগিয়ে গেল কুয়াশা তার দিকে। 'সাবধান ফার্ণান্দো!' গমগম করে উঠলো কুয়াশার কঠোর কণ্ঠস্বর। চমকে উঠে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো ফার্ণান্দো। হাতের স্টেনগানটায় শক্ত করে চেপে বসলো কুয়াশার আঙুলগুলো। মাটির দিকে মুখ করা সেটা।

'একজন মানুষকেও আঘাত করতে পারবে না তুমি।'

উত্তর দিলো না ফার্ণান্দো। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে। কুয়াশা কিছুটা ধীর গলায় আবার উচ্চারণ করলো, 'মানুষ মারা, বিশেষত অকারণে মানুষ মারা পছন্দ করি না আমি। তোমারও পছন্দ করা উচিত নয়।'

'উচিত নয়!' ধক্ করে জ্বলে উঠলো যেন ফার্ণান্দোর চোখ দুটো চাঁদের নিষ্প্রভ আলোয়। কুঁচকে উঠলো তার মুখটা কি একটা কথা মনে পড়ে যেতে। তারপর হঠাৎ সচেতন হলো সে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো তার মুখ। ছেলেমানুষের মতো খল খল করে হেসে উঠলো ফার্ণান্দো।

'উচিত নয়, মানুষ মারা উচিত নয়। তোমার কথা মেনে নিলাম আমি। মারবো না ওদেরকে। ভয় দেখাবো। তাতেই কাজ হবে।'

আবার লেগে পড়লো ফার্ণান্দো তার কাজে। পাথরটার দু'দিকে দুটো ডিনামাইট বসিয়ে এগিয়ে গেল আর একটি পাথরের দিকে। কিন্তু কুয়াশার মনে হলো, ফার্ণান্দো শেষ পর্যন্ত কথা রাখবে না বা রাখতে পারবে না। এসে পড়েছে ডাকাতগুলো। স্পষ্ট পদশব্দ শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার। চিৎকার করছে থেকে থেকেই লোকগুলো ঘোড়াগুলোকে ঠিক পথে চালাবার জন্যে। সাবধান করছে ওরা পরস্পরকে। লোভে পড়েছে ফার্ণান্দো। যা তা কাণ্ড করে বসবে সে।

'ওরা যে ডাকাত এবং সরকারী ট্রেন লুট করে সোনা নিয়ে ফিরছে তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমার চেয়ে ভালভাবে এখবর আর কেউ জানে না।'

ফার্ণান্দোর উত্তর শুনে কুয়াশা ভাবলো এ লোকটির সঙ্গে কথা বলা বৃথা। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখলো সে। বললো, 'তুমি পাগল, না মাথা খারাপ তোমার,

শুনি? শুনতে পাচ্ছো না, এসে পড়েছে ওরা? তোমার ডিনামাইট বসানোর আগেই।'

'না এসে পড়েনি।' ঘড়ি দেখলো ফার্ণান্দো। তারপর বললো, 'মনে হচ্ছে কাছে এসে পড়েছে ওরা। যদিও ওরা ঠিক আমাদের সামনেই আছে—দু'শো গজ মাত্র দূরে। কিন্তু ওদের সামনে এখন পাহাড়ের দেয়াল। ডান দিকে ঘুরে আসতে হবে ওদেরকে। এইখান দিয়েই যাবে, আর পনেরো মিনিট পর দেখতে পাবো আমরা ওদেরকে।'

নীরব হয়ে গেল কুয়াশা। না, দমানো যাবে না লোকটাকে।

'কি করবো জানো?' ছ'টা বিরাট বিরাট পাথরের নিচে ডিনামাইট বসিয়ে পিছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললো ফার্ণান্দো, 'মাঝখানের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে চতুর্দিকে ডিনামাইট বসাবো। মাঝ বরাবর এলেই প্লানজারে চাপ দিয়ে ফাটিয়ে দেবো সামনের কয়েকটা। ওরা তখন পিছু হটবে। তখন ফাটাবো পিছনেরগুলো। দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে এবার ওরা। দু'পাশেরগুলোও ফাটিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া আমরা দুজনেই পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্টেনগান চালাবো। না না, ওদেরকে মারবো না। আমার প্রতিটি গুলি ওদের শরীরে বাতাস লাগিয়ে আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে যাবে।'

উত্তর দিলো না কুয়াশা। আবার শুরু করলো ফার্ণান্দো তার প্ল্যান ব্যাখ্যা করতে। 'বড় জোর পনেরো জন ওরা। আর ঘোড়া? কম করেও চল্লিশটা। পিঠে সোনার বস্তা চাপিয়ে দিয়ে খুশিতে ডগমগিয়ে আসছে ওরা। দু'চারটে ঘোড়া যখন লুটিয়ে পড়ে ছটফট করবে চোখের সামনে, পালাতে দিশে পাবে না'

এবারও কথা বললো না কুয়াশা। কাজ করতে করতে একবার মুখ তুলে তাকালো ফার্ণান্দো তার দিকে। আবার কাজ শুরু করে প্রশ্ন করলো সে, 'তুমি কি রাগ করেছো আমার উপর, কুয়াশা?'

কুয়াশা বললো, 'একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যর্থ হয়েও তুমি আবার এমন একটি কাজে সময় অপব্যয় করছো, যার দ্বারা কোনো উপকার হবে না সম্ভবত Dr. Kotze-এর।'

থেমে গেল ফার্ণান্দো। কুয়াশার দিকে না ফিরে মাথা নিচু করে বসে কি যেন ভাবলো সে। তারপর বললো, 'তুমি খুব সত্যি কথা বলেছো, বন্ধু। আমি ব্যর্থ হয়েছি। দুঃখিত আমি। আমি···আমি লজ্জিত। মুখ দেখাতে পারা উচিত নয় আমার শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকের কাছে। কিন্তু আমি অন্য একটা উপায় ঠিক করেছি, কুয়াশা। আমার জানা আছে থিসিসটার অংশটুকু কোথায় গিয়ে পৌছুবে। আদায় করবো সেটা আমি ওদের কাছ থেকে। আর সময় অপব্যয় হচ্ছে বললে না? পুষিয়ে নেবো এটুকু সময়।'

একটু চুপ করে আবার কাজে লেগে গেল ফার্ণান্দো অন্যদিকে উঠে গিয়ে। কুয়াশা দুটো ঘোড়াকে একটা পাথরের আড়ালে বেঁধে রেখে ফিরে এলো ফার্ণান্দোর কাছে।

শেষ হয়ে গেল ডিনামাইটগুলো ফিট করার কাজ। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ফার্ণান্দো। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আসলে ডাকাতগুলোর হাত থেকে সোনাগুলো কেড়ে নেয়াটা সৎকাজ, বুঝলে? রাশ রাশ সোনা লুট করে টারাটাকা চলে যায় ওরা—ওদের শহরে। নিরীহ গ্রামবাসীদের যম হয়ে দেখা দেয় এক একজন। মদ, মেয়ে ও জুয়ায় সময় কাটায় যতদিন লুটের মাল থাকে। খুন-খারাপি জুলুম ধর্ষণ করে ওরা ইচ্ছে হলেই। পয়সা শেষ হয়ে গেলেই আবার দল বেঁধে বের হয়ে পড়ে ডাকাতি করতে। টাকার এমন অপচয় আর কোথাও হয় কিনা জানা নেই আমার। কোটিগুণ ভালো কাজে ব্যয় করা যায় ঐ সোনা বেচা টাকাগুলো। পেরুর মুক্তিকামী জনসাধারণকে সাহায্য করা যায়, গরীবদের সাহায্য করা যায়।'

'ঐ সোনা নিয়ে সেই রকম কোনো কাজ করতে চাও বুঝি তুমি?'

কুয়াশার প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ফার্ণান্দো। তারপর কি যেন বলবার জন্যে কুয়াশার দিকে তাকালো সে, ঠিক তখনই ওদের কানে এলো শব্দ—এসে পড়েছে ওরা। ডিনামাইট বসানো পাথরগুলো অতিক্রম করছে ওরা।

'তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় যদি কোনদিন আসে—দেবো আমি।'

ফিসফিস করে কথাটা বলে শক্ত করে ধরলো ফার্ণান্দো ডিনামাইট ফাটাবার চাপ-যন্ত্রটা।

তেরোজন ওরা। পঁচিশটা ঘোড়া। ছোটো ছোটো সাদা কাপড়ের বস্তা ঝুলছে ঘোড়াগুলোর পিঠের দুদিকে। অপেক্ষা করে রইলো ওরা। ঘোড়াগুলোর একেবারে সামনে তিনজন ঘোড়সওয়ার পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। দু'পাশে চারজন করে আটজন চাবুক হাতে নিয়ে সামলাচ্ছে ঘোড়াগুলোকে, যাতে দলছাড়া হয়ে না যায়। পিছনে দেখা যাচ্ছে মাত্র দুজন ঘোড়সওয়ারের মাথা। প্রত্যেকের মাথায় টুপি দেখা যাচ্ছে।

মাঝখান বরাবর জায়গাটায় গোটা দলটা এসে পড়লো দেখতে দেখতে। পরপর দুটো কাজ করলো ফার্ণান্দো। চাপ-যন্ত্রটায় চাপ দিলো সে পরপর তিনবার। সেটা ছেড়েই স্টেনগানটা তুলে নিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে আধা দাঁড়ানো ভঙ্গিতে উঠে গুলি করলো কিছুক্ষণ।

ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো প্রচণ্ড শব্দ শুনে। তারপরই দুটো ঘোড়া গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। লোকগুলো চমকে উঠে থমকে গেল। মুহূর্তের জন্যে

যেন জ্ঞান হারালো তারা। তারপরই সামনের লোক তিনজন লাগাম টেনে ধরে পিছন ফিরলো। দেখাদেখি চিৎকার করে পিছু হটবার জন্যে নির্দেশ দিতে শুরু করলো ভীতত্রস্ত লোকগুলোকে। পিছনের লোক তিনজন ঘোড়ার মুখ ঘোরাবার আগে রাইফেল চালালো আন্দাজ করে। স্টেনগানের শব্দ শুনে গুলি করলো লোক তিনজন। কুয়াশাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল গুলি। ঘোড়াগুলোকে বাগে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু চঞ্চল হয়ে পড়েছে তারা বিপদের গন্ধ পেয়ে। পিঠের উপর সওয়ার নেই বলে কিভাবে তাদেরকে পরিচালনা করতে চায় মালিকরা বুঝতে পারছে না অবলা জানোয়ারগুলো। কোনো কোনোটা সামনে বিপদ ধরে নিয়ে পিছন ফিরছে। কোনো কোনোটা আবার বিচলিত হয়ে সামনের দিকেই ছুটে আসতে চাইছে।

একটু থেমে আবার গুলি করলো ফার্ণান্দো। চমকে উঠলো পিছন ফেরা লোক তিনজন। ঠিক তাদের শরীরের আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল স্টেনগানের কয়েকটা গুলি। লাফাতে শুরু করলো তাদের ঘোড়াগুলো। তাদেরকে বশ মানাবার চেষ্টা কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাদ দিলো লোক তিনজন। সুযোগ বুঝে কয়েকবার গুলি করলো তারা। অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিগুলো কুয়াশাদের সামনের পাথরে লাগলো। পাথরটা না থাকলে ফার্ণান্দোর বুক ভেদ করে বেরিয়ে যেতো কয়েকটা গুলি।

ফার্ণান্দো জানে এদের হাতযশ, তাই প্রতিবার গুলি করার পর বসে পড়ছে সে মাথা নিচু করে।

মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ভীত আর্তনাদ, তাদের সামলাতে তেরো জন বলিষ্ঠ লোকের চিৎকার, স্টেনগান এবং রাইফেলের শব্দে জায়গাটা রীতিমতো ছোটখাট একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো।

মিনিট পাঁচেক পার হয়ে গেল। কিন্তু মাঝখানের জায়গাটা ছেড়ে পনেরো হাতের বেশি পিছু হঠতে পারলো না ওরা। দু'চারটে ঘোড়া ইতিমধ্যে দলছাড়া হয়ে সরে যাবার ফলে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে তাদের। সামনের দিকেই এসে পড়েছিল ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে। ফার্ণান্দো গুলি করে শুইয়ে দিয়েছে সেগুলোকে। পনেরো হাত দূরে পড়ে রয়েছে মৃত ঘোড়াগুলো।

বেশ খানিকক্ষণ গুলি করলো না আর ফার্ণান্দো। কাজ হলো তাতে। ঘোড়াগুলো আশ্বস্ত হলো কিছুটা। তার ওপর কড়া চাবুক খেয়ে বুঝতে পারলো ওরা, কোন্‌দিকে ঘুরতে হবে। দলটা মাঝখানের জায়গাটা থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে দেখে কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

কুয়াশা স্টেনগানটা হাতে নিয়ে দেখছিল চুপচাপ। ফার্ণান্দো চাপ-যন্ত্রটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার গুলির শব্দ পেলেই চাপ দেবে এতে। সাজানো আছে, প্ল্যান মতো ফাটবে। যখনই সঙ্কেত দেবো, একবারের বেশি যেন না পড়ে যায় চাপটা।

কুয়াশাকে কিছু বলতে না দিয়ে বাম দিকে চলে গেল ফার্ণান্দো পাথরের আড়ালে আড়ালে থেকে। স্টেনগানে নতুন ম্যাগাজিন ভরে নিয়েছে সে এক ফাঁকে।

মিনিট খানেক পরই গর্জন শোনা গেল ফার্ণান্দোর স্টেনগানের। চাপ দিলো কুয়াশা যন্ত্রটায়। এদিকে ফার্ণান্দোর স্টেনগানও থামেনি। বাম দিকের ডিনামাইট বসানো পাথরগুলোর একটির আড়ালে বসে গুলি করছে সে।

লোকগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। বেশ খানিকটা বাকি ছিলো পাথরের টুকরোগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছুতে। কুয়াশা যন্ত্রটায় চাপ দিতেই প্রচণ্ড শব্দে ফাটলো পাথরগুলো! ঠিক বলেছিল ফার্ণা[illegible] ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল পুরো দলটা। কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠলো বটে সঙ্গে স[illegible] সেকেণ্ড পরেই দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল লোকগুলো। ঘোড়াগুলো [illegible]গোটায় মত্ত অবস্থায় দাপাদাপি করতে শুরু করলো দিশেহারা হয়ে। পালাবার পথ পাচ্ছে না তারা। একটা যেতে চায় দক্ষিণ দিকে, আর একটা লাফাতে লাফাতে পুব দিকে ছুটতে চাইছে। মাটিতে পড়ে গিয়ে পা ছুঁড়ছে কয়েকটা।

ফার্ণান্দোর সাড়া পাওয়া গেল না মিনিট দুই। ঠিক দু'মিনিট পরই ডান দিক থেকে স্টেনগানের শব্দ হলো। চাপ দিলো কুয়াশা যন্ত্রটায়! এবার প্রচণ্ড শব্দ করে ফাটলো বাম দিকের ডিনামাইটগুলো। ইতিমধ্যে বাম দিকে যে দলটা এগোচ্ছিল তারা পাথরগুলোকে ছাড়িয়ে চলে গেছে খানিকটা। তাদের পিছনে শব্দ হতে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে গেল তারা। গুলি চালাতে চালাতে কুঁজো হয়ে ডান দিক থেকে বাম দিকে দৌড়ুচ্ছে ফার্ণান্দো। আবার বাম পাশে চলে এলো সে। সেখান থেকে পলায়নপর লোকগুলোর উদ্দেশে গুলি করছে। বাম দিকে ছিলো ন'জন লোক। পালিয়ে গেল বলেই মনে হলো তারা। বাকি চারজন সরে গেছে বেশ খানিকটা। ডান দিকের পাথরগুলোর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তারা।

কিছুক্ষণ থেমে আবার ডান দিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করলো ফার্ণান্দো। চুপচাপ বসে রইলো কুয়াশা। এখন যদি যন্ত্রটায় চাপ দেয় সে তবে ঐ চারজন লোকের একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুহূর্তের জন্যে আশ্চর্য হয়ে পড়ার ফলে ফার্ণান্দোর স্টেনগানের শব্দ থেমে থাকলো। আবার শব্দ শুনতে পেলো কুয়াশা। এবার ঐ চারজন লোকও গুলি করছে অনর্গল। ফার্ণান্দো একা। বুঝতে পেরেছে লোকগুলো। চারজন তারা, পিছু হটবে কেন। এগিয়ে আসতে লাগলো এবার ওরা। একটু বিচলিত হলো কুয়াশা পাথরের আড়াল থেকে গুলি করছে ফার্ণান্দো। তার ভয় নেই ততো। কি লোকগুলো না থামলে বাধ্য হয়ে ফার্ণান্দো গুলি করে জখম করবে ওদের।

রাইফেল উঁচিয়ে একপা একপা করে এগোচ্ছে লোকগুলো। স্পষ্ট দেখা যা[illegible] চারটে রাইফেলের চেহারা। চাপ-যন্ত্রটা রেখে দিলো কুয়াশা একপাশে। স্টেনগান তুলে নিলো হাতে।

একনাগাড়ে কয়েক পশলা গুলি করলো কুয়াশা। মৃত্যু ভয় এবারও জাগলো লোকগুলোর মনে। পিছু হটে পালানো ছাড়া উপায় নেই বুঝতে পারলো ওরা। চারজনই প্রাণভয়ে ছুটলো ওরা ডান দিকে। ডানদিক থেকে কোথায় যে গেল তা আর বোঝা গেল না।

ফার্ণান্দো এবার সুযোগ বুঝে স্টেনগানে এক্সট্রা ম্যাগাজিন ভরে নিয়ে ছুটে চলে এলো কুয়াশার কাছে। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো কুয়াশা। তার আগেই ঠিক তার পিছন থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে পড়লো পাথরের গায়ে। চমকে উঠে ওরা দু'জনেই পাথরের অপর দিকে আশ্রয় নিলো। এগিয়ে আসছে বাকি ন'জন। কুয়াশাদের দেখতে পায়নি স্পষ্ট। সতর্ক পায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে ওরা।

'ঘোড়াগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখো তুমি, আমি দেখছি ওদের।'

হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল ফার্ণান্দো পাথরটার আশ্রয় ছেড়ে। মিনিটখানেক লাগলো তার বাম পাশের একটা পাথরের কাছে গিয়ে পৌঁছুতে। প্রথমে গুলি করলো ফার্ণান্দো। তারপরই গুলিবর্ষণ শুরু করলো কুয়াশার স্টেনগান।

ভড়কে গেল লোকগুলো। দু'দিক থেকে অনর্গল গুলিবর্ষণ হচ্ছে। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কোনো পাথরের আড়ালে গা বাঁচানোর উপায় নেই! প্রাণ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে বড় জোর।

দেরি করলো না লোকগুলো। কোনো আশা নেই একথা বুঝতে পেরেছে ওরা। এখন কোনমতে প্রাণটা রক্ষা পেলে হয়। খিঁচে দৌড় মারলো ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে।

ফিরে এলো ফার্ণান্দো কুয়াশার কাছে। সাফল্যের হাসিতে উদ্ভাসিত তার অবয়ব। কুয়াশা ভাবলো—কাজের লোক বটে!

পাঁচ

সকাল হয়ে গেছে।

ঘোড়াগুলো একটার সঙ্গে একটা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ফার্ণান্দো। ব্যাগ খুলে শুকনো মাংস খেয়ে প্রাতঃরাশ সেরেছে ওরা দুজন। ঘোড়ার বাঁধনগুলো আবার একবার পরীক্ষা করলো ফার্ণান্দো।

'সব ঠিক আছে।'

কথাটা বলে চারপাশের দূরবর্তী পাহাড়ের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো সে। বারোজন দুর্ভাগা লোক এক সঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদেরকে। নড়ছে না কেউ। পাথরের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে কুয়াশাদের দিকে। বাকি একজন গেল কোথায়?

'তিন বছরে তিনবার হলো—ভাগ্য মন্দ ওদের। আমি কি করবো।'

'কি বলছো?' কথাটা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলো কুয়াশা।

'গত তিন বছরে তিনবার আমি এইভাবে কেড়ে নিয়েছি ওদের হাত করা জিনিস। প্রথমবার সংখ্যায় ছিলো ওরা পাঁচজন। দ্বিতীয়বার নয়, এবার তো দেখতেই পাচ্ছো—তেরো জন। একজন ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

ঘোড়ার পিঠে সাজানো সোনার বস্তার দিকে একবার তাকিয়ে কুয়াশা প্রশ্ন করলো, 'গত দু'বারও সোনা ছিলো নাকি ওদের কাছে?'

ফার্ণান্দো অবাক হয়ে বললো, 'সোনা না হলে আমি হামলা করবো কেন?'

'খুব লোভ সোনার প্রতি, না? কি করবে এতো সোনা দিয়ে? কবরে নিয়ে যাবে নাকি?'

চুপ করে রইলো ফার্ণান্দো। একটু পর বললো, 'একবিন্দু সোনাও নিজের জন্যে ব্যয় করবো না···'

হঠাৎ থেমে গেল ফার্ণান্দো। সন্দিহান দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো সে, তার অর্ধ সমাপ্ত কথায় কি ভাবছে কুয়াশা।

'থামলে কেন, চালিয়ে যাও,' বিদ্রূপ করে বললো কুয়াশা।

'না। এখনও সময় হয়নি। বলা যায় না, সব কথা আমার বলার বা তোমার শোনার সময় হয়তো কখনও আসবে না।'

'দয়া করে দেরি করো না, তাহলেই হবে। চলো রওনা হওয়া যাক এবার।'

চঞ্চল হয়ে উঠলো এবার ফার্ণান্দো। দূরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে বললো, 'হ্যাঁ, অনেক রাস্তা পেরোতে হবে আমাদেরকে।'

বারোটা মাত্র ঘোড়া জীবন্ত পেয়েছে ওরা। চারটে দল ছেড়ে পালিয়ে গেছে কোন্ দিকে কে জানে। বাকিগুলো মরে পড়ে আছে মাটিতে।'

দুটো ঘোড়ায় চড়ে বসলো ফার্ণান্দো ও কুয়াশা। বাকি দশটায় চাপানো হয়েছে সোনার বস্তাগুলো। দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধেছে ফার্ণান্দো। দড়ির মাথা তার হাতে ধরা। সে ছুটলে ঘোড়াগুলোও ছুটবে পিছন পিছন। দল ছাড়া হবার ভয় নেই।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ফার্ণান্দো একটা জোরালো শিস দিয়ে। দশটা ঘোড়াও ছুটলো তার পিছনে। কুয়াশা থমকে গেল। চিৎকার করে উঠলো সে, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছো ফার্ণান্দো?'

'শর্টকাট রাস্তা। কথা না বলে এসো আমার সঙ্গে সঙ্গে,' হাসতে হাসতে ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিলো ফার্ণান্দো চিৎকার করে।

গতি কমালো না ফার্ণান্দো। কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলতে চাইছিল কুয়াশা। কিন্তু কিছু বললো না সে। ঘোড়ার খুরের শব্দে ফার্ণান্দোর কানে যাবে না তার কথা। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে সে।

কিন্তু স্বস্তিবোধ করলো না কুয়াশা। যে রাস্তা ধরে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল ওরা সে রাস্তা ধরেই কি ফিরে যাচ্ছে? উত্তর দিক বরাবর যাবার কথা এখন ওদের। কিন্তু এটা কি উত্তর দিক? না তো। উত্তর-দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য করে ছুটছে ওরা।

গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লো কুয়াশা খানিকক্ষণের জন্যে। সত্যিই কি শর্টকাট রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফার্ণান্দো তাকে, নাকি অন্য কোথাও যেতে চায় সে?

যুক্তিতর্ক খাড়া করে কুয়াশার মনে হলো—অন্য কোথাও নিয়ে যাবারও যথেষ্ট কারণ এখন থাকতে পারে ফার্ণান্দোর। গতরাতের কথা মনে পড়লো তার। ফার্ণান্দো জানতো কোন্ রাস্তা দিয়ে কতটুকু গেলে ডাকাত দলের সম্মুখীন হবে তারা। ইচ্ছাকৃতভাবেই মোড় নিয়েছিল সে। এ কথা মানতেই হবে যে এ এলাকার পথঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক ফার্ণান্দো। সেটা আরও ভয়ের কারণ। তাছাড়া কুয়াশা ফার্ণান্দো সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে পারছে না কোনমতে। লোকটিকে অবিশ্বাস করতে কোথায় যেন বাধছে তার। ফার্ণান্দো যদি তার শুভানুধ্যায়ী না হতো, তবে অতগুলো মানুষকে হত্যা করে তাকে উদ্ধার করতো না। বৈজ্ঞানিক Kotze-এর লোক সে তাতেও সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। কুয়াশার নাম পর্যন্ত আগে থেকে জানতো সে। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারছে না কুয়াশা লোকটিকে। অসম্ভব শক্তিশালী লোক এ। রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। হাসি লেগে আছে সব সময় ঠোঁট জোড়ায়। গোঁফহীন লম্বা মুখে ছেলেমানুষি সরলতা ফুটে আছে। এমন একটি সুদর্শন এবং কঠোর পরিশ্রমী লোক আবার সোনার লোভে নিজের কর্তব্য পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করছে। কথাটা ভাবতেই যেন কেমন লাগে কুয়াশার। তার ওপর লোকটার হিংস্রতার কথা মনে পড়ে কুয়াশার। আরও কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করলো কুয়াশা। হঠাৎ তার মনে হলো, ফার্ণান্দোকে চিনতে কোথাও সে ভুল করেছে।

বেলা বারোটা।

ঠিক তেমনি ভাবে ছুটছে ওরা। ফার্ণান্দো তুফানের মতো ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। পিছনে ধুলো উড়িয়ে চলেছে দশটা ঘোড়া, তার পিছনে কুয়াশা।

ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টা করছে কুয়াশা সামনের ঘোড়াগুলোকে পেরিয়ে ফার্ণান্দোর কাছে পৌঁছবার জন্যে। কিন্তু রাস্তা জুড়ে চলছে ঘোড়াগুলো। উদ্দেশ্যটা কোনো মতেই সফল হচ্ছে না আর।

কয়েকবার চিৎকার করে ডাকলো কুয়াশা ফার্ণান্দোকে। গতির নেশায় পেয়েছে ফার্ণান্দোকে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঝড় তুলে ছুটছে তার ঘোড়াটা। রুক্ষ বিজন ভূমিতে ঘোড়ার পদশব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে

না। মাথার উপর উঠে এসেছে সূর্য। ঘামছে ওরা। ঘোড়াগুলোর শরীরও সিক্ত হয়ে উঠেছে।

রাস্তাটা হঠাৎ বেশ খানিকটা চওড়া হয়ে গেছে। সুযোগটা গ্রহণ করলো কুয়াশা। ঘোড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছোটালো সে। স্পষ্ট দেখতে পেলো কুয়াশা এবার ফার্ণান্দোকে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে দুর্ধর্ষ লোকটিকে। পাহাড়ের একপাশে গভীর খাদ, অন্য পাশে প্রাচীর। মাঝখান দিয়ে ছুটেছে ফার্ণান্দোর ঘোড়াটা। বাতাসে রুমাল এবং লম্বা চুল উড়ছে ফার্ণান্দোর। লম্বা শরীরটা সোজা হয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। থেকে থেকেই শিস দিচ্ছে সে। মাঝেমাঝে চাবুক কষছে জিভ দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ উচ্চারণ করে।

কাজটা করার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবলো কুয়াশা। অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর নয়—এই মনে করে সিদ্ধান্তটা কাজে পরিণত করার পক্ষে সায় দিলো তার মন।

স্টেনগানটা ভালো করে দেখে নিলো কুয়াশা একবার। দেখতে দেখতে হঠাৎ অদূরবর্তী ফার্ণান্দোর দিকে চমকে উঠে তাকালো সে। তাকিয়ে আশ্বস্ত হলো। ফার্ণান্দো জানতে পারেনি এখনও তার এই নিকট উপস্থিতি। হঠাৎ স্প্যানিশ ভাষায় গান গেয়ে উঠেছিল বলে অমন চমকে উঠেছিল কুয়াশা।

স্টেনগানটা দেখে নিয়ে একহাতে লাগাম কষে ধরে রেখে অন্যহাতে স্টেনগানটার মুখ সামনের দিকে করলো সে। ঘোড়ার গতি একটু বাড়ালো। দশ হাতের মধ্যে চলে যাবার পর ফার্ণান্দো টের পেলো তার উপস্থিতি। গান থামিয়ে হাসিমুখে পিছন ফিরে তাকালো সে কুয়াশার উদ্দেশে।

'স্টেনগান ফেলে দাও!'

চোখ কপালে উঠলো ফার্ণান্দোর কুয়াশার অগ্নিমূর্তি দেখে। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সে। কুয়াশা লক্ষ্য স্থির করছে দেখে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো সে। তার আগেই হাত থেকে ফেলে দিলো স্টেনগানটা।

ফার্ণান্দোর ঘোড়া আচমকা থামতে সতর্ক হলো কুয়াশা। সে-ও লাগাম টেনে ধরে ঠিক সময়মতো ঘোড়া থামিয়ে ফেললো। আর একটু দেরি করলে বিপদ ঘটতে পারতো। ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এলেই ফার্ণান্দো সুযোগ নিতে পারতো কুয়াশার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দূরত্ব বজায় রেখে কুয়াশাকে ঘোড়া থামিয়ে ফেলতে দেখে স্পষ্ট নিরাশার চিহ্ন ফুটে উঠলো ফার্ণান্দোর মুখে। মনে মনে হাসলো কুয়াশা অকস্মাৎ বিপদে পড়েও কুটবুদ্ধি হারায়নি লোকটা।

চোখের দৃষ্টিতে বন্দী রেখে সতর্কভাবে নেমে পড়লো কুয়াশা ঘোড়ার পিঠ থেকে।

'এসবের মানে কি···কি করছো তুমি!'

'কথা নয়। তোমাকে আমি বন্দী করলাম।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ ব্যাখ্যা করতে চাই না আমি,' কুয়াশা গম্ভীর কণ্ঠে বললো। 'তুমি যেমন তোমার মর্জি মতো যাচ্ছিলে যেদিকে খুশি, কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করোনি। তেমনি আমিও আমার কাজের ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নই।'

অবাক গলায় প্রশ্ন করলো ফার্ণান্দো, 'তোমার ধারণা, আমি আমার মর্জি মতো যাচ্ছিলাম যেদিকে খুশি?'

কুয়াশা বললো, 'আমি জানি তুমি কথাটা অস্বীকার করবে। তাই ও সম্পর্কে কথা বলতে চাই না।'

কুয়াশাকে স্থির প্রতিজ্ঞ দেখে একটু যেন অবাক হলো ফার্ণান্দো। বললো, 'তুমি কি আমার চেয়েও ভালো জানো এখানকার পথঘাট? বোকার মতো শুধু শুধু জেদটা বজায় রাখলে কোনদিনই তুমি পৌঁছুতে পারবে না শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকের কাছে।'

কুয়াশা স্টেনগানের মুখ একমুহূর্তের জন্যেও ফার্ণান্দোর দিক থেকে না সরিয়ে বললো, 'না, তোমার চেয়ে ভালভাবে এখানকার পথঘাট চিনি না আমি। আসলে ভালভাবে তো দূরের কথা, পথঘাট চিনি-ই না আমি এখানকার। এবং এ-ও জানি যে তুমি এখানকার রাস্তা সম্পর্কে ওস্তাদ মানুষ। সেজন্যেই তো তোমার উপর আর নির্ভর করতে চাই না।'

'তার মানে! তুমি শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকের কাছে হাজির হতে চাও না নাকি?'

'সেটাই চাই আমি, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখন সেদিকেই যাবো আমরা।'

হাসলো ফার্ণান্দো এতোক্ষণে। বললো, 'আমি যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে তো যাবে না তুমি। কোন্ দিক দিয়ে গেলে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয় তোমার?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো কুয়াশা। তার অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে ফার্ণান্দো। অবশেষে কুয়াশা বললো, 'রাস্তা আমি চিনি না বলেই তোমাকে বন্দী করেছি। এখন আমার কথা মতো শর্টকাট রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে তুমি আমাকে Dr. Kotze-এর কাছে। বুঝলে?'

হাসি থামিয়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো ফার্ণান্দো, 'আমি সঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো বলছো?'

'নিয়ে যেতে বাধ্য তুমি—তুমি এখন আমার হাতে বন্দী একথা ভুলে যেয়ো না।'

ফার্ণান্দো হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো এবার। বললো, 'যে পথে যাচ্ছিলাম সেটা ছাড়া আর কোনো শর্টকাট পথ আমার জানা নেই। এখন কি করবে তুমি!'

ফার্ণান্দোর ডান হাতটা নিশপিশ করছে লক্ষ্য করলো কুয়াশা। কি মনে করে পিছনের ঘোড়াগুলোর দিকে তাকালো সে ঘাড় বাঁকিয়ে। পরমুহূর্তেই এক লাফে একদিকে সরে গিয়ে গুলি করলো সে।

'উফ্!'

ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো ফার্ণান্দো। পকেট থেকে রিভলভারটা অর্ধেক বের করে এনেছিল সে। গুলি লেগে পড়ে গেল সেটা ছিটকে খাদের নিচে।

'শেষবার বারণ করেছি তোমাকে ফার্ণান্দো—আমার সঙ্গে কোনো রকম চালাকি খাটাতে চেষ্টা করো না।'

চুপ করে তাকিয়ে রইলো ফার্ণান্দো কুয়াশার দিকে। খানিকটা দড়ি জোগাড় করে নিলো কুয়াশা। তারপর পিছনে গিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলো ফার্ণান্দোর হাত দুটো।

'আমাকে তুমি চেনো না কুয়াশা। কোনমতে তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবো না আমি। দেখি কি করতে পারো তুমি।'

কুয়াশা নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসলো। পিছনের দশটা ঘোড়ার দড়ি এখন তার হাতে। ফার্ণান্দোর কথা শুনে সে বললো, 'তাহলে স্বীকার করছো তুমি যে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছিলে এতক্ষণ আমাকে?'

একটু চুপ করে থেকে ফার্ণান্দো অদ্ভুত নিরস কণ্ঠে বললো, 'এরপর থেকে একটি কথাও তুমি বলাতে পারবে না আমাকে দিয়ে।'

'ভালো কথা। আমিই চেষ্টা করে দেখি সেই মূল রাস্তাটায় পৌছুতে পারি কিনা। কিন্তু মনে রেখো, তোমাকে এর জন্যে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

নির্বিকার বসে রইলো ফার্ণান্দো অন্যদিকে তাকিয়ে। কুয়াশার কথা যেন শুনতেই পায়নি সে।

ছয়

'এই গফুর, কি দেখছিস অমন করে?'

খামোকা ধমক মারলো কামাল গফুরকে। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো দোষ করেনি সে। তিন হাত দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে কামালের মাথার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

এই নিয়ে দু'বার ধমক খেলো সে। প্রথমবার সরলভাবে একটা প্রশ্ন করেছিল সে তার কামালদার উদ্দেশে? 'তা শোনাও না কামালদা, কেন জংলীরা অমন করে তোমার মাথা কামিয়ে দিলো।'

ভালো কথা মনে করেই জিজ্ঞেস করেছিল সে কথাটা। আসলে জংলীদের কথা ভুলতে পারছিল না সে। পারবেও না জীবনে। যে শাস্তি পোহাতে হয়েছে তা কি জীবনে ভোলা যায়? সে ভেবেছিল তার মতো তো কামালদাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। তা সত্ত্বেও মাথা কামিয়ে দিলো কেন জংলীরা? নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে

এর মধ্যে। সেই কথা মনে করেই প্রশ্ন করেছিল সে। তা, কামালদা যে অমন করে ধমকে উঠবে তা কে জানতো।

প্রশ্নটা শুনেই মারতে এলো কামাল। বললো, 'আবার যদি ওকথা মুখে আনবি তো ধাক্কা মেরে খাদের নিচে ফেলে দেবো, দেখিস।'

সেই থেকে ঐ ব্যাপারে কথা বলেনি আর গফুর। কামালদা ভুলে গেছে ব্যাপারটা, ভাবলো গফুর। তা নয়তো গান গাইছিল কেন একটু আগে। এখনও কিছু বলেনি গফুর। কামালদাকেই একমাত্র ভয় করে সে। সবার কাছে মাতব্বরি চলে, কিন্তু কামালদার কাছে চলে না ওসব। রেগে গেলে বেইজ্জত করে বসবে হয়তো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কামালদার মাথার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সে, কি আশ্চর্য! কেন এমন করলো জংলীরা? কি রহস্য আছে এর ভিতর?

'কি রে, কথা বলছিস না যে?'

থতমত খেয়ে গফুর বললো, 'কই, কিছু দেখছি না তো, কামালদা।'

'দেখছিস না তো যা, সরে যা আমার সামনে থেকে,' রুমাল দিয়ে নেড়া মাথাটা ঢেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললো কামাল। কি মনে করে তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো গফুর।

মহুয়া ব্যাগ থেকে প্লেট বের করে খাবার সাজাচ্ছিল। শুনতে পেয়েছে সে ওদের কথা। চোখ তুলে তাকালো সে গফুরের দিকে একবার। তারপর, আবার কাজে হাত দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'এদিকে আয়, গফুর, স্টোভটা জ্বালিয়ে পানি গরম কর। কফি বানাতে হবে।' কামালের হাঁড়িপানা মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সরে গেল গফুর। কামাল রুমালটা দিয়ে ভালো করে বাঁধতে চেষ্টা করলো এবার মাথাটা।

ভোর চারটের দিকে সৈনিককে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে হাঁটা পথে রওনা হয়েছিল ওরা। প্লেনে যাবার কথা ছিলো ওদের। কুয়াশা হঠাৎ শত্রুর হাতে বন্দী হবার পর অনেক ভেবে চিন্তে পূর্ব পরিকল্পনা বাদ দিলো শহীদ। বৈজ্ঞানিক কোড ব্যবহার করেছিল তার ঠিকানা জানাতে। প্লেনে করে গেলে গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। কুয়াশার কেবিনে একটা ম্যাপ পাওয়া গেল। যেটা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল শহীদ। সাজামো বলে কোনো জায়গার চিহ্ন পর্যন্ত নেই ম্যাপটায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কথাটা। বন্দী হয়ে সৈনিক থেকে নামবার সময় কুয়াশা বলেছিল, 'No man's land!'

ম্যাপটায় নজর ফেলতেই ভেসে উঠলো পাহাড় চিহ্নিত এলাকাটা। ছোট্ট করে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখতে পেলো শহীদ—No man's land!

ম্যাপটা দেখতে দেখতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শহীদ হাঁটা পথে যাত্রা শুরু করবে তারা। প্রথমত গোলমাল হবার ভয় কম এতে। কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে

হবে না। তার উপর কুয়াশাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে পথে সেই পথেই যাওয়া ভালো বলে বিবেচনা করলো সে। পথে হয়তো দেখা হয়ে যেতেও পারে কুয়াশার সঙ্গে।

বেলা ন'টার সময় এক জায়গায় বসে নাস্তা এবং বিশ্রাম দুটোই সেরে নিয়েছে তারা। দশটার সময় আবার যাত্রা শুরু করেছিল। দু'ঘন্টা হেঁটে আবার থেমেছে ওরা মধ্যাহ্ন ভোজন এবং বিশ্রামের জন্যে।

মহুয়া খাবার সাজাচ্ছে। কাছাকাছি একটা ঝর্না থেকে পানি নিয়ে এসে ডান পাশের পাহাড়ের আড়ালে কিসের জন্যে কে জানে গেছে শহীদ অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে। মি. সিম্পসন স্নান করতে গেছেন। লৌহমানব দুটোকে বোঝা টানার ভার দেয়া হয়েছে। পিছনে আছে তারা। আপন মনে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে তারা। ইচ্ছা করেই তাদেরকে পিছনে রেখেছে শহীদ। কুয়াশা যদি পিছনে পড়ে থাকে ঘটনাচক্রে তাহলে হয়তো লৌহমানবের চোখ দিয়ে পিছনের অঞ্চলটা দেখার সময় শহীদ কুয়াশাকেও দেখতে পাবে। তাই একবারের জন্যেও কাছ ছাড়া করেনি শহীদ অ্যাটাচি কেসটা।

'এসো কামালদা, খেয়ে নেই আমরা।'

চোখ বুজে কি যেন ভাবছিল কামাল। মহুয়ার ডাকে চোখ মেলে তাকালো সে। হঠাৎ মহুয়ার দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল কামালের। কুয়াশার জন্যে মন ভালো নেই মহুয়ার। কথা বলছে না সে ভালো করে। হাসি তো একেবারেই উবে গেছে তার মুখ থেকে।

ধীরে ধীরে উঠে পড়লো কামাল। মহুয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে পাশে এসে বসলো কামাল। বললো, 'এখন খাবো না।'

'কেন? ওর জন্যে অপেক্ষা করবে নাকি?' শহীদের কথা ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলো মহুয়া।

'না।'

চোখ বুজে ধ্যান করার মতো দু'হাঁটুতে হাত রেখে কামাল বললো, 'আমি এখন সাধনায় বসছি। কুয়াশার কথা সব বলে দেবো আমি পাঁচ মিনিট পর।'

'দাদার কথা?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো মহুয়া, 'কি বলবে তুমি দাদার কথা?'

'তাকে শত্রুরা বন্দী করার পর থেকে এখন পর্যন্ত কি ঘটেছে সব জানতে পারবো আমি। অপেক্ষা করো, পাঁচ মিনিট।'

শহীদ পাহাড়ের বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়েছিল একা। দূর দূরান্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল সে। কুয়াশাকে দেখতে পাবে মনে করে পাহাড়ের এতোটা উপরে উঠে এসেছে সে। কিন্তু না, যতদূর পাহাড়ের বাধা নেই ততদূর

অবধি বেশ খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে নিরাশ হলো শহীদ। পাহাড় থেকে নেমে আসছিল, কি মনে করে অ্যাটাচি কেসটা খুলে সুইচ টিপলো সে। টেলিভিশনের পর্দায় ছবি ফুটে ওঠার সাথে সাথে আশ্চর্য হলো শহীদ। লৌহমানবদ্বয় খুব বেশি দূরে নেই। কোয়ার্টার মাইল হবে বড়জোর। কিন্তু সেটা আলোচ্য বিষয় নয়। শহীদ লৌহমানবের কাছাকাছি দেখতে পেলো চারটে ঘোড়াকে।

চারটে ঘোড়ার পিঠেই জিন লাগানো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটিতেও আরোহী নেই। ক্লান্ত শ্রান্ত পদক্ষেপে একটা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া চারটে।

সুইচ টিপে লৌহমানবদ্বয়কে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করালো শহীদ। ঘোড়াগুলোর মালিকদেরকে দেখা যাচ্ছে না টেলিভিশনে। তা হোক, মালিক থাকলেও কিছু এসে যায় না। ঘোড়াগুলো শহীদদের দরকার। হাঁটার পরিশ্রম সহ্য করা যাবে না বেশিক্ষণ। এইভাবে শ্লথ গতিতে হাঁটলে অনেক দিন লেগে যাবে বৈজ্ঞানিক Kotze-এর আস্তানায় গিয়ে পৌঁছুতে। ঘোড়াগুলোকে বরং ধরে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ।

লৌহমানবদ্বয়কে পাঠিয়ে দিলো শহীদ ঘোড়াগুলোর কাছে। ধীরে শান্ত পদক্ষেপে ওরা ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছুলো। বিনা কষ্টে ধরে ফেললো ওরা দু'জন দুটো ঘোড়ার লাগাম। কিন্তু অপর দুটো ঘোড়া ভারী চালাক। কাছে ঘেঁষতে দেয় না মোটেও। অনেক চেষ্টা করলো শহীদ। কিন্তু যতো ধীরে কাছে পৌঁছুতে চায় লৌহমানব, ঠিক দেখে ফেললো ঘোড়াগুলো। লাফ দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

কিন্তু ধরা পড়তেই হলো অবশেষে। মোট তিনটে হতেই সন্তুষ্ট হলো শহীদ। বাকি একটির জন্যে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করলো না তার। সেটা বেশ খানিকটা দূরেও চলে গেছে ভয় পেয়ে।

ঘোড়ার লাগাম ধরে চললো লৌহমানবদ্বয় যান্ত্রিক পা ফেলে ফেলে।

অ্যাটাচি কেসটা বন্ধ করে দিয়ে মৃদু হাসলো শহীদ। পাহাড় থেকে নামতে নামতে ভাবলো সে, বেশ তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে সকলকে। কামাল তো চিৎকার জুড়ে দেবে আনন্দে। ও একটু আরামপ্রিয় কিনা।

কিন্তু কামাল এমনিতেই আনন্দে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে এগিয়ে আসছিল শহীদ, এখনো দেখতে পাচ্ছে না সে ওদেরকে! কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে কামালের চিৎকার। গলা ফাটিয়ে গান গাইছে কামাল।

মোড়টা ঘুরতেই চমকে উঠলো শহীদের অন্তরাত্মা। চট করে শরীরটা লুকিয়ে ফেললো সে পাহাড়ের একপাশে। হতভম্ব হয়ে সে দেখলো বারজন কাঠ-গোট্টা গোছের স্থানীয় লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মহুয়ার পিছনে। মহুয়া পিছন ফিরে বসে কি যেন কাজ করছে মাথা নিচু করে। গফুর পাশ ফিরে বসে স্টোভটা পরিষ্কার

করছে। আর কামাল চোখ বন্ধ করে গলা ফাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি আওড়াচ্ছে–বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা…

ওরা কেউই টের পায়নি, ডাকাতের মতো চেহারার বারোজন অপরিচিত লোক নিষ্ঠুরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করলো শহীদ। অ্যাটাচি কেসটা খুলে ফেললো তাড়াতাড়ি। লৌহমানবদ্বয়ের গতি চূড়ান্ত করে দিয়ে আবার বন্ধ করে দিলো সেটা।

কবিতাটা সম্পূর্ণ না করেই চোখ মেললো কামাল। চোখ মেলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো সে। একি দেখলো সে? স্বপ্ন, না সত্যি?

ধীরে ধীরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো কামাল চোখ বন্ধ রেখেই। কিন্তু হাতটা আর বের করতে হলো না তাকে। ঝাঁপিয়ে পড়লো দু'জন লোক তার উপর। এবার আর কোনো সন্দেহই রইলো না কামালের। ঠিকই দেখেছিল সে পলকের জন্যে চোখ মেলে–ডাকাতে ধরেছে ওদেরকে।

শহীদ আগেই লক্ষ্য করেছে লোকগুলোর হাতে ছোরা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেই। কিন্তু তবু সে আড়াল থেকে বের হয়ে এলো না। লৌহমানবের খটখট যান্ত্রিক পদশব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—এসে পড়বে ওরা এখুনি।

একটু আগে কামাল কবিতা পড়ছিল—বিপদে না যেন করি আমি ভয়।

শহীদ দেখলো নিরুপায় ভয়ে চোখ দুটো ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে যেন তার। কাবু করে ফেলেছে লোক দুজন সহজেই কামালকে। ছটফট করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে শহীদের জন্যে। গফুরকে ধরে রেখে দিলো তিনজন মিলে। বাকি সাতজন লোক মহুয়ার সাজানো প্লেটগুলো হাতে নিয়ে খেতে শুরু করেছে গোগ্রাসে। তারই মাঝে সময় করে চকচকে দৃষ্টিতে মহুয়ার আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহুয়া। মুখটা দেখা যাচ্ছে না তার।

প্লেটগুলো শেষ করতে দু'মিনিট লাগলো ওদের। ঠিক এমনি সময়ে লৌহমানবদ্বয়ের আবির্ভাব ঘটলো মঞ্চে। চকিতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো লোকগুলো ভারি পদশব্দ শুনে। ঝন্ঝন্ করে ভাঙলো হাত থেকে প্লেটগুলো পাথরের উপর পড়ে। অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওরা আগাগোড়া দুটো লোহার মানুষকে তিনটে ঘোড়া টেনে নিয়ে আসতে দেখে।

'পিছনে না তাকিয়ে দূর হয়ে যাও যতদূর পারো। তা না হলে প্রাণ হারাতে হবে।'

পাথরের আড়াল থেকে উদ্যত রিভলভার হাতে নিয়ে লোকগুলোর পিছন দিকে এসে দাঁড়ালো শহীদ। যন্ত্রচালিতের মতো পিছন ফিরলো সবকটা লোক। শহীদের হাতে রিভলভার দেখে প্রত্যেকে হাত তুললো মাথার উপর।

'যাও!' গর্জন করে উঠলো শহীদ।

ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালো ওরা কামাল এবং গফুরকে ছেড়ে দিয়ে। ভয়ে ভয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। টকটকে দু'জোড়া লাল চোখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো ওরা। মাথা নিচু করে আড়চোখে লৌহমানবদ্বয়ের তৎপরতা লক্ষ্য করতে করতে হাঁটা শুরু করলো ওরা। লৌহমানবদ্বয়কে ছাড়িয়ে গিয়েই খিঁচে দৌড় লাগালো লোকগুলো। মাইলখানেক দূরে না গিয়ে থামবে বলে মনে হয় না, শহীদ হাসতে হাসতে ভাবলো।

লোকগুলো দূর হয়ে যেতে সংরিং ফিরে এলো ওদের। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে লৌহমানবদ্বয়। কামাল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো কোথায় পাওয়া গেল ঘোড়াগুলো, তার আগেই সব কথা বললো শহীদ। শেষে বললো, 'বিপদে যেন ভয় না পাস তার জন্যে শুনলাম তুই প্রার্থনা করছিস। কিন্তু…'

'জ্বি না।' জোর গলায় বললো কামাল, 'ভয় আমি পাইনি। তাছাড়া আমি প্রার্থনাও করছিলাম না। কুয়াশার ভাগ্যে যা ঘটেছে তাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি।'

বুঝতে পারলো না শহীদ ঠিক কামালের কথা। কামালও ভ্রূক্ষেপ করলো না তার দিকে। মহুয়ার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'ধ্যান করে দেখলাম কুয়াশাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে একদল লোক, আর কুয়াশা মনে মনে গাইছে। বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা….'

'তারপর?' বেশ আগ্রহ সহকারে জানতে চাইলো গফুর। কাছে এগিয়ে এলো সে একটু কামালের। এবার আর রাগ করলো না কামাল। বলতে লাগলো সে, 'একটা গুহায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল কুয়াশাকে। গভীর রাতে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখ মেলে সে দেখলো গুহাটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আর সে কি গোলাগুলির শব্দ! কান পাতা দায় হয়ে পড়লো কুয়াশার। যাই হোক একটু পর ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল সবগুলো শত্রু মরে পড়ে আছে। কেবল তিনজন লোককে জীবন্ত দেখা গেল। এগিয়ে এলো তারা কুয়াশার দিকে। তার বাঁধন খুলে দিলো। তারপর তারা নিজেদের পরিচয় দিলো। বৈজ্ঞানিক Kotze-এর লোক আসলে এরা। কুয়াশাকে মুক্ত করতে এসেছিল।'

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে মহুয়ার মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে দেখতে পেলো কামাল। হাসছে মহুয়া কামালের কথা শুনে। দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করলো আবার সে কুয়াশার ভাগ্যের কথা বলতে।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বললো কামাল। মহুয়া হাসতে হাসতেই কাজ সারছে। নতুন প্লেট বের করে আবার খাবার দেয়ার ব্যবস্থা করছে সে। কামালের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত গলায় বললো সে, 'এখনকার খবর কি বলো তো দাদার?'

'প্লেনে চড়বার জন্যে অ্যারোড্রোমে অপেক্ষা করছে সে।' গুরুমশায়ের মতো কথাটা বলে খেতে শুরু করলো সে। শহীদ বুঝলো ব্যাপারটা। মহুয়াকে আনন্দিত করার জন্যেই হাসিখুশির মধ্যে সময় কাটাতে চাইছে কামাল। হাসতে হাসতে সে বললো, 'কামালের কথায় কোনো সন্দেহ নেই আমার। আমার কল্পনার সঙ্গে ওর দিব্যদৃষ্টি হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

'এসো খেতে বসো এবার।' সহজ, সুস্থ কণ্ঠে কথাটা বললো মহুয়া। মনমরা ভাবটা এখন আর নেই তার মধ্যে। কামাল ও শহীদ না জেনেই এইসব কথা বলছে তা জানে। কিন্তু তাহলেও খুব ভালো লাগলো তার কথাগুলো শুনতে।

সাত

তুফানের মতো আলোড়ন তুলে ছুটছে কুয়াশা। পাশেই রয়েছে বন্দী অবস্থায় ফার্ণান্দো। পিছনে দশটা ঘোড়া।

ঝাড়া একঘন্টা ছুটে থামলো কুয়াশা। ফার্ণান্দো তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তার বিপরীত দিকটা বেছে নিয়েছিল সে। ভেবেছিল যেখানে ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল সেখানে পৌঁছুতে পারবে। কিন্তু ভুল হয়ে গিয়েছিল পথ। আধঘন্টাটাক ছুটেই থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা। দুটো রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের দু'দিকে।

কোন্‌দিক দিয়ে ফার্ণান্দো নিয়ে এসেছিল তাকে স্মরণ করতে পারলো না কুয়াশা। ফার্ণান্দোর দিকে তাকালো সে। নির্বিকার বসে আছে সে ঘোড়ার পিঠে। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখলো না। প্রশ্ন করে লাভ নেই, ফার্ণান্দোকে দিয়ে কথা বলানো যাবে না জানে কুয়াশা। আন্দাজে নির্ভর করে একটা রাস্তা বেছে নিলো সে। ভুল পথটাই দুর্ভাগ্যক্রমে বেছে নিলো সে নিজের অজান্তে। মনে মনে হাসলো শুধু ফার্ণান্দো।

আরো আধঘন্টা ঘোড়া ছুটিয়ে একটা ঝর্না দেখে ঘোড়া থামালো কুয়াশা। বিশ্রাম দরকার।

দু'হাত দিয়ে ধরে ফার্ণান্দোকে নামালো কুয়াশা ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে নিচু ঝর্না থেকে পানি খাবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো। ফার্ণান্দোও এসে বসলো কুয়াশার মুখোমুখি। পানি খাওয়া হলো না কুয়াশার। উঠে গিয়ে খুলে দিলো সে ফার্ণান্দোর হাতের বাঁধন। ফার্ণান্দো ঝুঁকে দু'হাতের আঁজলা ভরে পানি খেলো।

রিভলভারটা হাতে নিলো কুয়াশা। আবার বসলো সে পানি খাবার জন্যে।

এক হাতের চেটো ভরে পানি খেলো সে। দ্বিতীয়বার ঝুঁকতে গিয়েই থমকাল সে। ফার্ণান্দো তার মুখোমুখি বসে নিশপিশ করছে। নির্নিমেষে একজোড়া সন্ধানী দৃষ্টি কুয়াশার দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টায় মগ্ন।

কঠিন চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে তিরস্কার করলো কুয়াশা ফার্ণান্দোকে। তারপর আবার সে ঝুঁকে পড়লো পানি তোলার জন্যে। কিন্তু এবারও পানি খাওয়া হলো না তার। কুয়াশা মাথা নিচু করতে গেলেই ফার্ণান্দোও অল্প একটু ঝুঁকে পড়ে। সুযোগ বুঝলেই ধাক্কা মারবে সে। চিৎ করে দেবে কুয়াশাকে।

বারবার তিনবার একই ব্যাপার ঘটলো। দুজনেই বোবা যেন। শেষবার মৃদু কণ্ঠে কুয়াশা বললো, 'আচ্ছা পাগল তো! পানি খেতে দেবে না নাকি?'

'আমাকে না বেঁধে অসম্ভব।'

হেসে ফেললো কুয়াশা। ফার্ণান্দো কিন্তু নির্বিকার ভাবেই বললো কথাটা।

হাত দুটো না বেঁধে উঠে গিয়ে ফার্ণান্দোর পুঁটলিটা খুললো কুয়াশা। মাংস ছিলো ওতে, গমের রুটিও ছিলো কয়েকখানা। দুটো রুটি এবং মাংস দিলো কুয়াশা ফার্ণান্দোকে। খেতে শুরু করলো ফার্ণান্দো। এই ফাঁকে মুখ হাত ধুয়ে নিলো কুয়াশা।

কুয়াশার খাওয়া শেষ হতে বললো, 'বাঁদর।'

'কি বললে?' কুয়াশা জিজ্ঞেস করলো।

ফার্ণান্দো বললো, 'বাঁদর দেখতে পাচ্ছো না? ঐ দিকের পাহাড়ের দিকে চোখ মেলে দেখো।'

ফার্ণান্দোর কথা শুনেও তখুনি পাহাড়ের দিকে তাকালো না সে। ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করলো ফার্ণান্দোর হঠাৎ এই কথা বলার উদ্দেশ্য। বেশ খানিকটা দূরে বসে আছে সে। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা থাকলেও সফল হবে না সে।

ঘাড় বাঁকিয়ে দূরের পাহাড় সারির দিকে তাকালো কুয়াশা। ঠিকই, পাহাড়ের সর্বত্র বাঁদর দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা আবার তাকালো ফার্ণান্দোর দিকে।

'হঠাৎ বাঁদরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেন তুমি?'

কুয়াশার প্রশ্নের উত্তরে মিটিমিটি হাসলো ফার্ণান্দো। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললো না সে। একটু পর বললো শুধু, 'এদিকে আরো নানা জাতের বাঁদর দেখতে পাওয়া যায় কিনা—তাই।'

কুয়াশা ফার্ণান্দোর বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারলো না। কিন্তু কেন যেন মনে হলো তার ফার্ণান্দোর কথার একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে। রহস্য করে সে বক্তব্য জানালো ফার্ণান্দো। ইচ্ছে করেই আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না কুয়াশা ওকে। উত্তর দেবে না ফার্ণান্দো, সে জানে।

পরিমিত বিশ্রাম নিয়ে ঘোড়ায় চড়লো আবার কুয়াশা। ঘোড়াগুলোর ক্লান্তিও

দূর হয়েছে। ফার্ণান্দোর হাত পা বেঁধে রেখে ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাইয়ে নিয়ে এসেছে সে।

ঘণ্টাখানেক সামনের দিকে এগোবার পর ধু-ধু প্রান্তরের চিহ্ন দেখা গেল। ঘোড়া থামিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে নিলো কুয়াশা। দু'পাশের পাহাড়গুলো কমপক্ষে মাইল চার পাঁচ দূরে হবে। সামনের পাহাড়ের সারির দূরত্ব আরো কম। মাইল তিনেক হবে বড় জোর। উঁচুও অনেক বেশি মনে হলো কুয়াশার। সামনের দিকের পাহাড়েই হয়তো গিরিপথ পেয়ে যাবে ওরা, কুয়াশা আশা করলো। পথ সে হারিয়ে ফেলেছে অনেকক্ষণ আগেই। ডাকাতদের সঙ্গে যেখানে সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে পৌছুতে পারেনি সে। আন্দাজে ভর করে দিকটা ঠিক রেখে এগোচ্ছে সে। ভাগ্য ভালো হলে পেয়ে যেতেও পারে মূল পাহাড়ী রাস্তাটা এইটুকুই যা ভরসা।

গোলক ধাঁধার মতো পথঘাট এখানকার? মূল রাস্তা থেকে হাজারটা শাখা উপশাখা বেরিয়ে গেছে। মূল রাস্তাটা একবার হারিয়ে ফেললে খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অজ্ঞ লোকের পক্ষে খুঁজে বের করা তো আরো কঠিন। ফার্ণান্দোর দিকে একবার তাকিয়ে মুখের ঘাম মুছলো কুয়াশা। হাসছে ফার্ণান্দো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে। মুখ ফিরিয়ে নিলো কুয়াশা। তারপর কষে একটা চাবুক মারলো সে ঘোড়ার পিঠে। টগবগিয়ে ছুটতে শুরু করলো বলিষ্ঠ জানোয়ারটা কুয়াশাকে নিয়ে।

ফার্ণান্দোর ঘোড়াও ছুটলো কুয়াশার পাশাপাশি। তীক্ষ্ণ একটা শিস দিলো ফার্ণান্দো অকারণ আনন্দে। তারপর মৃদু কণ্ঠে একটা গান ধরলো সে। ক্রমশ উঁচু পর্দায় চললো ফার্ণান্দোর গান। ঘোড়া লাফাচ্ছে বলে কণ্ঠস্বর থমকে থমকে যাচ্ছে। কষ্ট করে গাইতে হচ্ছে তাকে। তবু থামছে না সে।

ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে এসে পড়লো ওরা। সামনের পাহাড় সারির দিকে তাকাচ্ছিল কুয়াশা মাঝে মাঝে। মনে মনে ভাবছে সে অনেক কথা। শহীদরা এখন কতদূর এগোতে পেরেছে কে জানে। Dr. Kotze-এর অবস্থা ভালো না মন্দ। ঠিকসময় পৌছুতে পারবে না নাকি সে? গিয়ে যদি দেখে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাহলে আফসোসের সীমা থাকবে না তার। সেক্ষেত্রে এই গোঁয়ার লোকটিকে ছেড়ে দেবে না সে। কঠিন শাস্তি পেতে হবে কুয়াশার হাতে। দেরি করে পৌছবার কারণই হলো লোকটার অসহযোগিতা।

আর এক পা-ও সামনে এগিয়ো না কুয়াশা!

স্পষ্ট সাবধান বাণী শুনতে পেলো কুয়াশা মনের ভিতর থেকে। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়া থামালো সে সঙ্গে সঙ্গে। ফার্ণান্দোর দিকে তাকাতে দেখলো এখনও মিটিমিটি হাসছে সে।

'দেখতে পেয়েছো তাহলে?' দৃপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ফার্ণান্দো।

'কি দেখতে পাবার কথা বলছো?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফার্ণান্দোর দিকে তাকালো কুয়াশা।

'এখনও নজরে পড়েনি তাহলে! ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, একটু পরেই দেখতে পাবে। কিন্তু হঠাৎ তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন হে? বন্দী তো আগেই করেছো, এবার নতুন কিছু করার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?'

কথা বললো না আর কুয়াশা। সামনের পাহাড়ের দিকে আবার তাকালো সে অন্যমনস্কভাবে। আরে কি ব্যাপার? চোখ দুটো ঝলসে উঠলো কুয়াশার আলো পড়ে। পাহাড়ের উপর থেকে কে যেন আলোর সঙ্কেত দেখাচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালো কুয়াশা ফার্ণান্দোর দিকে। হাসছে সে বেপরোয়া ভঙ্গিতে।

'আয়নার সাহায্যে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে ওরা,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো ফার্ণান্দো।

'কারা এরা! কাদেরকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে?'

'পেরুর সরকারী সৈন্য ওরা। আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি তার চতুর্দিকেই ওরা আছে। পেরুর মুক্তিবাহিনীকে গ্রেফতার করার জন্যে জায়গায় জায়গায় ক্যাম্প ফেলে রেখেছে ওরা বহুদিন ধরে।'

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো কুয়াশা চারদিকে। ঠিকই বলেছে ফার্ণান্দো। চারপাশেই সরকারী বাহিনী আছে। লোকজনের চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তবে আয়নার মারফত সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে চতুর্দিক থেকেই।

'কি সঙ্কেত পাঠাচ্ছে ওরা?' কুয়াশা প্রশ্ন করলো।

'মুক্তিবাহিনীর দুটো লোক ওদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। ধরবে না ওরা আমাদেরকে। গুলি করে মারবে দূর থেকে।'

'কিন্তু আমরা কি মুক্তিবাহিনীর লোক?'

'ওরা তাই মনে করছে। এদিকে সাধারণ লোকের যাতায়াত করার কথা নয়, নিষেধ আছে।'

ব্যাগ থেকে বিনকিউলার বের করে একে একে দেখলো কুয়াশা চারটে দিক।

'ওভাবে দেখে কোনো লাভ নেই।' ফার্ণান্দো বললো, 'মৃত্যু অবধারিত ধরে নাও। মোট ছ'টা রাস্তা আছে এই তেপান্তর থেকে বের হবার। সবগুলোই ওরা দখল করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। কোনো উপায় নেই।'

'চ্যাঁচামেচি করো না বলছি, থামো। ভাবতে দাও একটু আমায়,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো এবার কুয়াশা।

'কোনো লাভ নেই হে। ওদের হাত থেকে ফসকে যেতে পারবে না,' ঠাট্টা করে বললো ফার্ণান্দো।

একটু পর কুয়াশা বললো, 'ওরা আমাদেরকে না চিনেই গুলি করবে বলে বিশ্বাস করি না আমি। এ কাজ কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের দ্বারা সম্ভব

নয়।'

'খুবই সম্ভব। কেননা ওরা আমাদেরকে মুক্তিবাহিনীর লোক বলে মনে করছে।'

'শুধু শুধু মক্তিবাহিনীর লোক মনে করবে কেন?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো কুয়াশা।

'শুধু শুধু নয়।' ধীর, গম্ভীর, বিরস কণ্ঠে বললো ফার্ণান্দো, 'ওরা নিশ্চিত হয়েই গুলি করবে। ওরা জানে আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক।'

'তারমানে!' ভ্রূ কুঁচকে চিৎকার করে উঠলো কুয়াশা।

'আশ্চর্য হয়ো না, বন্ধু। আমাকে ওরা দূরবীনের মাধ্যমে দেখে ঠিকই চিনেছে। আমি যে ধরা পড়বো তা ওরা স্বপ্নেও আশা করেনি কখনও।'

'কি বলতে চাও তুমি, ফার্ণান্দো? তুমি কি মুক্তিবাহিনীর লোক নাকি?'

শান্ত কণ্ঠে ফার্ণান্দো বললো, 'মুক্তিবাহিনীর লোক বললে গুরুত্ব কম হয়—আমি পেরুর মুক্তিবাহিনীর অন্যতম মাথা। আমার গর্দানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ আমেরিকান ডলার। এখন বুঝতে পেরেছো তো ব্যাপারটা? আমাকে ওরা ঠিকই চিনতে পেরেছে। আমার সঙ্গে তোমাকে দেখে একটুও সন্দেহ করছে না ওরা—মুক্তিবাহিনীর আর এক পাণ্ডা মনে করছে। গুলি খেয়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ধরে নাও।'

'কিন্তু....' রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লো কুয়াশা। ফার্ণান্দোর দিকে তাকালো সে। বললো, 'তুমি জানতে না আমরা ওদের হাতের মুঠোয় এসে পড়ছি?'

'না। ঠিক এখানে আছে ওরা তা আমি জানতাম না। আমার ধারণা অনুযায়ী এখানে থাকার কথা নয় ওদের। আগে থেকে কোনভাবে খবর পেয়ে গেছে হয়তো ওরা।'

নির্বিকার কণ্ঠ ফার্ণান্দোর। কোনো দুশ্চিন্তা নেই যেন তার। মৃত্যু অবধারিত তা যেন বিনা সন্দেহে মেনে নিয়েছে। হঠাৎ সে রেগে উঠে বললো, 'আমার সঙ্গে অমন বিশ্রী ব্যবহার না করলে এমনটি হতো না। তুমি জানো না, আমি যদি এইসব সোনা আমার মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দিতে পারতাম তার ফল কি হতো, অস্ত্র নেই তাদের, খাবার নেই, শীতের আগমনী সঙ্কেত পাচ্ছি আমি—তাদের পরার মতো কাপড়চোপড়ও নেই। তারা আমার দিকেই আশায় আশায় তাকিয়ে আছে। এই যে ডাকাতদের হাত থেকে সোনা ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা, এ আমার মুহূর্তের সিদ্ধান্ত নয়। বহুদিনের পরিকল্পনা ছিলো এটা আমার। তুমি, তুমি আমাকে ব্যর্থ করেছো। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। মৃত্যুকে ভয় করি না আমি, আমার আনন্দ হচ্ছে এই কথা ভেবে, আমার কথা না মেনে নিজের জেদ বজায় রাখার শাস্তি হিসেবে তোমাকেও আমার সঙ্গে গুলি খেয়ে

মরতে হবে।

এখনও ওরা এগিয়ে আসছে না। কুয়াশা ওদের গতিবিধি দেখছিল দূরবীনে চোখ লাগিয়ে। পাহাড়ের পাদদেশে ঘোরাফেরা করছে ওরা। সবচেয়ে কাছের পাহাড়গুলো সামনের দিকে। ওদিকে যাওয়া চলবে না। পিছনেও নয়। ডান পাশেও রয়েছে ওরা। সুতরাং ডান পাশটাও বাদ। বাম দিকে তাকালো কুয়াশা। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের সারি। বহুদূরে পাহাড়গুলো। ওদিকে যাওয়াও সম্ভব নয়। পাহাড় শুরু হবার আগেই বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড ছড়ানো ছিটানো রয়েছে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে।

'ওদিকে সরকারী বাহিনী নেই বটে, কিন্তু ওদিক দিয়ে বের হবার পথও নেই। দূরে বলে মনে হচ্ছে পাহাড়গুলো ততো উঁচু নয়।'

চিবিয়ে চিবিয়ে বললো ফার্ণান্দো। গায়ের ঝাল মিটছে না তার কোনমতেই। কথার চাবুক মেরে কুয়াশাকে জব্দ করতে চাইছে সে।

কুয়াশা চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়েই চলেছে। ফার্ণান্দোর কথায় কান দিলো না সে।

'একেবারে নার্ভাস হয়ে পড়লে যে হে!' ব্যঙ্গ করলো ফার্ণান্দো, 'খুব তো বাহাদুরি দেখিয়ে বন্দী করে ফেললে আমাকে। এবার যে তুমিই চিৎপটাং!'

ধীরে ধীরে ফার্ণান্দোর দিকে তাকালো এবার কুয়াশা। অমনি চিৎকার করে ফার্ণান্দো বললো, 'তোমার সেই বাহাদুরি গেল কোথায়, উত্তর দাও!'

ফার্ণান্দোর দিকে তাকিয়ে হাসলো কুয়াশা। তারপর বললো ধীর-স্থির কণ্ঠে, 'তুমি মনে করছো তোমার সঙ্গে আমি আছি বলে ওরা আমাকেও গুলি করে মারবে। কিন্তু তা ঘটবে না, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'দিবাস্বপ্ন দেখছো তুমি,' বিদ্রূপ করলো ফার্ণান্দো।

'আমাকে আক্রমণ না করার একমাত্র কারণ হলো...' কুয়াশা মৃদু হেসে কথাটা শেষ করলো, 'তোমাকে আমি বন্দী করেছি ওরা দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেটা।'

ধীরে ধীরে নিভে গেল ফার্ণান্দোর মুখের ব্যঙ্গ ভরা হাসিটুকু। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে শুরু করলো সে।

কুয়াশা বললো, 'ওরা এগিয়ে আসার আগেই তোমাকে নিয়ে আমি ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি। তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিলে ওরা আমাকে পুরস্কৃত করবে, কি বলো?'

একটি কথাও সরল না আর ফার্ণান্দোর মুখ থেকে। নিরাশায় ভেঙে পড়েছে সে ভিতরে ভিতরে। মাটির দিকে চোখ স্থির হয়ে আছে তার। দুশ্চিন্তায় মাথা যেন নুয়ে পড়ছে তার।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ফার্ণান্দোর দিকে তাকিয়ে রইলো কুয়াশা। হঠাৎ মৃদু হাসি

ফুটলো তার ঠোঁটে। ফার্ণান্দোর স্টেনগানটা তার ঘোড়ার পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে। পিছন থেকে স্টেনগানটা খুলে হাতে নিলো কুয়াশা। দ্বিধা না করে ফার্ণান্দোর হাতের বাঁধনও খুলে দিলো সে। তারপর তার ঘোড়াকে দু'কদম এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফার্ণান্দোর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। উদাস এক জোড়া চোখ তুলে তাকালো ফার্ণান্দো কুয়াশার দিকে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফার্ণান্দোর মুখের প্রতিটি রেখার ভাঁজ দেখলো কুয়াশা। একটু আশ্চর্য হলো ফার্ণান্দো কুয়াশার ব্যবহারে।

'কি দেখছো তুমি অমন করে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ফার্ণান্দো। উত্তর দিলো না কুয়াশা। কি যেন পরীক্ষা করছে সে ফার্ণান্দোর মুখের পানে তাকিয়ে।

'মরতে ভয় পাচ্ছি কিনা দেখছো বুঝি?' তেতো গলায় আবার প্রশ্ন করলো ফার্ণান্দো।

'না।'

'তবে?' চিৎকার করে উঠলো ফার্ণান্দো নিরুপায় ক্রোধে।

'এটা নাও। মনে রেখো, আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদের,' স্টেনগানটা ফার্ণান্দোর দিকে বাড়িয়ে দিলো কুয়াশা বিনা দ্বিধায়।

অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেল ফার্ণান্দোর চোখ জোড়া। স্টেনগানটির দিকে তাকালো সে। তারপর তাকালো কুয়াশার হাতের দিকে। ঠাট্টা করছে নাকি লোকটা? ভাবলো সে। স্টেনগানটা নেবার জন্যে আমি হাত বাড়ালেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে সরিয়ে নেবে…। তারপর কুয়াশার মুখের দিকে তাকালো চঞ্চল দৃষ্টিতে। নিলো না স্টেনগানটা।

হাসছে কুয়াশা। হাসতে হাসতেই বললো সে, 'দেরি করো না। রওনা হয়ে পড়বে ওরা এক্ষুণি।'

'কি করতে চাও তুমি?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো ফার্ণান্দো।

'আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।'

'কিন্তু আমাকে যে তুমি বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিলে, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও রেহাই নেই তা জানো?'

'কি করা উচিত তবে আমার?'

ফার্ণান্দো একমুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'আমাকে তুমি বন্দী অবস্থায় ধরিয়ে দিলে তো মরবই, এমনিতেও আমার মৃত্যু কেউ আজ আর আটকাতে পারবে না। আমাকে আত্মরক্ষার সুযোগ করে দিলেও তাতে ফল হবে না কিছু। বরং তোমার পক্ষে সেটা মারাত্মক হবে নিঃসন্দেহে। মরতে যখন আমাকে হবেই তখন আমার কথা হচ্ছে, আমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করো তুমি।'

'অনেক বাচালতা হয়েছে, থামো এবার।'

ধমক মারলো কুয়াশা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে বললো, 'এসো, ওদিকটায় পাথরের টুকরো রয়েছে অনেক। আড়াল পাওয়া যাবে। দেখি কি করা যায়।'

কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো করকর করে উঠলো ফার্ণান্দোর। এরকম মানুষের দেখা পায়নি সে সারাজীবনে। নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভাবে যে লোক, যে লোক অপরাধীকেও প্রাণে-বাঁচাতে চায় সে লোক মহান— মানব সমাজের গৌরব।

আর কোনো অবিশ্বাস নেই ফার্ণান্দোর। কুয়াশাকে চিনতে পেরেছে সে। আগে ভুল করেছিল সে মানুষটাকে চিনতে। ঘোড়া ছুটিয়ে কুয়াশার পাশে চলে এলো ফার্ণান্দো। কুয়াশা আশ্বাসের হাসি হাসলো তার দিকে তাকিয়ে। স্টেনগানটা বাড়িয়ে দিলো ফার্ণান্দোর দিকে। সেটা হাতে নিয়ে ফার্ণান্দো নিষ্পলক দৃষ্টিতে কুয়াশার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করো, কুয়াশা।'

'কেন, তুমি আবার কখন কি অপরাধ করলে?' কুয়াশা হাসতে হাসতে বলে কথাটা।

ফার্ণান্দো বললো শুধু, 'আমি অনুতপ্ত, কুয়াশা।'

কুয়াশা বললো, 'একজন ভালো লোকও ভুল করতে পারে, ফার্ণান্দো, তাকে ভুল শোধরাবার সুযোগ দেয়া উচিত। এর বেশি তোমার জন্যে আর কিছু করিনি আমি। আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে ছোটো করো না।'

ফার্ণান্দো কুয়াশার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'আজ থেকে আমরা বন্ধু।'

'নিশ্চয়!' হাসলো কুয়াশা ফার্ণান্দোর উচ্ছ্বাস দেখে। মনে মনে ভাবলো সে, লোকটা অসাধারণ।

আট

পাথরের খণ্ডগুলোই আসলে এক একটা ছোটখাট পাহাড় যেন। জায়গাটা পছন্দ হলো ওদের। ঘোড়াগুলোকে বেঁধে কাজে লেগে গেল ওরা। কুয়াশা মানা করেছিল, কিন্তু ফার্ণান্দো যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে রাজি করালো তাকে ডিনামাইট সেট করার ব্যাপারে। ফার্ণান্দো একাই করলো সব।

সোনার বস্তাগুলো ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে থাক থাক করে সাজালো ফার্ণান্দো। ডিনামাইট ফিট করেছে সে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পাথরের গায়ে। দরকার হলে ফাটাবে সেগুলো। শেষ পর্যন্ত ফার্ণান্দোর প্ল্যানটা ভালোই লাগলো কুয়াশার। সবকটা পাথর ফাটিয়ে দিলে সরকারী বাহিনী পাথরের স্তূপ পেরিয়ে কোনো দিন আসতে পারবে না সামনে। পাথরের টুকরো তো নয়, ছোটখাট পাহাড় এক একটা। চারপাঁচটা ফাটাতে পারলেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

পাথরগুলোয় ডিনামাইট ফিট করে পিছিয়ে এলো ওরা নিরাপদ দূরত্বে। সোনার বস্তাগুলো থাক থাক করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এবার স্টেনগান দুটোয় গুলি ভরলো সে। তারপর দুজনেই বসে পড়লো মুখোমুখি। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

ধীরে ধীরে কথা বলছিল ওরা। এখানকার রাস্তাঘাট সম্পর্কে অনেক তথ্য বললো ফার্ণান্দো কুয়াশাকে। Dr. Kotze-এর কাছে প্লেনে করে যাবার কথা বলতে ফার্ণান্দো বললো, সেটাই ভালো হবে। আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে ম্যাকুয়েগু শহরটা মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। পশ্চিমদিকের পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফার্ণান্দো বললো, 'সরকারী বাহিনীর কাছে খুব বেশি ঘোড়া নেই। থাকলে বড়জোর দু'চারটি। পায়ে হেঁটে আমাদের ধরতে চেষ্টা করবে ওরা। ঐ দিকের পাহাড়ের দিকেই যেতে পারলে ভালো হয়। শহরে যাবার সহজতম রাস্তাটা হলো ঐ দিকেই। কিন্তু রাস্তার মুখ দখল করে বসে আছে ওরা।

কুয়াশা বললো, 'শহরে গিয়ে অ্যারোড্রোমটা কোন্‌দিকে পড়বে?'

'শহরে ঢুকতে হবে না আমাদেরকে। পাহাড় ছাড়িয়েই পিচ ঢালা রাস্তা পেয়ে যাবো। সেটা ধরে সোজা তিন মাইল গেলেই অ্যারোড্রোম।'

'কোথায় নামবো আমরা প্লেন থেকে?'

'টিটিকাকা শহরে।'

'সেখান থেকে কোন্‌দিকে যেতে হবে?'

ফার্ণান্দো বলে গেল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈজ্ঞানিক Kotze-এর ঠিকানায় পৌঁছুতে হলে কোন্ কোন্ রাস্তায় যেতে হবে। ইলামাপো বলে একজন লোকের নাম উল্লেখ করলো সে। তার কাছে এক্কা গাড়ির ব্যবস্থা আছে। ফার্ণান্দোকে লোকটা ভালো করে চেনে। তার নাম শুনলেই কেঁপে অস্থির হবে লোকটা।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা শুরু করলো ফার্ণান্দো। এক মুহূর্তের জন্যেও চুপ থাকতে পারছে না সে। নিজের কথা, দেশের কথা, দেশের আপামর জনসাধারণের কথা অনর্গল বলে গেল সে। দেশকে সে মুক্ত করবে জুলুমবাজদের হাত থেকে।

সবশেষে বল ফার্ণান্দো বৈজ্ঞানিক Kotze-এর সম্পর্কে। 'তাঁকে আমি ভয় করি। সম্মান করি, তিনি আমার গুরু। আমার ধর্ম পিতা।' শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠলো ফার্ণান্দোর কণ্ঠ। 'তিনি জানেন না এখনও আমার আসল পরিচয়। সব কথা বলার সুযোগ পাইনি আমি এখনও।'

কুয়াশা প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কিভাবে?'

'সে এক সাধারণ ঘটনা। আমার পিছনে সরকারী বাহিনী লেগেছিল। একশো মাইল পর্যন্ত তাড়া করে এসেছিল আমার পিছনে পিছনে শিয়ালগুলো। কোথায় লুকাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি। হঠাৎ দেখলাম পাহাড়ের নিচে সবুজ একটা বাগান। আশ্চর্য লাগলো আমার। অঞ্চলটা আমার কম বেশি পরিচিত, কিন্তু সবুজের নাম নিশানা দেখিনি কখনও। কৌতূহল হলো বাগানটা দেখে। পাহাড় থেকে নেমে অনেক কষ্টে পৌঁছুলাম সেখানে।' হঠাৎ চুপ করে গেল ফার্ণান্দো। সিধে হয়ে বসে উত্তেজিত গলায় বললো সে, 'আরে! একজন লোক পাঠাচ্ছে দেখছি ওরা!'

বস্তার ফাঁক দিয়ে তাকালো কুয়াশা। মোটা একজন লোক হেঁটে আসছে এদিকে। দূরবীনটা নিয়ে দেখলো কুয়াশা লোকটাকে। একটা হাত পিছনে লোকটার। অপর হাতটি খালি দেখা যাচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে আছে এখনও লোকটা।

ফার্ণান্দো দূরবীনটা কুয়াশার হাত থেকে নিয়ে চোখে লাগালো। লোকটাকে দেখেই সে বললো, 'আশ্চর্য!'

কুয়াশা প্রশ্ন করলো, 'কি আশ্চর্য!'

'লোকটা কে জানো? আসমুত ফান্দো ওর নাম। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আজ দুবছর হলো পালিয়েছিল ও।'

কুয়াশা বললো, 'ও লোকটা আমাদের খোঁজ পেলো কিভাবে?'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে ফার্ণান্দো বললো, 'বুঝতে পেরেছি এবার। আসলে ডাকাতদের দলে এই ফান্দোও ছিলো। মনে আছে তোমার কুয়াশা, সকাল হলে বারোজন ডাকাত দেখেছিলাম আমরা? ভেবেছিলাম বাকি একজন পালিয়েছে। তা নয়, আসলে এই ফান্দোই সেই লোকটা, সরকারী বাহিনীকে খবর দিয়ে সেই আনিয়েছে এদিকে। তা নয়তো ওদের এদিকটায় পাহারা বসাবার কথা নয়।'

লোকটা এগিয়ে আসছে দ্রুত। তৈরি হয়ে বসে রইলো ওরা।

'কেন আসছে ও একা?' কুয়াশা বললো।

'ওকে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জানাতে।'

'কিন্তু ওর একটা হাত পিছন দিকে কেন বলো তো?'

'লক্ষ্য করেছি ব্যাপারটা আমিও। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিক ব্যাপারটা।'

এসে পড়লো লোকটা ওদের পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। ঐ পর্যন্ত এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে। কেন না ফার্ণান্দোর গলা দিয়ে গুরু গম্ভীর শব্দ বের হলো, 'আর এক পাও এগিয়ো না, ফান্দো। কেন এসেছো বলো ওখান থেকে।'

বিচলিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো ফান্দো। দারুণ ভীতি পেয়ে বসেছে তাকে। ফার্ণান্দোর সামনে সে আসতে চায়নি। কিন্তু সরকারী বাহিনীর ক্যাপ্টেন রিভলভার উঁচিয়ে আদেশ করেছে বলে না এসেও উপায় ছিলো না তার। মৃত্যু

অবধারিত, তা জেনেই আসতে হয়েছে তাকে।

'ক্যাপ্টেন মান্দা তোমাদেরকে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়েছে।'

ফার্ণান্দোর কানে কথাটা যাওয়া মাত্র স্টেনগানের ট্রিগার টিপলো সে।

বিপদটা বুঝতে পেরেছিল ফান্দো আগেই। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়তে গেল সে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না বেচারা। গুলি লাগলো গিয়ে তার পাঁজরে। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু মাটিতে পড়তে পড়তেই হাতটা উপরে তুলে ছুঁড়ে মারতে গিয়েছিল হাত বোমাটা। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা গিয়ে লাগলো ঠিক তার বোমা ধরা হাতটাতে। হাত থেকে ছুটে গেল বোমাটা। সামনের দিকে না এসে পিছনের দিকে গিয়ে ড্রপ খেলো। প্রচণ্ড শব্দে ফাটলো সেটা সঙ্গে সঙ্গে।

ধোঁয়ার মেঘ সরে যাচ্ছিলো আস্তে আস্তে। চমকে উঠে কুয়াশা ধরে ফেললো ফার্ণান্দোর একটি হাত। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সে ফার্ণান্দো গুলি করে মারবে লোকটাকে। কিন্তু তার আগে আরেক কাণ্ড করে বসেছে সে।

ধোঁয়ার মেঘ সব সরে যাবার আগেই প্রচণ্ড শব্দ হলো একটা ডিনামাইট ফাটার। তারপর পরপর ফাটলো কয়েকটা মিনিটখানেক সময় নিয়ে।

সামনের দিকটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ছোটখাট পাহাড়ের মতো পাথরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে উঠে পড়লো শূন্যে। সশব্দে আবার পড়লো সেগুলো একটু দূরে। এইরকম তাণ্ডবলীলা ঘটতে লাগলো ওদের চোখের সামনে। ফান্দোকে গুলি করেই প্লানজারে চাপ দিয়ে বসেছে ফার্ণান্দো। সবকটা ডিনামাইট ফেটে গিয়ে অসংখ্য পাথরের চাঙ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে স্তূপ হয়ে গেল সামনের দিকটায়।

ধোঁয়া সরে যেতে কুয়াশা বললো, 'লোকটাকে তুমি গুলি করবে জানতাম না আমি, ফার্ণান্দো। আর ডিনামাইটগুলোই বা ফাটালে কেন?'

ফার্ণান্দো বললো, 'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি, কুয়াশা, ফান্দোকে নিজের হাতে শাস্তি দেবো।'

কুয়াশা তখনই আর কিছু বললো না। একটু পর ফান্দোর লাশটার দিকে একবার তাকিয়ে সে বললো, 'সেটা অবশ্যি তোমার নিজের ব্যাপার। কিন্তু তোমার একটা দুর্বলতার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। বিরোধী মনোভাবের লোক দেখলেই তোমার মাথায় খুন চেপে যায়। হত্যা করতে ইচ্ছা জাগে তোমার। এটা উচিত নয়। যদি সম্ভব হয় তবে এই রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো। আমার আর কিছু বলার নেই।'

কুয়াশা থামতে ফার্ণান্দো বললো, 'তুমি নমস্য ব্যক্তি, কুয়াশা। সত্যিসত্যি আমিও অনুভব করেছি ব্যাপারটা। নিজেকে সামলাতে পারি না আমি। যাক, আজ থেকে তোমার উপদেশ শিরোধার্য করলাম আমি।'

কুয়াশা এবং ফার্ণান্দো দুজনেই এ ব্যাপারে আর কথা বললো না।

সরকারী বাহিনী এখনও এগিয়ে আসছে না। সিগারেট ধরিয়ে গল্প করছিল ওরা। ফার্ণান্দোই কথা বলছিল বেশি। নিজের বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী শুনিয়ে কুয়াশাকে সত্যিসত্যিই মুগ্ধ করে দিলো সে।

সরকারী বাহিনীর লোকগুলো এগিয়ে না আসার কারণ আছে। মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটতে দেখে তারা ঠিক বুঝতে পারছে না শত্রুরা বেঁচে আছে কি না।

হাসছিল ফার্ণান্দো। তার প্রেমিকার কথা বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো সে। কুয়াশাও মৃদু মৃদু হাসছিল ফার্ণান্দোর দিকে তাকিয়ে।

ফার্ণান্দোর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো কুয়াশা। হঠাৎ থেমে গেল ফার্ণান্দোর হাসি। কপালে একটা লাল বড় টিপ পরিয়ে দিলো কেউ যেন। মুখটা হাসছিল ভাঁজ তুলে। নিভাঁজ হয়ে গেল তখুনি। শুধু বড় বড় দুটো চোখ চেয়ে আছে কুয়াশার চোখের মধ্যমণির দিকে।

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো কুয়াশা পিছন দিকে। ফান্দো নামের লোকটিকে দেখতে পেলো সে। হাতে তার একটি রিভলভার। প্রথম গুলিটা ঠিকই মারতে পেরেছে সে স্থিরভাবে। দ্বিতীয়বার মারার চেষ্টা করছে কুয়াশাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু জখম শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে ঠিকমত।

পাঁচ সেকেণ্ড ধরে গুলি করলো কুয়াশা লোকটির বুক লক্ষ্য করে। ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুক।

'ফার্ণান্দো!'

কোলে তুলে নিলো কুয়াশা ফার্ণান্দোর মাথাটা। কথা বলবে না আর ফার্ণান্দো, বুঝতে পারলো কুয়াশা। মারা গেছে লোকটা। ঠিক কপালের মধ্যে দিয়ে গুলি ঢুকেছে।

তিনমিনিট অবিশ্বাস ভরে তাকিয়ে রইলো কুয়াশা ফার্ণান্দোর মুখের দিকে। লোকটা যে মারা গেছে এটা জেনেও যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

নয়

গুলির শব্দ শুনে সরকারী বাহিনী সচেতন হয়ে পড়লো। চারদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখলো কুয়াশা ওদেরকে।

পালানো দরকার। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোন্‌দিক দিয়ে? আর ফার্ণান্দোর কি হবে?

মিনিটখানেকও সময় নিলো না কুয়াশা কাজে লেগে পড়তে। ফার্ণান্দোকে

পাঁজাকোলো করে তুলে নিয়ে গেল সে টুকরো টুকরো পাথরগুলোর কাছে। মাটিতে শুইয়ে দিলো সে লাশটা। তারপর একটার পর একটা পাথর তুলে লাশটার আপাদমস্তক ঢেকে দিলো সে।

ফিরে এলো কুয়াশা এবার ঘোড়াগুলোর কাছে। পিছন ফিরে দেখলো সরকারী বাহিনী ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসছে এদিকে। ফার্ণান্দো বলেছিল ওদের কাছে ঘোড়া থাকলেও দু'চারটে আছে। কিন্তু একটি ঘোড়াও দেখতে পেলো না কুয়াশা। সাদা পোশাক সরকারী বাহিনীর, মাথায় ক্যাপ। হাতে রাইফেল। অনেকটা দূরে আছে এখনও ওরা।

সোনার বস্তাগুলো ফেলে রেখে যাবে ভেবেছিল কুয়াশা। কিন্তু ফার্ণান্দোর কথা ভেবে সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো সে। এই সোনা কোনো সৎ কাজে ব্যয় করা উচিত। ফার্ণান্দোর আত্মা সন্তুষ্ট হবে তাতে।

ঘোড়ার পিঠে বস্তাগুলো চাপালো কুয়াশা। ভালো করে বাঁধলো। বারবার পরীক্ষা করলো বাঁধনগুলো। তারপর একটা সামান্য উঁচু পাথরের উপর চড়ে পশ্চিমদিকের পাহাড়ের দিকে তাকালো সে।

ফার্ণান্দো রাস্তাঘাট সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য দিয়ে গেছে কুয়াশাকে। পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরে যেতে হবে কুয়াশাকে। কিন্তু পশ্চিম দিকেও সরকারী বাহিনী ওঁৎ পেতে আছে। একদল এগিয়ে আসছে। আর একদল রাস্তা পাহারা দিচ্ছে।

আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো কুয়াশা কতটা দূরে সরিয়ে দিতে পারলে একছুটে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে রাস্তাটা। দূরবীন চোখে লাগিয়ে গিরিপথটা দেখে নিলো সে। অঙ্ক কষতে শুরু করলো সে মনে মনে। মাঠের সিকি ভাগ যাবার আগেই ওরা দেখে ফেলবে, শত্রু পালাচ্ছে। ধরা যাক, সিকি মাইল দূরে থাকছে তখন ওরা পশ্চিম দিকের ঐ গিরিপথের মুখ থেকে। সিকি ভাগ মাঠ অতিক্রম করার পর সামনে থাকবে কম করেও চার মাইল লম্বা মাঠ। ওদের সিকি মাইল আর আমার চার মাইল। ওদের পায়ে হাঁটা, আর আমার ঘোড়ায় ছোটা। ইউরেকা।

পাথরটার উপর থেকে নামলো না কুয়াশা। দেখতে দেখতে চোখ দুটো তার ভাঁটার মতো টকটকে লাল এবং বড় বড় হয়ে উঠলো। অনড় দাঁড়িয়ে আছে তার শরীরটা বুক টানটান করে। কিন্তু খানিকক্ষণ পর ঠোঁট জোড়া কাঁপতে লাগলো তার। তারপর নড়তে লাগলো, যেন কার উপর হুকুম জারি করছে সে। কিন্তু ঠোঁট জোড়া নড়ছে শুধু, কোনোই শব্দ নেই!

সফল হলো কুয়াশা। পশ্চিম দিক থেকে যে দলটি আসছিল এইদিকে তারা তালে তালে পা ফেলে মোড় নিলো। দক্ষিণ দিকের দলটির দিকে এগোলো তারা। পশ্চিম দিকের গিরিপথ ছেড়ে দক্ষিণ দিকের গিরিপথের দিকে রওনা দিলো বাকি অংশটি, যারা পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলো।

ঝাড়া দশ মিনিট ধরে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলো কুয়াশা। সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। সার্থক হতে চলেছে তার প্ল্যান। ভেন্ট্রিলোকুয়িজম-এর ধাঁধায় ফেলে গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করছে কুয়াশা সরকারী বাহিনীকে।

দশ মিনিটই যথেষ্ট। অনেকটা সরে গেছে ওরা। এই সুযোগ। ধাঁধাটা আবিষ্কার করে ফেললে আর কোনো উপায় থাকবে না। এখন যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ঝড়ের বেগে পলায়ন-পর্ব শুরু করা।

ছুটে চলে এলো কুয়াশা ঘোড়াগুলোর কাছে। বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে। কুয়াশা নিজের ঘোড়াটায় না চড়ে ফার্ণান্দোরটায় চড়ে বসলো। তুফানেরও আগে আগে ছুটতে পারে ঘোড়াটা।

ঘোড়ায় চড়ে বসেই হাতের দড়িটা ধরে হেঁচকা টান দিলো কুয়াশা। সচকিত হলো বস্তা বোঝাই ঘোড়াগুলো। তারপর কষে একটা চাপড় মারলো কুয়াশা ঘোড়ার পিঠে।

তীরের মতোই ছুটলো ঘোড়াটা পশ্চিমদিকের গিরিপথ লক্ষ্য করে। দড়ির টান পড়তেই বাধ্য হয়ে সমান গতি বজায় রেখে ছুটতে হলো পিছনের ঘোড়াগুলোকে। এক মুহূর্তে দমকা ঝড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছে যেন মাটির উপর দিয়ে। এই আছে এই নেই। পিছনে ধুলোর ঝড় তুলে তীব্রবেগে ছুটলো কামানের কয়েকটা বড় বড় গোলা যেন।

নির্ভুল হিসেব করেছিল কুয়াশা। সিকিভাগ মাঠ পেরোবার পরই শত্রু পালাচ্ছে বুঝতে পারলো ওরা। অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করার জন্যে ছুটলো ওরা। দক্ষিণ দিকের শেষ কোণেও শত্রু পালাবার খবর পৌঁছে গেছে বুঝতে পারলো কুয়াশা। কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এতক্ষণে দেখা গেল। আড়াআড়ি ভাবে পশ্চিম দিকের গিরিপথ আটকাবার জন্যে এগোচ্ছে ওরা।

চরম গতিতেই ছুটছে কুয়াশার ঘোড়া। এর চেয়ে বেশি জোরে ছোটানো সম্ভব নয়। হিসাব করে একটু নিরাশ হয়ে পড়লো কুয়াশা। গিরিপথ থেকে কুয়াশার বর্তমান দূরত্ব যা তার চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করলেই সরকারী বাহিনীর ঘোড়সওয়ারেরা ঐ জায়গায় পৌঁছে যাবে। ওদের গতি কুয়াশার সমান নয় এই যা একটু ভরসার কথা। কিন্তু খুব একটা দুর্বলও নয় ওদের ঘোড়াগুলো।

দূরত্ব যতো কমে আসতে লাগলো ততই শঙ্কিত হয়ে উঠলো কুয়াশা। আগে পৌঁছে গিরিপথ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া অসম্ভব। একই সঙ্গে গিরিপথের কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারা যাবে বড় জোর। তার মানে যুদ্ধ। ভয়ঙ্কর একটা ফয়সালার প্রশ্ন দেখা দেবে সেক্ষেত্রে। ওরা চারজন মিলে আক্রমণ করবে। কুয়াশা একা। তাছাড়া ওরা যদি একটু আগে পৌঁছুতে পারে গিরিপথমুখে তাহলে পাথরের আড়াল থেকে গুলি করার সুযোগ পাবে। তাই যদি হয় তবে আর প্রাণের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কুয়াশা বুঝতে পারলো সামান্য একটু দূরত্ব অতিক্রমের উপরে নির্ভর করছে তার জীবন। দেরিতে পৌছুলে মৃত্যু তার কেউ-ই রুখতে পারবে না। আগেই পৌছুতে হবে তাকে। কিংবা তা যদি একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত ওদের একই সঙ্গে পৌছুতে হবে। তারপরও সংঘর্ষ ঘটবে একটা ভয়ঙ্কর। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে জয়ী হবে সে। নয়তো···

এসে পড়েছে কুয়াশা গিরিপথের সামনে। বিরোধীদলও এসে পড়েছে। একই সঙ্গে পৌছেছে ওরা গিরিপথের কাছে।

রাইফেল গর্জে উঠলো প্রথমে ওদের তরফ থেকেই। ঘোড়ার পিঠের উপর শুয়ে পড়লো কুয়াশা পা দুটো যথাযথ ঝুলিয়ে রেখে। স্টেনগানটা হাতেই ধরা আছে তার। কিন্তু ওদের গুলির বদলে তখুনি গুলি করলো না সে। করলো আরও দশ সেকেণ্ড কেটে যাবার পর। মাত্র একশো হাত দূরে তখন চারজন ঘোড়সওয়ার।

লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টেপার জন্যে সময় লাগলো তিন সেকেণ্ড। এই তিন সেকেণ্ড এবং গুলি লেগে জখম হবার পরও ঘোড়াগুলো পড়লো মাটিতে আরো তিন সেকেণ্ড পর—মোট ছ'সেকেণ্ডে দু' তরফের গতির পরিমাপ হলো পঞ্চাশ হাত। মাটিতে পড়েও ছিটকে আরো খানিকটা সামনে গড়িয়ে এলো ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারেরা। কুয়াশার দশ হাত দূরে এসে পড়লো একজন লোক। ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল কুয়াশা ওদেরকে পিছনে ফেলে।

রাইফেলের শব্দ হলো তারপরও পিছন থেকে। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। ধুলোয় ওদের সামনেটা অদৃশ্য এখন।

গিরিপথ ধরে ছুটে চললো বিজয়ী বীর কুয়াশা। পিছন থেকে তাড়া করার ভয় নেই এখন আর। চারটে ঘোড়ারই পা খোঁড়া করে দিয়েছে সে।

ফার্ণান্দোর কথামতো একটা হ্রদ দেখতে পেলো কুয়াশা। কি করবে ভেবে ফেলেছিল সে। ঘোড়ার উপর থেকে সোনার বস্তাগুলো নামিয়ে হ্রদের পানিতে ডুবিয়ে দিলো সে। জায়গাটা ভালো করে চিনে রাখলো।

ঘোড়াগুলোকে ছাড়লো সে অ্যারোড্রোমের কাছাকাছি একটা জঙ্গল মতো জায়গায় এসে।

অ্যারোড্রোমে ঢোকার আগে একটা সেলুন খুঁজে বের করলো কুয়াশা। দাড়ি কামালো প্রথমে। সেখান থেকেই খোঁজ পেলো একটা হোটেলের। হোটেলে গিয়ে খাওয়াদাওয়ার আগে বখশিশের লোভ দেখিয়ে স্নান সারলো সে। হোটেলটা আবাসিক নয়। বয়কে রেডিমেড কাপড়ের দোকানে টাকা এবং যথাযথ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে খেতে বসলো সে। পেট ভরে খেয়ে উঠতেই বয় ফিরে এলো কাপড় চোপড় নিয়ে। একঘণ্টা পর হোটেল ম্যানেজারের খাস রুম থেকে বের হলো কুয়াশা ফিটফাট সাজে সজ্জিত হয়ে। সোনার বড় সাইজের একটা টুকরো পেয়ে

হোটেল ম্যানেজার বিনয়ে বিগলিত হয়ে জানতে চেয়েছিল কোথায় পৌঁছে দিতে হবে তাকে। কুয়াশা ঠাট্টা করে বললো ঢাকায় পৌঁছে দিতে পারবে?

বোকার মতো তাকিয়ে রইলো লোকটা কুয়াশার মুখের দিকে। ঢাকার নাম শোনেনি সে জীবনে। হঠাৎ কি মনে করে দাঁত বের করে হাসলো সে। তারপর ইঙ্গিতে কুয়াশাকে অপেক্ষা করতে বলে ছুটে ঘরে চলে গেল সে। ফিরে এলো একটু পরই। কয়েকটা স্থানীয় মেয়ের ফটো কুয়াশার চোখের সামনে ধরে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো কোন্‌টা পছন্দ বলুন, হুজুর!

কুয়াশা হেসে ফেলে চোখ সরিয়ে নিলো ফটোগুলোর দিক থেকে। বললো, 'না মিয়া, ভুল বুঝেছো তুমি।'

কথাটা বলে আর দাঁড়ালো না কুয়াশা। হাঁটা দিলো সে অ্যারোড্রোমের দিকে। খানিকটা দূরেই দেখা যাচ্ছে অ্যারোড্রোম।

সন্ধ্যা হয়েছে এইমাত্র। ইতিমধ্যেই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে শহরটা।

অ্যারোড্রোমে গিয়ে খোঁজ নিয়ে কুয়াশা জানলো মীরাফ্লোরেস্‌ হয়ে টিটি-কাকার প্লেন আছে একটা ঘণ্টাখানেক পর। ভাগ্য ভালো কুয়াশার। সপ্তাহে দুটো মাত্র ফ্লাইট। আজ বুধবারে একটা। আর একটা শনিবারে।

ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে হবে ঘণ্টাখানেক। শহরটা একেবারেই ছোটো। দেখার কিছুই নেই। শরীরটার উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে। এইটুকু সময় অপেক্ষা করেই কাটিয়ে দেবে ভাবলো কুয়াশা। কিন্তু ওয়েটিংরুমে ঢোকার মুখেই থমকে দাঁড়ালো সে। রুমের ভিতরে একটা সোফায় বসে বসে ঢুলছে একজন লোক। লোকটাকে দেখেই চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কুয়াশা।

মুহূর্তের মধ্যেই লোকটাকে চিনতে পারলো কুয়াশা। 'সৈনিক' থেকে যে লোকগুলো তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল এ লোকটা তাদের দলেই ছিলো। গুহার ভিতর সবগুলো লোককে মেরে ফেলেছিল ফার্ণান্দো। কিন্তু এ লোকটা আহত হয়ে পালিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কুয়াশার কথাটা। Dr. Kotze-এর থিসিসের একটা চুরি করা অংশ আছে এই লোকটির সঙ্গে। ফার্ণান্দো বলেছিল কথাটা।

নিঃশব্দে সরে এলো কুয়াশা ওয়েটিংরুমের দরজা থেকে। লোকটা নিঃসন্দেহে টিটিকাকা শহরেই যাবে। Dr. Kotze-এর আশপাশেই আছে তাঁর শত্রু। এ লোকটাও যাবে নিশ্চয় কাছাকাছি জায়গায়। থিসিসটা এমনভাবে হাতের কাছে রয়েছে যখন, তখন ওটা মুঠোর মধ্যে আনতেই হবে। অ্যারোড্রোম থেকে বের হয়ে এলো কুয়াশা। টুপি কিনবে সে একটা বড় দেখে। কয়েকটা দোকান ঘুরে ছোটখাট আরও কয়েকটা জিনিস পেলো সে। নকল গোঁফ, চশমা, ইত্যাদি।

প্লেনে চড়ে লোকটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলো কুয়াশা। চিনতে পারেনি ব্যাটা কুয়াশাকে। যথাসম্ভব বদলে নেবার চেষ্টা করেছে কুয়াশা নিজের চেহারাটা

টুকিটাকি জিনিস দিয়ে। কিন্তু এই ছদ্মবেশে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। সন্দেহে ঝুলিয়ে রাখা হয়তো সম্ভব। তবে কুয়াশাকে স্ববেশে দেখলেও লোকটা চিনতে পারতো কিনা সন্দেহ। সারাক্ষণ চোখ বন্ধ করে ঢুলছে।

প্লেন থেকে নেমে লোকটা চলে গেল অন্যদিকে। লোকটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করলো কুয়াশা। ফার্ণান্দো বলেছিল Dr. Kotze যে জায়গায় থাকে সেখানে কাউকে যেতে হলে ইলামাপো নামের একজন লোকের কাছে যেতেই হবে। তার কাছেই একমাত্র এক্কা গাড়ি আছে। আর এক্কা গাড়ি ছাড়া No man's land-এ পৌঁছানো অসম্ভব। ইলামাপোর চাকরি হলো কেউ যেন ঐ দিকের নিষিদ্ধ এলাকায় যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। টাকা পেলে, আবার কখনো ভয়ে কোনো কোনো লোককে বিনা বাধায় ঐ দিকে যেতে দেয় সে।

কুয়াশা যখন ইলামাপোর কোঠায় পৌঁছুলো তখন রাত আটটা। কুয়াশা কোনো ভূমিকা না করেই ফার্ণান্দোর নাম করলো। ইলামাপো জুতো মেরামত করছিল বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। নামটা শুনেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সে। জোড়হাতে কুয়াশার সামনে দাঁড়িয়ে জানালো, 'হুকুম করুন, হুজুর!'

কুয়াশার কথামত চটপট সব করলো ইলামাপো। ঠিক কুড়ি মিনিট পর এলো সেই লোকটা।

লোকটা ইলামাপোর সঙ্গে ফিসফিস করে কথাবার্তা বললো খানিকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটি শুরু হলো ওদের মধ্যে। ইলামাপো বললো, 'এতো রাতে তোমাকে আমি গাড়ি দিতে পারবো না। কেননা এখন আমি ঘুমোবো। তুমি তো গাড়ি নিয়ে যাবে। ফিরিয়ে দিয়ে যাবে কে?'

লোকটি বললো, 'টাকার বদলে এক রাত না হয় নাই ঘুমালে তুমি। ঘুম তোমার অন্য সময়ও হবে, কিন্তু টাকা কি হবে?'

ইলামাপো বললো, 'এককথা বারবার বলতে পারবো না। আমাকে ছাড়া যদি চলে তবে ব্যবস্থা করতে পারি আমি। লোকটা আমারই বন্ধু মানুষ। চিনি ওকে আমি। ওকে নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যেতে পারো। আমি যেতে পারবো না।'

অবশেষে রাজি হয়ে গেল লোকটা।

ইলামাপো বিদঘুটে একটা নাম ধরে কয়েকবার চিৎকার করতে গাড়োয়ানের পোশাক পরে বের হয়ে এলো একটি লোক চোখ কচলাতে কচলাতে। ইলামাপো তাকে বোঝালো ব্যাপারটা। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

লোকটি এক্কা গাড়িতে চড়ে বসে একটা সিগারেট ধরালো। গাড়োয়ান পিছন ফিরে দেখলো লোকটির কোলে একটা অ্যাটাচি কেস পড়ে রয়েছে।

'যেতে পারো, কিন্তু সাবধানে চালাবে।'

'জো হুকুম!' বিগলিত কণ্ঠে কথাটা বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালো চালক।

মিনিট কুড়ি ধরে ঝড়ের মতো ছুটেই হঠাৎ থেমে গেল এক্কা।

'কি হলো, গাড়ি থামালে কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো লোকটা।

চালক গাড়ি থেকে নেমে বললো, 'ধাক্কা মারতে হবে, হুজুর, পিছন থেকে। কাদায় আটকে গেছে চাকা। ঘোড়ার সাধ্য নেই টেনে তোলে।'

খানিকক্ষণ গজর গজর করলো লোকটা।

'কানা নাকি! দেখতে পাও না কোথায় কাদা কোথায় কি?'

'কি করবো, হুজুর,অন্ধকার যে।'

'অন্ধকার যে!'

মুখ ভেংচে নেমে এলো লোকটি গাড়ি থেকে। চালক তার আসনে বসে ঘোড়া দুটোকে বকাঝকা করতে শুরু করলো। একফাঁকে ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনের আসনের দিকে তাকালো সে। অ্যাটাচি কেসটা আসনের উপর পড়ে রয়েছে দেখে হাসলো সে। তারপর চাবুকটা তুলে নিয়ে শপ শপ করে বাড়ি মারলো ঘোড়া দুটোর পিঠে।

লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই এক্কা গাড়ি ছুটতে শুরু করলো হঠাৎ। দেখতে দেখতে নাগালের বাইরে চলে গেল গাড়িটা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ইলামাপোর মা-বাপ তুলে গালাগালি শুরু করলো সে।

আর চালকের ছদ্মবেশে এক্কা গাড়িতে বসে কুয়াশা ভাবছিল, 'একটার পর একটা বিপদ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এসেছি এতদূর। এবার বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হবো আমি। কিন্তু এইটুকু পথের মাঝেও আবার কোথাও কোনো বিপদ ওত পেতে নেই তো?'

সারারাত গাড়ি চালিয়ে একটা নদীর তীরে পৌঁছুলো কুয়াশা। জঙ্গলমত একটা জায়গায় গাড়িটা রেখে তখুনি নদীর ধারে চলে এলো সে। কিন্তু তীর ধরে খানিকক্ষণ দৃষ্টি ফেলতেই অবাক হয়ে গেল সে।

একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে নদীর এপারে। কুয়াশাকে দেখতে পায়নি সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ডিঙির রশি খুলছে।

আড়ালে সরে এলো কুয়াশা। নদীটার ওপারে পাহাড়ের সারি। গুহা মতো দেখা যাচ্ছে একটা। গুহা না হয়ে ওটা একটা সুড়ঙ্গ হতে পারে, ভাবলো কুয়াশা। ফার্ণান্দো বলেছিল, নদীটা পেরোতে হবে। কিন্তু নদীর ওপারে কোনো সুড়ঙ্গ দেখা যাবে কিনা তা তো বলেনি সে।

কি করা যায় ভাবছিল কুয়াশা। ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে নদীর ওপারে যাবে ঠিক করতে পারছিল না সে। ইতিমধ্যে নৌকাটায় চড়ে বসে মাঝ নদীতে চলে গেছে লোকটা, দেখতে পেলো কুয়াশা। তীরে আর নৌকা নেই। পার হতে চাইলেই হবে কি করে।

পাহাড়ী নদী। বেশ খানিকটা চওড়া। তীব্রই বলা যায় স্রোত। পানিও ভরাট।

তাকিয়েছিল কুয়াশা নৌকাটার দিকে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো তার ওপারের সুড়ঙ্গটার দিকে।

পাঁচজন লোক বেরিয়ে আসছে সুড়ঙ্গটা থেকে। গোপনে গোপনে এগিয়ে আসছে যেন ওরা। সবার হাতে একটি করে রাইফেল। মাথায় টুপি। সাদা ধবধবে পোশাক। লোকগুলো নিঃশব্দ পায়ে খানিকটা হেঁটে এসে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

ব্যাপার কি! মনে মনে ভাবলো কুয়াশা। কারা এরা? অমন উত্তেজিতভাবে কার জন্যে ওঁৎ পাতছে ওরা? সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল আর দু'মিনিট পরই। পূর্বোক্ত লোকটা নৌকা থেকে নেমে তীরে উঠতেই পাঁচজন বেরিয়ে এলো রাইফেল বাগিয়ে পাথরের আড়াল থেকে। থমকে দাঁড়ালো লোকটা। কি যেন বলতে গেল সে তোতলাতে তোতলাতে। কিন্তু তার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে বেঁধে ফেলা হলো তাকে। নিয়ে চলে গেল লোকগুলো বেচারাকে টেনে হিঁচড়ে সুড়ঙ্গের ভিতর।

প্রশ্নের উত্তর মোটামুটি পেলো বটে কুয়াশা। কিন্তু এ উত্তরে কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তা সত্ত্বেও নদীটা পেরোতে হবে ঠিক করলো সে।

ভাবতে হলো না কুয়াশাকে। দেখা গেল সেই সুড়ঙ্গ থেকে আবার একজন সাদা পোশাক পরা লোক বেরিয়ে এসেছে। হাতে কোনো অস্ত্র নেই লোকটার। সিধে নদীর তীরে এসে নৌকায় চড়লো সে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এপারে এসে ভিড়লো নৌকাটা। নেমে পড়লো লোকটা। নৌকোটা একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রেখে চলে গেল সে দ্রুত পদক্ষেপে চোখের আড়ালে।

সুযোগ বুঝে আড়াল থেকে বের হয়ে নৌকাটার কাছে চলে এলো কুয়াশা। রশি খুলে নৌকায় চড়লো সে। বৈঠা বেয়ে চারমিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওপারে।

নৌকা থেকে নামার পরই থমকে গেল কুয়াশা। পাঁচজন লোক তীরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে। হাসছে লোকগুলো। হাসছে কেন ওরা?

'আসুন, আসুন! আমরা আপনার জন্যেই এসেছি। বৈজ্ঞানিক Kotze আপনার জন্যে তাঁর কামরায় অপেক্ষা করছেন।'

একে একে পাঁচজনের মুখের দিকে তাকালো কুয়াশা। খালি হাত ওদের সকলের। গালে হাসির ছড়াছড়ি। মুখে Dr. Kotze-এর নাম—ব্যাপার কি! কারা এরা?

কি করবে বা কি বলবে ঠিক করতে পারলো না কুয়াশা কয়েক মুহূর্ত। কোথায় যেন একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে বলে বারবার তিরস্কার করছে তার মন তাকে। কিন্তু কি ভুল হয়েছে বুঝতে পারছে না কুয়াশা।

কুয়াশাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে এগিয়ে এলো ওদের মধ্যে থেকে

একজন। হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা বললো, 'আপনার মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পেরে আমরা ধন্য মনে করছি নিজেদেরকে। আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন আপনি।'

হ্যাণ্ডশেক করলো কুয়াশা হাত বাড়িয়ে দিয়ে। মৃদু হাসলো সে লোকটির কথার উত্তরে। বলা বাহুল্য, হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

লোকটি এবং কুয়াশা আগে আগে এগিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গটায় প্রবেশ করলো। পিছন পিছন ঢুকলো অপর চারজন।

'ফাঁদে পা দিয়েছো, কুয়াশা!' কুয়াশার কানে কানে কে যেন বলে গেল কথাটা। সতর্ক হলো কুয়াশা। মন কখনো তাকে ধোঁকা দেয় না। নিশ্চয়ই কোনো ফাঁদে পা দিয়েছে সে।

সুড়ঙ্গটা ধরে মিনিট দুই হেঁটে একটা পাথরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। দরজা খুলে যেতেই চমকে উঠলো কুয়াশা। দরজার সামনে মাঝারি আকারের দুটো মেশিনগান কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে স্থির হয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও সময় পেলো না সে। বজ্রকঠিন কয়েকটা হাত জড়িয়ে ধরলো তার শরীর। ঝটপট ঘরে ঢুকিয়ে ফেললো তারা কুয়াশাকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মেশিনগানধারী লোক দুজন দাঁড়িয়ে রইলো তার দু'পাশে। অপর একজন লোক তার পকেট থেকে রিভলভার এবং বাকি যা পেলো বের করে নিলো। সবচেয়ে আগে ছিনিয়ে নিলো লোকটা Dr. Kotze-এর থিসিসটা যে অ্যাটাচি কেসটায় ছিলো সেটা।

সবকিছু কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলো ওরা কুয়াশাকে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। পিছনে দুজন মেশিনগানধারী। তাদের পাশে বাকি পাঁচজন লোক। কুয়াশার সামনে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে অলস বাদুড়ের মতো একজন লোক। মিটিমিটি হাসছে সে কুয়াশার আপাদমস্তক জরিপ করতে করতে। চেয়ারের সামনে টেবিল নেই। কিন্তু লোকটার উরুর উপর রাখা আছে একটি মেশিনগান। বাঁটের উপর হাত রেখে যেন আদর করছে সে মারণাস্ত্রটাকে।

দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠলো কুয়াশা লোকটার দিকে তাকিয়ে, 'বুঝেছি! তোমরাই তাহলে সেই শয়তান? Dr. Kotze-এর শত্রু তাহলে তোমরাই, কেমন?'

'জ্বি, হ্যাঁ! কেন, অপরাধ নাকি সেটা?'

লোকটার স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে মেজাজ আরো বিগড়ে গেল কুয়াশার। লাফিয়ে পড়ে কেড়ে নেবে নাকি সে মেশিনগানটা? ভাবলো সে। কিন্তু কি মনে করে ক্ষান্ত হলো সে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাও তোমরা আমার কাছ থেকে? আমাকে এভাবে ফাঁদ পেতে ভুলিয়ে নিয়ে আসার মানে কি?'

লোকটি বললো, 'মানেটা আবার বলে দিতে হবে বুঝি বাছাধনকে? তোমাকে

ধরে নিয়ে আসার মানে তোমার মৃত্যু। বুঝেছো এবার?'

কুয়াশা তেমনি কঠোর স্বরে বলে উঠলো, 'না! জানিস না কোন্ কালকেউটেকে ঘরে ডেকে এনেছিস তোরা। মৃত্যু আমার নয়, তোদেরই কপালে ঝুলছে মৃত্যু। মনে রাখিস আমার নাম কুয়াশা। কুয়াশা সুদূর পাকিস্তান থেকে এসেছে Dr. Kotze-এর শত্রুকে নির্মূল করতে। শরীরে একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট থাকতে তাকে কেউ দমাতে পারবে না।'

'চমৎকার! চমৎকার! বেড়ে ফুটানি মারতে পারো দেখছি তুমি। তা কয়েকটা কথা বলতে হয় এবার তোমাকে।'

লোকটা সিধে হয়ে বসলো চেয়ারে। তারপর কুৎসিত এক টুকরো হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বললো, 'তুমি এখন যতো কথাই বলো, বর্তমান অবস্থা হচ্ছে তুমি আমাদের হাতে বন্দী—যাকে বলে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। আর বুড়ো Kotze-এর দফারফা করতেও খুব বেশি সময় লাগবে না আমাদের তাও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। বিশ্বাস না হয় ঐ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখো।'

লোকটার কথা শুনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো কুয়াশা। দেখলো পাহাড়ের প্রাচীরের সামনে একটা সুড়ঙ্গ মতো তৈরি করছে কয়েকজন লোক কোদাল এবং শাবল হাতে নিয়ে।

'আজকেই শেষ হয়ে যাবে কাজটা। আজ রাতেই বুড়োকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো আমরা।'

কুয়াশা তখন লোকটির দিকে তাকিয়ে শুরু করে দিয়েছে তার কাজ।

লোকটি কুয়াশার দিকে তাকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে চলেছে তাদের প্ল্যানের কথা। একটি কথাও কানে যাচ্ছে না কুয়াশার।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশা লোকটির চোখের মধ্যমণিতে। স্থির অনড় তার শরীর। চোখের পাতা কাঁপছে না ক্ষণিকের জন্যেও। তার দৃষ্টি যেন কুরে খাচ্ছে লোকটির চোখ জোড়ার মণি দুটো। জাদু! জাদু করছে কুয়াশা লোকটাকে।

জড়িয়ে এলো লোকটার উচ্চারণ। নিষ্পলক হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। চোখ সরাতে পারছে না সে কুয়াশার চোখের উপর থেকে। হাসিটা উবে গেল তার মুখ থেকে। দেখতে দেখতে কথা বলতে ভুলে গেল সে।

কুয়াশা যখন বুঝতে পারলো যে সময় হয়েছে, ঠিক তখনই নিজের চোখ জোড়া পলকের জন্যে মেশিনগানটার উপর ফেলে শক্ত করে নিলো নিজের শরীরের মাংসপেশী। কুয়াশার দৃষ্টি অনুসরণ করে যান্ত্রিকগতিতে তুলে নিলো লোকটা নিজের উরু থেকে মেশিনগানটা। তুলেই উঁচিয়ে ধরলো সে কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে। এরপর একই সঙ্গে দুটো কাণ্ড ঘটলো।

কুয়াশা বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার পায়ের কাছে। একই সময়ে পরপর অনেকগুলো গুলি বের হলো মেশিনগানটা থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়েই

লোকটাকে জড়িয়ে ধরলো কুয়াশা। ধপ্ ধপ্ করে কয়েকটা শব্দ হলো পিছনে। লোকটার হাত থেকে মেশিনগানটা কেড়ে নিয়ে পিছন দিকে তাকালো। সাতজনই শেষ।

জানালার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সচেতন হলো কুয়াশা। শাবল আর কোদাল ফেলে ছুটে আসছে পাঁচ-সাতজন। গুলির শব্দ শুনেছে ওরা। লোকটার দিকে তাকালো কুয়াশা। বোকার মতো তাকিয়ে আছে লোকটা নিজের লোকের লাশগুলোর দিকে। শার্টের কলার ধরে দাঁড় করালো কুয়াশা লোকটাকে। বাঁধবার সময় নেই। দাঁড় করিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলো সে নাকের উপর। এক ঘুসিতেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে চিৎ হয়ে। মেশিনগানটা নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। দরজাটা পাথরের। বন্ধ।

একটু পরই আপনাআপনি খুলে গেল দরজাটা। থমকে দাঁড়ালো সাতজন লোক কুয়াশাকে মেশিনগান উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো ওরা কুয়াশার হাতে ধরা মেশিনগানটার নলের দিকে ভীত দৃষ্টিতে।

'পিছু হটো!'

কথাটার অর্থ বুঝতে একটুও দেরি হলো না লোকগুলোর। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল ওরা খানিকটা। দরজা অতিক্রম করে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। ইঙ্গিতে লোকগুলোকে কাজের জায়গায় ফিরে যেতে বললো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা যেখানে শাবল-কোদাল নিয়ে কাজ করছিল সেদিকে। পিছন পিছন চললো কুয়াশা।

সাতজনকেই কাজ শুরু করতে বাধ্য করলো কুয়াশা। ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে সে কতক্ষণ লাগবে বাকি কাজটা শেষ হতে। এক ঘণ্টা লাগবে জানালো ওরা। তারপরই Dr. Kotze-এর উদ্যান দেখা যাবে।

আধঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করে দিলো কুয়াশা। এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া চাই। তা না হলে কপালে খারাবি আছে বলে সাবধান করে দিলো সে। আর যদি ঠিক সময় মতো কাজটা হয় তবেই প্রাণে বাঁচবে।

প্রাণের ভয়, বড় ভয়। উঠে পড়ে লাগলো লোকগুলো পাহাড় কাটতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুয়াশার আহত লোকটার কথা। ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে বটে, কিন্তু যে কোনো সময় তার জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। কথাটা ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠলো কুয়াশা। কি করবে বুঝতে পারলো না। এদেরকে ছেড়ে গেলে চলবে না। আবার ঘরের লোকটাকে না বাঁধলেও নয়।

দেরি হয়ে গিয়েছিল আগেই। সূর্যের আলোতে ছায়া পড়তেই ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো কুয়াশা। এসে পড়েছিল লোকটা। গুলি করলো কুয়াশাকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লো কুয়াশা। লোকটা একটা ড্রামের আড়ালে আছে। শুয়ে পড়াতে দেখতে পেলো না কুয়াশাকে। এই সুযোগে সরে গেল কুয়াশা ডান পাশে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফাঁকা জায়গাটায় উঠে দাঁড়ালো সে।

ঢুপ্ করে শব্দ উঠলো একটা। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। কয়েকজন লোকের আর্তনাদ শোনা গেল। ঝলসে উঠলো কুয়াশার চোখ দুটো। লোকটাকে দেখতে পেলো সে এবার। খুঁজছে কুয়াশাকে। গুলি করলো কুয়াশা দেরি না করে। আর্তচিৎকার উঠলো আরো একটা। ধপ্ করে শব্দ তুলে পড়লো লোকটা মাটিতে।

বোমা মেরেছিল লোকটা কুয়াশাকে লক্ষ্য করে। বোমাটা গিয়ে পড়েছিল সুড়ঙ্গ মতো জায়গাটায়। লোকগুলো কাজ ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল আগেই। বোমাটা পড়বার সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে।

কাছাকাছি পৌঁছে কুয়াশা দেখলো মারা গেছে লোকগুলো। করডাইটের উৎকট গন্ধ নাকে ঢুকলো তার।

বোমার আঘাতে পাহাড় কাটার বাকি কাজটা শেষ হয়ে গেছে। খানিকটা পাথর উড়ে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে একটা। স্টেনগানটা হাতে নিয়ে গর্তমুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা তখুনি। মাথা গলিয়ে বাইরেটা দেখে নিলো সে প্রথমে। তারপর শরীরটা ধীরে ধীরে গলিয়ে দিলো গর্তের ভিতর।

গর্ত থেকে শরীরটা এপারে নিয়ে এসে মাটির উপর দাঁড়ালো কুয়াশা। জঙ্গল মতো দেখলো সে জায়গাটা। তবে ছাড়া ছাড়া ভাবে গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে এবং সামনেও দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মাথা। তবে সে সব অনেক দূরে।

অদ্ভুত সব গাছ দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটায়। এরকম গাছ জীবনে দেখেনি কুয়াশা। একটা গাছ দেখে রীতিমত দাঁড়িয়ে পড়লো সে আশ্চর্য হয়ে। গাছটা হাত পাঁচেকের বেশি লম্বা হবে না। ডালপালাও খুব বেশি নয়। নিমগাছের পাতার মতো গাছটার পাতা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে একটা সরু মতো সুতো দিয়ে প্রতিটি পাতা প্রতিটির সঙ্গে যোগসূত্র রেখেছে। আর একটি গাছ দেখে কুয়াশার মনে হলো, আরে! এযে দেখছি রঙিলা গাছ! সত্যি রঙচঙেই বটে গাছটা। খানিকটা অংশ একেবারে লাল, মাঝখানটা সবুজ, উপরের দিকটা গাঢ় হলুদ! এই রকম আরো অদ্ভুত অদ্ভুত গাছপালা দেখতে দেখতে একটা ছোটো হ্রদের সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো। কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। ঘরবাড়িও দেখা যাচ্ছে না। হ্রদটা বাঁয়ে রেখে হাঁটতে লাগলো কুয়াশা দ্রুত পায়ে।

হ্রদটা চোখের আড়ালে চলে গেল একসময়। হঠাৎ কুয়াশা থমকে দাঁড়ালো। গরিলা!

মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে গরিলাটাকে দেখতে পেলো কুয়াশা। এখান থেকে একটা চওড়া মতো রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে। রাস্তার মুখে পায়চারি করে

বেড়াচ্ছে বিরাটাকৃতি জানোয়ারটা।

আশ্চর্য হলো কুয়াশা, আফ্রিকা ছাড়া গরিলা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেই গরিলা পেরুর No man's land-এ এলো কিভাবে? কেমন যেন সন্দেহ হলো কুয়াশার গরিলাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। হঠাৎ তার মনে হলো গরিলাটা নিজের ইচ্ছায় ওভাবে একদিক থেকে অন্যদিকে অবধি পায়চারি করে বেড়াচ্ছে না। রীতিমত যান্ত্রিক মনে হচ্ছে গরিলাটির পদচারণা। নির্দিষ্ট একটা জায়গা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে জানোয়ারটা। অন্য কোথাও তার পা পড়ছে না। নিশ্চয় কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত করা হচ্ছে একে।

পায়ে পায়ে এগোলো কুয়াশা গরিলাটার দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল 'গোগীর' কথা। আহত গোগীকে সঙ্গে নেয়ার কোন উপায় ছিল না, তাই গুলি করে মেরেছিল সে প্রভুভক্ত জানোয়ারটাকে। বিশ্বাস করতে পারেনি অবোধ জানোয়ারটা কুয়াশার নিষ্ঠুরতা। বোবার মতো একজোড়া নিরীহ চোখ মেলে তাকিয়েছিলো সে প্রভুর দিকে গুলি খেয়ে।

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো কুয়াশার সব কথা মনে পড়ে যেতে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। গরিলাটা দেখে ফেলেছে তাকে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলো কুয়াশা জানোয়ারটার হাতে একটা বন্দুকের মতো অস্ত্র। গরিলাটা লক্ষ্য স্থির করছে সেটা দিয়ে কুয়াশার দিকে। মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়লো কুয়াশা। পরক্ষণেই তৈরি হলো আত্মরক্ষার জন্যে। স্টেনগানের ট্রিগার টিপতে আর এক সেকেণ্ড বাকি ছিলো তার। এই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ালো। বন্দুকের মতো অস্ত্রটা নামিয়ে নিয়ে রীতিমতো সাহেবী কায়দায় স্যালুট করলো গরিলাটা কুয়াশাকে।

স্টেনগানটা নামিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা। গরিলাটা তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করছে। দেরি না করে এগোলো কুয়াশা চওড়া মতো রাস্তাটা ধরে। গরিলাটাকে ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে সে দেখলো আবার আগের মতো পদচারণা শুরু করেছে জানোয়ারটা।

যেতে যেতে আরো দুটো গরিলাকে একই কায়দায় পায়চারি করে বেড়াতে দেখলো কুয়াশা। এবার তাকে দেখেই স্যালুট করলো ওরা। দেখিয়ে দিলো হাত বাড়িয়ে কোন্‌দিকে যেতে হবে।

খানিক দূরে এগিয়েই শুনতে পেলো একটা গম্ভীর, গভীর, প্রাচীন এবং আবেগপ্রবণ ভারি কণ্ঠস্বরঃ স্বা-গ-ত-ম!

অদ্ভুত কণ্ঠস্বরটি শুনে চমকে উঠলো কুয়াশা। এদিক-ওদিক তাকালো সে চঞ্চল দৃষ্টিতে। কোনো মানুষ দেখতে পেলো না। এপাশে ওপাশে আজব ধরনের গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা। শরীরে আগাগোড়া সাদা রঙয়ের আঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি গাছ, আর একটি গাছের পাতা নেই, অপর একটি গাছের

কাণ্ড গোল নয়। দেশলাইয়ের মতো।

কাউকে দেখতে না পেয়ে রোমাঞ্চিত হলো কুয়াশার সর্বশরীর। অতি কাছ থেকে শুনেছে সে অদ্ভুত আবেগপ্রবণ কণ্ঠস্বরটি, অথচ কাছাকাছি কেউ নেই তার।

'স্বাগতম! স্বাগতম, বন্ধু!'

কুয়াশা আবার শুনলো কণ্ঠস্বরটা। পিছন দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হলো সে। শরীরে আগাগোড়া সাদা আঁশ নিয়ে যে গাছটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটার ভিতর থেকে লম্বা একটা হাত বেরিয়ে এলো কুয়াশার দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশা বুঝলো যেটাকে সে গাছ মনে করে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি সেটা আসলে কোনো গাছই নয়।

'আমি বৈজ্ঞানিক Kotze, বন্ধু। তোমার সান্নিধ্য পেয়ে আনন্দ অনুভব করছি। আমার জন্যে শতো বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এখান পর্যন্ত ছুটে আসার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

Dr. Kotze ! ইনিই সেই মানুষ যাঁকে চোখে দেখার জন্যে কুয়াশার লোভের সীমা ছিলো না। বিস্ময়ে অবশ হয়ে আসতে চাইলো কুয়াশার সর্বশরীর। কি ভীষণ লম্বা মানুষটা! সাত ফুট হবেন নিশ্চয়।

শরীরে কাঁচাপাকা লম্বা লম্বা লোম। মুখের দাড়ি, গোঁফ সাদা-কালো। ভুরুর লোমগুলো নেমে এসেছে চোখের পাতার উপর পর্যন্ত। ঢুলঢুল দৃষ্টি Dr. Kotze-এর। অলোকিত এক টুকরো হাসি ফুটে রয়েছে ঠোঁট জোড়ায়। সাদা পোশাকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছে তাঁকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কুয়াশা। স্টেনগানটা মাটিতে রেখে বৈজ্ঞানিকের বাড়ানো হাতটা ধরলো সে দু'হাত দিয়ে। Dr. Kotze তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে টেনে নিলেন বুকের কাছে।

মহান এবং উদার একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো কুয়াশার মন। কুয়াশা মুগ্ধ হলো Dr. Kotze-এর ব্যক্তিত্বের অবর্ণনীয় রূপ দেখে।

'আজ পাঁচ বছর পর আমার ঘর থেকে এতো দূরে এলাম আমি। শুধু তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে, কুয়াশা।'

কুয়াশা বললো, 'ধন্যবাদ, ডক্টর, কিন্তু কি কারণে এতদিন এদিকে আসেননি আপনি?'

Dr. Kotze বললেন, 'কোনো রিস্ক নিতে চাই না বলে ঘর থেকে বের হই না আমি। শত্রুরা কখন কোথা দিয়ে আমার এলাকায় ঢুকে পড়ে ওঁৎ পেতে থাকে কে জানে। যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছি আমি পাহারার। কোনো মানুষই পারতপক্ষে আমার অজান্তে এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তবু বলা যায় না, তাই সাবধান থাকি আমি সবসময়।'

কুয়াশা প্রশ্ন করলো, 'কারা এই শত্রু আপনার? কি তাদের উদ্দেশ্য? কি চায়

তারা আপনার কাছে?'

Dr. Kotze বললেন, 'চলো ঘরের দিকে হাঁটা যাক। সব কথা বলবো তোমাকে। সে অনেক কথা। সময় না নিয়ে বললে বুঝতে পারবে না তুমি।'

কুয়াশা বললো, 'ঠিক কথা। কিন্তু কয়েকটা খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

'প্রশ্ন করো, বন্ধু।'

কুয়াশা বললো, 'আমার যন্ত্রে আপনার পাঠানো আবেদন বাণী ধরা পড়েছিল। ঐ থেকে আমার ধারণা হয়েছে আপনি মঙ্গলগ্রহে কোনো যন্ত্র পাঠিয়েছেন। এখান থেকে যোগাযোগ করেন আপনি দরকার মতো।'

'ঠিক ধরেছো। মঙ্গলগ্রহে যে যন্ত্রটা পাঠিয়েছি সেটা একটা গরিলার শরীরে ফিট করা আছে।'

কুয়াশার মুগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আপনি মঙ্গলগ্রহে গরিলা পাঠিয়েছেন? তার মানে, দূরপাল্লার মহাশূন্যযান আছে আপনার?'

Dr. Kotze মৃদু শব্দ করে হেসে নিয়ে বললেন, 'মঙ্গলগ্রহ ছাড়িয়ে, আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়েও অনেক দূর গ্রহ নক্ষত্রে গরিলা পাঠাতে সক্ষম হয়েছি আমি।'

খানিকক্ষণ কোনো কথা সরলো না কুয়াশার মুখে। তারপর আবার প্রশ্ন করলো সে, 'এখানে ঢুকেই যে গরিলাগুলোকে দেখলাম সেগুলোকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়েছেন আপনি। এবং যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসেই ওদেরকে পরিচালিত করেন, তাই না?'

'তুমিই একমাত্র আমার উপযুক্ত সাহায্যকারী হতে পারবে, কুয়াশা। তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আগেই পেয়েছি আমি। এখন আরো পাচ্ছি। তুমি সাহায্য না করলে আমি এখনো বেকার!'

কুয়াশা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে Dr. Kotze বললেন, 'তুমি যে মঙ্গলগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার কাজে সফল হয়েছো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা যন্ত্র তৈরি করে, তা আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত সঙ্কেত থেকে জানতে পেরেছিলাম। তখন থেকেই তোমাকে সম্মান করি আমি। প্রতিভাকে ভালবাসা উচিত আমাদের।'

দুজনই নীরব রইলো কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা সানের ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ থেকে কি একটা কথা বলার চেষ্টা করছে কুয়াশা। কিন্তু কোনমতে ঠোঁট খুলতে পারছে না সে।

হঠাৎ Dr. Kotze মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'তুমি যা বলতে চাও অথচ বলতে পারছো না, তা আমি জানি, বন্ধু। মারা গেছে আমার ছেলে—এই কথা তো? আমি আগেই জেনেছি খবরটা। ওর হৃদযন্ত্রে ক্ষুদ্রাকৃতি ওয়্যারলেস ছিলো—সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েছিলাম আমি।

হতবাক হয়ে তাকালো কুয়াশা Dr. Kotze-এর দিকে। মানুষটা অন্তর্যামী

নাকি। কি করে বুঝলেন উনি কুয়াশার মনের কথা? তাছাড়া আরো আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হলো কুয়াশার এই কথা ভেবে যে Dr. Kotze নিজের ছেলের হৃদযন্ত্রে ওয়্যারলেস ফিট করেছিলেন কিভাবে? আজ পর্যন্ত এরকম সংযোজনের কথা শোনা যায়নি কোথাও।

কুয়াশা ধীরে ধীরে বললো, 'ফার্ণান্দো মারা গেছে সে কথাও জানেন আপনি?'

'ফার্ণান্দো···ফার্ণান্দো···মারা গেল ছেলেটা? আশ্চর্য তো! মারা গেল কেন?'

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো Dr. Kotze-এর। কুয়াশা বলতে যাচ্ছিলো ঘটনাটা, বৃদ্ধ হঠাৎ বলে উঠলেন অন্যমনস্ক ভাবে, 'মানুষ মরে···কেন মরে দেখে নেবো আমি! তার চেয়ে কিছু বোলো না, কুয়াশা—সব মৃত্যুই তো একই ভাবে ঘটে। ঘটনায় কৌতূহল নেই আমার।'

সী—লেবেলের অনেক নিচে Dr. Kotze-এর বাসস্থান। উদ্যানের একটা জায়গায় সিঁড়ি আছে নিচে নামার। একটি মাত্র বিরাট হলঘর। সেখানেই হাজার রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রাখা আছে। পাথর দিয়ে তৈরি করা ঘরটা। হলঘরের পাশেই পর পর সাতটা ছোটো ছোটো গুদাম ঘর। যন্ত্রপাতিতে সাজানো ঘরগুলো। এছাড়া আর কোনো ঘর নেই। হলঘরের গুপ্ত দরজা দিয়ে একটা জায়গায় যাওয়া-আসা করেন Dr. Kotze, সেখানে রকেট নিক্ষেপক মঞ্চ তৈরি করা আছে।

হলঘরেই রাতদিন কাটে বৃদ্ধের। খাওয়া, কাজ করা, ঘুমানো সব এখানেই সারেন তিনি। কয়েকটা গরিলা ছাড়া অন্য কোনো পরিশ্রমী প্রাণী নেই। রান্নাবান্না করে ঐ ট্রেনিংপ্রাপ্ত গরিলাই। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন Dr. Kotze-এর। উদ্যানে ফলমূল, শাক-সব্জি আছে। চলে যায় ওতেই। নিরামিষ পছন্দ করেন বৈজ্ঞানিক।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া না হওয়া পর্যন্ত কাজ নিয়ে থাকলেন Dr. Kotze. কুয়াশার সঙ্গে একটি কথাও বললেন না তিনি। এমন কি তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখলেন না। কুয়াশা যে তাঁর সামনেই বসে আছে তা যেন তিনি ভুলেই গেছেন।

মুগ্ধ হলো কুয়াশা ষাট বছর বয়েসের বৃদ্ধের নিষ্ঠা দেখে। কাজের সময় পৃথিবীতে থাকেন না বৈজ্ঞানিক। সব ভুলে যান এক নিমেষে। কাজটা সৃষ্টিকর্তার মনে করেন অনেক মনীষী। Dr. Kotze সেই মনীষীদেরই একজন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখ খুললেন বৈজ্ঞানিক। ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। বললেন, 'তোমাকে দরকার আমার। কঠিন একটা সমস্যায় পড়েছি আমি। জীববিদ্যা সম্পর্কে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব হচ্ছে না সমস্যাটার জন্যে। সূত্রটা জানা নেই আমার। তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারো এ ব্যাপারে। সূত্রটা তৈরি করে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি তোমাকে আমি।'

কুয়াশা বললো; 'আমি আপনাকে সাহায্য করতেই এতদূর এসেছি। যথাসাধ্য

চেষ্টা করবো আমি সূত্রটা তৈরি করতে।'

'আমি জানি তুমি সফল হবে।'

বৃদ্ধ বললেন আবার, 'আমার জীবনের কথা শুনতে কৌতূহল হচ্ছে তোমার বুঝতে পারছি। বলছি শোনো। আচ্ছা, কুয়াশা, জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. হারাফেলোর সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?'

কুয়াশা বললো, 'আমি যখন ড. কার্ল ব্র্যাণ্ডেনবার্গের ছাত্র ছিলাম তখন দেখেছিলাম একবার ড. হারাফেলোকে। পরিচয় করার সুযোগ পাইনি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কার্ল ব্র্যাণ্ডেনবার্গ তোমার শিক্ষক ছিলেন বুঝি?'

কুয়াশা বললো, 'হ্যাঁ।'

'ওর চেয়ে বয়েসে অনেক বড় আমি। কার্ল ব্র্যাণ্ডেনবার্গ যদিও আমার ছাত্র ছিলো না, তবে আমার বন্ধুর ছাত্র ছিলো ও। নিহত হয়েছিল সে, মনে আছে আমার। ব্যাপারটা কি ঘটেছিল জানো তুমি?'

কুয়াশা বললো, 'আমি সব জানি। তার ঐ দশার জন্যে আমাকে দায়ী করা যায়।'

'ওঃ!'

বৃদ্ধকে চমকে উঠতে দেখে কুয়াশা বললো, 'ড. কার্ল ব্র্যাণ্ডেনবার্গকে হত্যা না করে উপায় ছিলো না আমার, Dr. Kotze! লোকটার অতবড় একটা প্রতিভা ছিলো, কিন্তু ভিতরটা তার পশুর চেয়েও শতগুণ কুৎসিত।'

'জানি আমি, তুমি কি বোঝাতে চাইছো। আমিও তোমাকে ঐ একই ঘটনা শোনাবো। তোমার মতো আমিও ভুক্তভোগী। কিন্তু ড. হারাফেলোকে শেষ না করে ভুল করেছিলাম আমি। যার জন্যে এতো অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে আমাকে।'

সারাটা দুপুর এবং বিকেল লেগে গেল Dr. Kotze-এর কথা শেষ হতে। জঘন্য চরিত্রের একটা প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের কথা শুনতে শুনতে ঘৃণায় জ্বলে উঠলো কুয়াশার সর্বশরীর। না থাকতে পেরে আশ্চর্য হয়ে আপন মনে বললো সে, 'কি শয়তান আপনার ঐ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হারাফেলো। এতবড় একজন সাধক যে এমন নীচ হতে পারে তা বিশ্বাস করতে বাধো বাধো ঠেকে।'

'কেন! ড. কার্ল ব্র্যাণ্ডেনবার্গও তো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান সাধক। সে কি তোমাকে কম অসুবিধেয় ফেলেছিল? সেও তো হারাফেলোর মতো জঘন্য নীচতার পরিচয় দিয়েছে। তা না হলে তুমি তাকে হত্যা করলে কেন!'

'হ্যাঁ। আমিও ভুক্তভোগী। জানি আমি এইসব প্রতিভাবানদের। মানব সমাজের সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছে এরা, কিন্তু এদের মতো কুরুচি কোনো পাগল-ছাগলেরও নেই।'

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল কুয়াশা Dr.Kotze-এর জীবনকাহিনী। ড. হারাফেলোর

সহকারী ছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। তিরিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ছেলের বয়স ছিলো চার। তখনই বিরোধ শুরু হয় Dr. Kotze-এর ড. হারাফেলোর সঙ্গে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের উপরই পড়াশোনা করেছিলেন Dr. Kotze. যুগান্তকারী কয়েকটি আবিষ্কার সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন তিনি অনেকদিন থেকেই। শেষ পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটা থিসিস লিখে শেষ করলেন তিনি আবিষ্কার সম্পর্কে। থিসিসটা তিনি তাঁর গুরু ড. হারাফেলোকে দেখতে দিয়েছিলেন। থিসিসটা আসলে যুগান্তকারী একটা আবিষ্কারের সম্ভাবনা উদ্ঘাটন করে দেবার মতো সূত্র সম্বলিত ছিলো। নীচমনা হারাফেলো সেটা পড়তে নিয়ে আর ফিরিয়ে দিতে রাজি হলো না। থিসিসটা যার নামে প্রকাশ করা যাবে সে হবে প্রাতঃস্মরণীয়, একথা বেশ ভালো ভাবে বুঝেছিল সে। Dr. Kotze-কে সে ভয় দেখিয়ে বললো, এ সম্পর্কে একটি শব্দও যদি তার মুখ থেকে বের হয় তবে প্রাণে মেরে ফেলা হবে তাকে।

Dr. Kotze ছিলেন হারাফেলোর সহকারী। তেমন খ্যাতিও তাঁর ছিলো না। তিনি যদি লোককে বলেন যে ড. হারাফেলো আমার থিসিস মেরে দিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করতে চাইছে তবে সেকথা উড়িয়ে দেবে তারা। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের বিরুদ্ধে একথা বলার ফলে তাকে হয়তো জেল খাটতে হবে শেষ পর্যন্ত। সাত-পাঁচ ভেবে চুপ করেই রইলেন Dr. Kotze.

এদিকে থিসিসটা পড়ে ভালমতো কিছুই বুঝতে পারেনি হারাফেলো। অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিলো Dr. Kotze-এর সূত্র এবং তত্ত্বগুলো। সেগুলোর ব্যাখ্যা করা একমাত্র তাঁর নিজের দ্বারাই সম্ভব ছিলো। হারাফেলো বুঝলো অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সামনে থিসিসটা ব্যাখ্যা করতে না পারলে তার নাম-যশ হয় না। প্রাতঃস্মরণীয় হবার সাধও মেটে না। তাই আরও একটা নিষ্ঠুর কাজ করার প্ল্যান করলো সে।

যেখানে যতো বক্তৃতা দেবার ডাক আসে হারাফেলোর সেখানে বক্তৃতা দেবার জন্যে সে নিজেই উপস্থিত থাকে। কিন্তু Dr. Kotze-কে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সে বক্তৃতা, নিজে সভায় গিয়ে নিজের লেখা বলে পড়ে শোনায়। এভাবেই চলছিল বহুদিন। এরপর চুরি করা থিসিসটা মূল সূত্র সম্পর্কে বক্তৃতা লিখে দেবার জন্যে চাপ দিলো সে Dr. Kotze-কে। রাজি হলেন না Dr. Kotze. তাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে Dr. Kotze-এর স্ত্রীকে কিডন্যাপ করা হলো একদিন। এছাড়া Dr. Kotze যাতে পালাতে না পারেন তার ব্যবস্থাও করলো শয়তান হারাফেলো। চারজন ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা দিনরাত তার আশপাশে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। তাতেও নিজের সিদ্ধান্তে অটুট রইলেন Dr. Kotze. কিন্তু একদিন তাঁর সামনে তাঁর যুবতী স্ত্রীর শরীরের যত্রতত্র অ্যাসিড ছিটিয়ে দিতে দেখে সহ্যের বাঁধ ভেঙে

গেল তাঁর। রাজি হয়ে গেলেন তিনি থিসিসের সূত্র সম্পর্কে বক্তৃতা লিখে দিতে। বাধ্য হয়ে রাজি হলেন বটে Dr. Kotze, কিন্তু মনে মনে ভেবে রাখলেন সুযোগ পেলেই থিসিস উদ্ধার করে পালাবেন তিনি।

সুযোগ এলো বহুদিন পর। থিসিসটাও হাতে পেলেন তিনি। কিন্তু স্ত্রীকে হারালেন চিরতরে। হারাফেলো বন্দী করে রেখেছিল তাঁকে। আত্মহত্যা করেন তিনি কিছুদিন পর।

Dr. Kotze-এর বাবা ছিলেন জমিদার। টাকা পয়সা তাঁর যথেষ্টই ছিলো। হঠাৎ দেশে ফিরে গেলেন তিনি একদিন। বাবা শয্যাগত এই খবর আগেই পেয়েছিলেন তিনি। গিয়ে জীবিত দেখতে পেলেন না পিতাকে। দু'দিন মনমরা হয়ে দেশের বাড়িতে কাটিয়ে তৃতীয় দিন জমিদারী বিক্রি করে দিয়ে ফিরে এলেন তিনি লাখ লাখ টাকা নিয়ে শহরে।

এক অন্ধকার রাতে থিসিস এবং প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি উদ্ধার করে নিয়ে পৃথিবীর এই নির্জন প্রান্তে এসে সাধনায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। একমাত্র সন্তানকে এক বন্ধুর কাছে রেখে এসেছিলেন। ছেলে বড় হলে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় পিতা-পুত্রের। বড় হতে একবার মাত্র দেখা হয় দুজনের। তারপর থেকে Dr. Kotze ছেলেকে দূরে দূরে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। হারাফেলো কিভাবে যেন খোঁজ পেয়ে আবার পিছু লেগেছে তাঁর—হঠাৎ একদিন টের পেলেন তিনি। ছেলেকে নিরাপদ রাখার জন্যেই দূরে পাঠিয়ে দিলেন। দূরে থেকেই পিতাকে সাহায্য করতো সে। বছর চারেক শয়তান হারাফেলো লেগে থাকলো Dr. Kotze-এর কাজে বাগড়া দেবার জন্যে। আসলে থিসিসটার লোভ ছাড়তে পারেনি সে। কিন্তু তার পাঠানো চারজন লোক ফিরে গেল একদিন। Dr. Kotze-এর কোনো ক্ষতি করা সাধ্যে কুলোল না।

তাই বলে চুপ করে বসে থাকলো না হারাফেলো। ভয়ঙ্কর একটা চাল চাললো সে। অসম্ভব শক্তিশালী একটা আন্তর্জাতিক অপরাধী দলকে লেলিয়ে দিলো সে। Dr. Kotze-এর পিছনে।

হারাফেলো তাদেরকে ভালো করে বোঝালো Dr. Kotze-এর থিসিস এবং আবিষ্কারগুলো হাত করতে পারলে কি বৈপ্লবিক কাজ ঘটবে পৃথিবীতে। Dr. Kotze-এর থিসিস এবং আবিষ্কার সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা ছিলো না হারাফেলোর। আবিষ্কারগুলো যে হাতে পাবে তার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিই টিকবে না। একথা সে জানতো ভালো করেই। ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংয়ের দলপতির সঙ্গে দেখা করে সব কথা খোলসা করে বুঝিয়ে দিলো সে। দলপতিও বুঝলো। সে ভাবলো, সত্যি আবিষ্কারগুলো যদি আমাদের হাতে আসে তাহলে আমেরিকা বা রাশিয়ার কাছে সেগুলো বিক্রি করে কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবস্থা হতে পারে। কিংবা, এমনকি, কারো কাছেই বিক্রি না করে আমরা নিজেরাই সেগুলো কাজে

লাগাতে পারি। Dr. Kotze-কে জীবিত ধরতে পারলেই আবিষ্কারগুলো ব্যবহার করতে পারবো আমরা। তখন সর্বশক্তিমান একটা দল হবো। পৃথিবীকে শাসন করবো আমরাই। রাশিয়া বা আমেরিকা তখন থাকবে আমাদেরই শক্তির অধীনে।

এই রকম আশাতীত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে রাজি হয়ে গেল গ্যাংটা। সর্বশক্তি দিয়ে Dr. Kotze-এর পিছনে লাগলো তারা। এমন কি, Dr. Kotze-কে কুয়াশা সাহায্য করার জন্যে আসতে পারে এই খবর পেয়ে বাধা দেবার জন্যে সুদূর পূর্ব-পাকিস্তানেও সাবমেরিন পাঠাতে দ্বিধা করলো না তারা। গত পনেরো বিশ বছর ধরে কাজ করছে তারা। বহুদিন কোনো হদিশই করে উঠতে পারেনি ওরা Dr. Kotze-এর আস্তানা সম্পর্কে। কিন্তু এখন তারা সব জেনে ফেলেছে।

পঁচাশি বছরের শয়তান হারাফেলো বেঁচে আছে এখনও। দূরে বসে বসে মজা পাচ্ছে সে Dr. Kotze-এর দুর্দশার কথা ভেবে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো কুয়াশা। পরদিন সকালে হলঘরে ঢুকে কাজে লেগে পড়লো দুই বৈজ্ঞানিক। বসলো সকাল আটটায়, উঠলো মধ্যরাতে!

দশ

ফিসফিস করে ষড়যন্ত্র চলছিল শহীদের বিরুদ্ধে মহুয়া এবং কামালের মধ্যে। শহীদ রিভলভার পরিষ্কার করছিল আপন মনে। অবশ্যি মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছিল সে তার বিরোধী দলের দিকে। কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছিলো না সে ওই চুনোপুঁটিদের। নিজের কাজে মশগুল যেন সে, এই ভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল।

ঘোড়াগুলো বাঁধা রয়েছে একদিকে। লৌহমানবদ্বয় পিছনে আছে, এখনো এসে পৌছয়নি ওরা। ঘোড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়ুতে পারে না ওরা। তাই পিছিয়ে পড়েছে। গফুরকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। মি. সিম্পসন মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছেন বসে বসে।

ফ্লাস্কগুলোয় পানি ভরা আছে। তাই কাছে পিঠে কোনও ঝর্না আছে কিনা দেখতে যেতে রাজি হয়নি শহীদ। মহুয়া হাজারবার সেধেও সফলকাম হতে পারেনি। অবশেষে কামালের সঙ্গে জোট পাকাচ্ছে সে। ব্যাপারটা এখন আর স্বাভাবিক নেই, জেদের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। খাবার পানি যথেষ্ট আছে তা ঠিক। আসলে খাবার পানির জন্যে মাথাব্যথাও নেই মহুয়ার। মেয়েমানুষ সে, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। স্নান করেনি গত তিন দিন সে। সাধ হয়েছে আজ স্নান করবে। শহীদকে এতো করে বলেও যখন কাজ হলো না তখন

কামালের শরণাপন্ন হলো। এখন যে সে স্নান করবে বলেই জোট পাকাচ্ছে তা নয়। তার জেদ শহীদকেও স্নান করিয়ে ছাড়বে। এদিকে কামাল অনেক রকম পরামর্শ দিচ্ছে বটে শহীদকে কিভাবে কাবু করা যায় সে ব্যাপারে, কিন্তু যথার্থ পরামর্শ একটিও দিতে পারছে না।

'কামাল,' শহীদ কাজ করতে করতে হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠলো।

নড়েচড়ে বসে কামাল বললো, 'বল।'

'তুই কেমন লোক বলতো?' রীতিমত তিরস্কার শহীদের কণ্ঠে।

'আমি কেমন লোক?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো কামাল।

শহীদ বললো, 'আচ্ছা, ও প্রশ্ন থাক। বলতো, তুই আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা শুরু করেছিস কেন?'

'মানে!'

শহীদ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'তুই না আমার বাল্যবন্ধু, কামাল?'

কামাল শহীদের দিকে সাবধানে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ! কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

মহুয়ার দিকে ইঙ্গিত করে শহীদ বললো, 'ও তো ক'দিন মাত্র হলো আমাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, এরইমধ্যে তুই আমার বন্ধুত্বের অমর্যাদা শুরু করে দিলি? মহুয়া তো ততো নয়, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি পুরানো। আমাকে ছেড়ে তোর যতো শলাপরামর্শ সব এখন ওর সঙ্গে হয় দেখে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় তোর বন্ধুত্ব মেকি কিনা।'

শহীদ হেসে ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে কামাল বললো, 'কে বললো আমরা তোর বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছি?'

শহীদ হেসে বললো, 'তুই কি ভাবিস আমাকে? মনে করেছিস বুঝতে পারি না, কি আলোচনা করছিস তোরা আমার বিরুদ্ধে?'

শহীদকে কথা বলার সুযোগ না দেবার জন্যে শুধু শুধু চিৎকার করে উঠলো মহুয়া, 'গফুর! গফুর!!'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না গফুরের।

'কোথায় গেল হারামজাদাটা!'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো মহুয়া। তারপর কিছুক্ষণ আগে গফুরকে যেদিকে যেতে দেখেছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল একা।

খানিকটা দূরে গিয়ে একটা মোড় ঘুরতেই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মহুয়া। বড়সড় একটা ঝর্না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অদূরে। পাহাড়ী ঝর্না। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পানি জমে আছে। ক্ষুদ্র একটা পুকুরই বলা যায়। ঝর্নাটার ধারে শুধু ল্যাংগোট পরে ঘনঘন ডন বৈঠক কষছে যে লোকটা সে আর কেউ নয়—স্থূলবুদ্ধি গফুর!

'এই গফুর, এ আবার কি হচ্ছে তোর। খাবি না?'

ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জায় পড়লো গফুর। তা সত্ত্বেও গম্ভীর হয়ে বললো সে, 'না দিদিমণি, তুমি আমাকে আর খাওয়ার কথা বোলো না। তাড়া মেরে বেশি বেশি করে খাইয়ে আমাকে আলসে করে দিয়েছো তুমি। আমি কি এরকম ছিলাম আগে? এই ভুঁড়ি ছিলো আমার? যাই বলো তুমি, আমি আর তোমার কথায় ঘনঘন খাবো না। এখন আমি নিয়মিত ব্যায়াম করবো, যতদিন না আগের মতো জোর হয়। ওহ্! এই ভুঁড়ির জন্যে জংলীদের হাতে কম নাকানিচোবানি খেতে হয়নি আমাকে।'

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে আবার শুরু করলো গফুর ডন-বৈঠক। গফুরের কথা শুনতে শুনতে একটা বুদ্ধি খেললো মহুয়ার মাথায়। তখুনি এগিয়ে গিয়ে ঝর্নার পাশে চলে এলো সে। তারপর গফুরকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝর্নার পানিতে। শব্দ শুনে ঘাড় ঘোরাতেই গফুর দেখলো, মহুয়া পানিতে ডুবে যাচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো সে সঙ্গে সঙ্গে। মহুয়াকে উদ্ধার করার জন্যে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো সে আর একটু হলে। মাথা তুলে মহুয়া বললো, 'তুই না, তুই না! তোর দাদামণিকে গিয়ে খবর দে। বল, দিদিমণি ডুবে যাচ্ছে—জলদি এসো।'

কথাটা শুনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো গফুর শহীদের কাছে। মহুয়া ডুবে যাচ্ছে শুনেই ছুটলো শহীদ ও কামাল গফুরকে সঙ্গে নিয়ে ঝর্নার দিকে।

ঝর্নার কাছে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লো শহীদ পানিতে। মহুয়ার মাথা দেখা যাচ্ছিলো। সেদিকেই দ্রুত সাঁতরাতে লাগলো শহীদ। কাছাকাছি পৌঁছুতেই মাথা তুলে খিলখিল করে হেসে ফেললো মহুয়া। হাসতে হাসতে শহীদকে ধরে ফেলে বললো সে, 'কেমন! স্নান করিয়ে ছাড়লাম তো!'

সন্তুষ্টির হাসিতে ভরে উঠলো কামালের মুখ মহুয়ার জয় এবং শহীদের নিদারুণ পরাজয় দেখে। আর গফুর ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কামালকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন না করারই সিদ্ধান্ত নিলো সে। কেননা কামালদাকে তার ন্যাড়া মাথা সম্পর্কে প্রশ্ন করে ধমক খেয়েছিল সে। বলা যায় না এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেও হয়তো ধমক খেতে হবে।

তিনদিনে চার ভাগের এক ভাগ দূরত্ব অতিক্রম করেছে শহীদরা। রাতে বিশ্রাম নিয়ে দিনের বেলা যতটা সম্ভব এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওরা। নির্বিঘ্নেই এগোচ্ছে। তেমন কোনো বিপদ দেখা দেয়নি এখন পর্যন্ত।

রাতেরবেলা একটা গুহায় আশ্রয় নিলো সবাই।

গভীর রাত। গুহার ভিতর সাড়াশব্দ নেই কারও। শহীদ শোবার আগে

অন্ধকার করে দিয়েছে গুহার ভিতরটা। সারাদিন ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার পর রাত জেগে পাহারা দেবার সামর্থ্য থাকে না কারও। গুহার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে লৌহমানবদ্বয়। কেউ বা কোনো দস্যুদল এদিকে এসে পড়লেও দুটো যান্ত্রিক মানুষকে দেখে পালাতে দিশে পাবে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কামাল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। কে যেন ধাক্কা মারছে নিঃশব্দে।

ভয়ে ভয়ে একবার চোখ মেললো কামাল। অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে পারলো না সে। কে. ধাক্কা মারছে তাকে? ডাকাত পড়লো নাকি? ডাকাত হলে এভাবে ধাক্কা মারবে কেন! তবে...তবে কি কোনো অশরীরী...।

'কামাল, এই কামাল!'

ফিসফিস করে কে যেন ডেকে উঠলো তার নাম ধরে। ভয়ে আরো সিঁটিয়ে গেল সে। মরার মতো পড়ে রইলো। সাড়া দিলো না ভুলেও।

এবার কে যেন তার ডান কানটা ধরে মলে দিতে দিতে বললো ফিসফিস করে, 'ভূতটুত নইরে আমি। আমি শহীদ। ওঠ না, বাইরে কিরকম চাঁদ উঠেছে দেখবি চল—এই কামাল।'

এবার সাড়া দিলো কামাল। যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙলো তার। বললো, 'কি হয়েছে রে, এতরাতে ডাকাডাকি করছিস কেন? ভূতের ভয় লাগছে নাকি?'

অতিকষ্টে হাসি চেপে শহীদ বললো, 'চুপ! মহুয়া কিংবা মি. সিম্পসন উঠে পড়লে সব ভণ্ডুল করে দেবে। চল, পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ি।'

দু'বন্ধু গুহা থেকে নিঃশব্দ পায়ে বের হয়ে এলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসাধারণ এক দৃশ্যাবলীর সম্মুখে। বাইরে এসেই মুগ্ধ আবেশে ভরে গেল ওদের বুক এবং চোখের দৃষ্টি। কি অপূর্ব, মহান সৌন্দর্য! উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে দূর দিগন্তের অন্তে ক্ষীণ একটা নদীর জল। চাঁদের আলোয় হাসছে পাহাড়ের চূড়া। হাসছে দূরের ঐ চিকন জলরাশির স্রোত। নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ভেসে যাচ্ছে খণ্ড খণ্ড উজ্জ্বল মেঘের দল। নিচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী পথ। ঐ পথ দিয়ে কয়েক ঘণ্টা আগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে ওরা।

'কি সুন্দর, তাই না-রে, শহীদ?'

বুক ভরা আকুলতা উথলে উঠতে চায় কামালের এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

'ছোটবেলার কথা মনে পড়ে তোর, কামাল?'

একটা পাথরের উপর বসে পড়ে শহীদ বলে, 'মনে পড়ে তোর, বাঁশ বাগানের মাথার উপর এইরকম চাঁদ উঠতো। নতুন রাস্তার পাশের কাজল দীঘি থেকে কই মাছ ধরে মাঝরাতে শহরে ফিরে আসতে আসতে বাগান পাড়ার কাছে প্রত্যেকদিন সাইকেল থেকে নেমে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তাম। তুই বলতিস. আচ্ছা শহীদ,

চাঁদটা অমন করে কোথায় যায় বলতো রোজ রোজ? আমি বলতাম, চাঁদ যায় ভিন্ন দেশে, ঘুরে বেড়াতে ওর খুব ভালো লাগে কিনা। কামাল, বড় হলে আমরাও ঐ চাঁদের মতো অনেক দেশে ঘুরে বেড়াবো।'

কামাল বললো নিচু স্বরে, 'মনে আছে, শহীদ, সব মনে আছে আমার।'

দু'বন্ধু এরপর অনেকক্ষণ বসে রইলো চুপচাপ। একসময় দু'টো সিগারেট ধরিয়ে উঠবো উঠবো করছিল, হঠাৎ মহুয়ার মিষ্টিস্বর শোনা গেল অদূরে।

'সাধে কি আর কামালদাকে আমি আমার সতীন বলি! চাঁদ দেখতে রাত দুপুরে আমাকে না ডেকে, ডেকে নিয়ে এলো বাল্যবন্ধুকে।'

শহীদ হাসতে হাসতে একটু সরে গিয়ে মহুয়াকে বসবার জায়গা করে দিলো। কিন্তু শহীদের পাশে না বসে মহুয়া কামালের উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

শহীদ বললো, 'তোমার দাবিটা একটু বেশি, মহুয়া। কামাল আমার বাল্যবন্ধু, আর তুমি তো মাত্র সেদিন পরিচিত হলে আমার সঙ্গে। এখন তুমি বলো কার অধিকার বেশি?'

'বাল্যবন্ধুকেই বিয়ে করলে পারতে তাহলে। আমাকে নিয়ে আসা কেন, বাপু?'

কামাল ওদের কৃত্রিম ঝগড়ায় বাধা দিয়ে বললো, 'আচ্ছা মহুয়াদি, এখন একটা গান গাইবে তুমি? তুমি গান না গাইলে কি একটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে যেন এই বিপুল সৌন্দর্যটার কোথাও।'

'ঠিক কথা। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সার্থক করে তুলতে, আরো সুন্দর, আরো মহান আরো অর্থবহ এবং পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে প্রিয়ার কণ্ঠের সুরেলা গান একান্ত দরকার। নিরাশ করো না, মহুয়া, গাও তুমি।'

কোনো আপত্তি না করে গান শুরু করলো মহুয়া।

এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হলো ওদের তিনজনের তখনকার জীবনে। সৌন্দর্যের আকণ্ঠ পিপাসায় বারি সিঞ্চন করলো প্রকৃতি এবং প্রকৃতিরই কন্যা মহুয়া যোগ করলো সুর-ধ্বনি। অপূর্ব একটা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো ওরা। তিনজনই স্বর্গবাস করে এলো যেন ক্ষণিক সময়ের জন্যে।

এগারো

আজ এগারোদিন চেয়ারে বসে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে ওরা একরকম। সকালে মুখ হাত ধুয়ে চা-নাস্তা সেরে বসে কাজ নিয়ে। দুপুরেও চলে কাজ। খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই। রাত যখন গভীর হয়ে আসে তখন খেয়াল হয় ঘুমোবার কথা। যন্ত্রপাতি ফেলে মুখে-চোখে পানি ছিটিয়ে দু'মুঠো খেয়ে নেয় কোনরকমে। তারপর

বিছানায় শুয়েই তলিয়ে যায় অকাতর ঘুমে। দিনের পর দিন চলছে এই বাঁধাধরা রুটিন। এগারোদিন হলো আজ।

দু'জন বিজ্ঞান-সাধক বসেছে মুখোমুখি। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের মুখে একটি কথা নেই। কখনো একজন লিখছে অন্যজন সেই লেখাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে মগ্ন হয়ে পড়ছে চিন্তাসাগরে। লেখাটা শেষ হয়ে গেলে পড়ার জন্যে টেনে নিচ্ছে অপরজন। বিরাট বিরাট বা ছোটখাট বিচিত্র সব কলকজার সামনে উঠে গিয়ে কি যেন পরীক্ষা করছে। কথাবার্তা যে হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু ওদের কথা বলার প্রকৃতিও অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। হঠাৎ হয়তো একজন কথা বলতে শুরু করলো। ঝড় বয়ে যেতে থাকে যেন কণ্ঠ থেকে। ঝাড়া আধঘন্টা হয়তো চলে তার কথা বলার পালা। কথা শেষ হবার পর আবার ঘন্টাখানেক হয়তো আর কোনো টুঁশব্দটি নেই। খুটখাট শব্দ ওঠে কেবল যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার।

এদিকে ভয়ঙ্কর বিপদ চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড থাবা মারার জন্যে কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে তা ওদের জানার কথা নয়, বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনের সফলতা নির্ভর করছে কয়েকটা সূত্র আবিষ্কারের উপর। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই কাছে পেয়েছেন তিনি। কুয়াশাও এতদিনে একটা মনের মতো কাজ পেয়ে মজে গেছে এর ভিতরে। একজন বৈজ্ঞানিক আর একজন বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করবে না তো করবে কে। তাছাড়া কুয়াশা বেশ কিছুদিন এতো জটিল কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যার মধ্যে পড়েনি। যতো জটিল এর সূত্র, ততোই আগ্রহ বাড়তে থাকে। একজন বৈজ্ঞানিকের এই আগ্রহটাই সবচেয়ে বড় কথা। কুয়াশাও সূত্রগুলো আবিষ্কার করতে চরম আগ্রহী। এবং ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো তৈরি করে সফলকাম হয়েছে সে। এখন শুধু সেগুলোর খুঁত খুঁজে বের করার পালা। সেটাও মোটেই সহজ কাজ নয়। যন্ত্রপাতি টেনে নিয়ে তার পরীক্ষাপর্ব চলছে।

কাজে বসে ভুলে গেছে কুয়াশা নিজের কথা। নিজের দেশের কথা। বোন মহুয়া, বন্ধু শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন—সকলের কথাই ভুলে গেছে সে এই এগারো দিনে। এমনকি Dr. Kotze-এর শত্রুরা যে কোনো মুহূর্তে চরম আঘাত হেনে তছনছ করে দিতে পারে, তা পর্যন্ত চিন্তা করে দেখতে ভুলে গেছে সে।

প্রথম দিনই উদ্ধারকৃত থিসিসটা নিয়ে এসে Dr. Kotze-এর হাতে তুলে দিয়েছিল কুয়াশা। পাহাড়ের ঐ গুহা থেকে শেষবার বের হয়ে এসে গর্তটা বন্ধ করে দিয়েছিল সে পাথর সাজিয়ে। তার উপর Dr. Kotze একটা গরিলাকে ঐখানে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারপর একবারও ভেবে দেখেননি চারদিকের অবস্থা কি রকম। শত্রুরা কি করছে না করছে তাতে কিছুই যেন এসে যায় না ওদের।

সকাল বেলা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠেছিল একটা অ্যালার্ম। বৈজ্ঞানিক বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পাখি এলো কোথা থেকে—যা যা!'

আসলে পাহারাদার কোনো গরিলা জরুরী খবর পাঠাতে চেয়েছিল। Dr. Kotze কাজ করতে করতে ভাবলেন—পাখি ডাকছে।

কুয়াশা যেখান দিয়ে Dr. Kotze-এর উদ্যানে প্রবেশ করেছিল ঠিক সেখান দিয়ে একজন একজন করে রাইফেলধারী লোক উদ্যানে প্রবেশ করলো। মোট বারোজন ওরা। প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে রাইফেল। কয়েকজনের পকেটে রয়েছে হাতবোমা। নিঃশব্দ পায়ে খানিকটা এগোতেই একটা গরিলার দেখা পেলো লোকগুলো। এক মিনিট, দেরি না করে গুলি করলো বারোজন লোক জানোয়ারটাকে। একটা গরিলা মারতে একজন গুলি করলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু চোখের সামনে যাকে দেখবে, যা কিছু দেখবে ওরা তাই-ই ধ্বংস করে দেবে—সেই প্ল্যান নিয়েই ঢুকেছে ওরা। আরো একটা গরিলাকে মেরে হ্রদের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। দূরে দেখা গেল আর একটি দল দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে হ্রদের দিকে। ওদের দলে মোট ন'জন। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। মুখে নিষ্ঠুর ক্রোধ।

ভয়ঙ্কর একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে।

বৈজ্ঞানিকের উদ্যানের চতুর্দিকে পাহাড়। সেই পাহাড় খুঁড়ে গর্ত করে ফেলেছে শত্রুরা অনেকদিনের চেষ্টায়। আজ তারা লুঠ করবে Dr. Kotze-এর সবকিছু! এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হতে চলেছে ওদের। চারদিক থেকেই চারদল লোক এসে জুটলো হ্রদটার সামনে। Dr. Kotze যে মাটির নিচে আছেন তা ওরা জানে। ওরা ঠিক করলো প্রথমেই চারদল চারদিক দিয়ে এগোতে এগোতে মাটির নিচে নামার পথটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। তারপর সকলে একসঙ্গে নেমে একযোগে ধ্বংস লীলা শুরু করবে। বন্দী করে ফেলবে Dr. Kotze-কে অনায়াসে।

বেলা এগারোটার সময় সফল হলো ওরা। পেয়ে গেল মাটির নিচে নামার রাস্তাটা। বিরাট একটা পাথর দিয়ে সিঁড়ির মুখটা ঢাকা। ভিতর থেকেই পাথরটা ওঠানো-নামানোর ব্যবস্থা আছে। ওরা ওসব কিছু ভাবলো না। একটার পর একটা হাতবোমা মেরে ধসিয়ে দিলো পাথরটা কিছুক্ষণের মধ্যে।

বোমা মেরে পাথরটা উড়িয়ে দেবার শব্দ ঠিকই পৌঁছুলো Dr. Kotze-এর হলঘরে। কিন্তু ওরা তখনও এই পৃথিবী থেকে এক কোটি মাইল দূরে বাস করছিল যেন। কানে ঢুকলো না শব্দটার রেশ। মাথা নুইয়ে একটা যন্ত্রের স্ক্রু টাইট করছিল কুয়াশা। আর Dr. Kotze কুয়াশার লেখা পড়ছিলেন খাতার পাতাগুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরে।

মিনিটখানেক পর হৈ চৈ উঠলো হলঘর থেকে খানিকটা দূরে। অযথা গুলি ছুঁড়ছে শয়তানগুলো যত্রতত্র। গুলির শব্দও হচ্ছে। নিজেদের সর্বনাশ দেখার

জন্যেই যেন অপেক্ষা করছে ওরা। কোনো শব্দই কানে ঢুকছে না ওদের।

প্রচণ্ড শব্দ হলো বোমা ফাটার। শয়তানগুলো কোনো বাধা না পেয়ে গুদামগুলোর ক্ষতি করতে থাকলো বোমা মেরে।

চমকে উঠলেন Dr. Kotze. কিন্তু আর তেমন কোনো জোরালো শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না। মনে মনে ভাবলেন কানের ভুল হয়েছে, তেমন কোনো শব্দ শোনেননি তিনি। আবার কাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। কুয়াশা আপন মনে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। হলঘরের এদিক-ওদিক গিয়ে কয়েকটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কি কি সব পরীক্ষা করলো। তারপর আবার ফিরে এসে বসলো চেয়ারে।

কিন্তু আবার বোমা ফাটার শব্দ ঢুকলো Dr. Kotze-এর কানে। কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করলেন Dr. Kotze. স্মরণ করতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর কি যেন একটা কথা। কা'রা যেন আসবে বলে মনে হলো তাঁর। কা'দের যেন আসার কথা ছিলো তাঁর আস্তানায়। তারা এসে তাঁকে মেরে ফেলবে বা ধরে নিয়ে যাবে—কিন্তু কা'রা ... কা'রা... কা'রা...

কুয়াশার দিকে তাকালেন Dr. Kotze. কুয়াশার খেয়াল নেই কোনদিকে। আবার উঠে গিয়ে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছে সে গভীর মনোযোগ সহকারে।

আবার একটা বোমা ফাটলো। তৃতীয় গুদামঘরটাকেও নষ্ট করছে শয়তান-গুলো। হঠাৎ মনে পড়ে গেল Dr. Kotze-এর সব কথা। চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। বুঝতে বাকি রইলো না তাঁর আর কিছু। এসে পড়েছে শত্রু। এতদিন যাদের জন্যে এতো সতর্ক হয়েছিলেন তা'রা ঢুকে পড়েছে তাঁর গোপন আস্তানায়। অথচ কিছুই জানতে পারেননি তিনি।

'কুয়াশা! এসে পড়েছে ওরা!'

Dr. Kotze-এর ভীত কণ্ঠস্বর কুয়াশার কানে ঢুকলো কি ঢুকলো না বোঝা গেল না। চেয়ারে ফিরে এসে বসলো সে আবার।

'হয়ে এসেছে কাজ—আর একমিনিট!' মাথা না তুলে কুয়াশা অনেক দূর থেকে বলে উঠলো যেন কথাটা।

'কিন্তু ধরা পড়ে যাবো আমরা! কুয়াশা, পালাতে হবে আমাদেরকে!'

উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন Dr. Kotze. কোনো উত্তর পাওয়া গেল না এবার কুয়াশার তরফ থেকে।

তিরিশ সেকেণ্ড পর হাতের কলমটা বন্ধ করে কুয়াশা মাথা তুললো। মাথার চুলে হাতের আঙুল চালিয়ে ক্লান্ত গলায় বললো সে, 'শেষ হয়েছে আমার কাজ. Dr. Kotze, আমি সফল হয়েছি।'

তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গভরে বলে উঠলো পিছন থেকে, 'হ্যাঁ, শেষ হয়েছে তোমার দিন। বিফল হয়েছো তুমি!'

কিছুই বুঝতে পারলো না কুয়াশা। ঘাড় বাঁকিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই

হতবাক হয়ে গেল সে। এক দল লোক ঠিক তার পিছনে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। Dr. Kotze-এর পিছনেও রয়েছে সমসংখ্যক রাইফেলধারী লোক।

পলকের মধ্যে সব টের পেলো কুয়াশা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ়তা কাটলো না তার। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো সে লোকগুলোর মুখের দিকে। কি যেন চিৎকার করে বলে উঠলো ওদের মধ্যে একজন Dr. Kotze-এর উদ্দেশ্যে। সবটা শুনতে পেলো না কুয়াশা। হলঘরের বাইরে ঘনঘন বোমা ফাটার শব্দ উঠলো হঠাৎ। গর্জে উঠলো পরপর কয়েকটা রাইফেল।

'বেঁধে ফেলো বুড়োটাকে তোমরা,' আদেশ দিলো একজন দলের লোকদের।

'ঐ ব্যাটাকেও বাঁধো,' কুয়াশার দিকে ইঙ্গিত করে আবার হুকুমজারি করলো লোকটা। দু'জন করে চারজন লোক এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

'গুলি খেয়ে মরতে চাও নিশ্চয় তুমি?'

লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলো কুয়াশাকে। কুয়াশা তাকালো Dr. Kotze-এর দিকে। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে তাঁকে। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি কুয়াশার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিলো কুয়াশা। দুর্বল হয়ে পড়েছে সে হঠাৎ এই অকল্পিত বিপদ দেখে। বেঁধে ফেলা হয়েছে তাকেও। কিছুই করার নেই তার। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই কোনো। এতো পরিশ্রম করেও Dr. Kotze-কে রক্ষা করতে পারলো না সে। রাতদিন ধরে অক্লান্ত কাজ করে যে সূত্র ক'টি আবিষ্কার করেছে সে, সেগুলো এখন অর্থহীন মনে হলো তার। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো সবার আগে। করা হয়নি বলে এখন সব শেষ হয়ে গেল।

লোকটা আবার বললো, 'গুলি খেয়ে মরতে চাও তুমি, আমি জানি—ওটা খুব সহজ মৃত্যু। কিন্তু সহজ মৃত্যু তোমার কপালে নেই। যন্ত্রণা দেয়া হবে তোমাকে।'

পকেট থেকে সুচের একটা বাক্স বের করে কুয়াশার দিকে এগিয়ে এলো শয়তানটা। আর একজন এগিয়ে গেল Dr. Kotze-এর দিকে।

'হ্যাঁ, বুড়োটাও মজা বুঝুক একটু। তারপর যা কিছু দরকারী জিনিসপত্র সব আদায় করতে সুবিধে হবে।'

কুয়াশার ডান পায়ের শেষ আঙুলের নখের ভিতর সুচ ঢুকিয়ে লোকটি দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করলো নরম গলায়, 'খুব বেশি লাগছে নাকি হে?' জোর করে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো কুয়াশা। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখ। Dr. Kotze-এর চোখ দু'টো এখনো খোলা রয়েছে। শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। এই ভয়ঙ্কর শাস্তিতে তাঁর শরীরে যেন কোনো যন্ত্রণাবোধই হচ্ছে না। শুধু চোখের কোণ বেয়ে দু'টো জলের ধারা গড়িয়ে

পড়ছে গাল বেয়ে দাড়ির ভিতর। শান্তভাবেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছেন তিনি।

'টোমরা উঠে আসো ওদের কাছ ঠেকে!'

হঠাৎ একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ফেটে পড়লো গমগম করে হলঘরের ভিতর। রাইফেলধারী প্রত্যেকটি শয়তান হতবাক হয়ে তাকালো শব্দ শুনে। কুয়াশাও চোখ মেললো অতি কষ্টে। লৌহমানব!

লৌহমানব এসে দাঁড়িয়েছে হলঘরের মাঝখানে! হাতে তার লেসারগান। কুয়াশা ভাবলো শহীদরা তাহলে সময়মতই এসে পড়েছে।

বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে যা দেরি। তারপরই গর্জে উঠলো পনেরোটা রাইফেল একসঙ্গে লৌহমানবের বুক লক্ষ্য করে।

উচ্চগ্রামের গমগমে হাসিতে ফেটে পড়লো লৌহমানবের কণ্ঠস্বর। তারপর আচমকা একটা কথা বললো সে। কথাটা শুনে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো কুয়াশার চোখ জোড়া। থমকে গেল রাইফেলধারী লোকগুলো। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো ওরা হতভম্ব হয়ে।

লৌহমানব বললো, 'আজেবাজে কাজ বাড ডাও! টোমাদের মড্যে যে কোনো একজন রাইফেল টাক করে বণ্ডীদের যে কোনো একজনকে গুলি করো। বুক লক্ষ্য করে গুলি করবে। যাটে এক গুলিটেই শেষ হয়ে যায়।'

নিরাশায় মলিন হয়ে গেল কুয়াশার মুখ। তার তৈরি করা যান্ত্রিক মানুষের হাতেই তার মৃত্যু লেখা ছিলো শেষ পর্যন্ত! এটা কিভাবে সম্ভব হলো? তবে কি শহীদ ব্যর্থ হয়েছে? পরাজিত হয়েছে সে শত্রুদের হাতে এখানে পৌঁছে? তার মানে লৌহমানবকে পরিচালিত করছে শহীদ নয়, শত্রুদের কোনো লোক? ঠিক তাই, না হলে লৌহমানবের কণ্ঠ থেকে ঐ মৃত্যুদণ্ডাদেশ উচ্চারিত হতো না।

যে লোকটা কুয়াশার পায়ের আঙুলে সুচ ঢোকাচ্ছিল সেই তুলে নিলো তার নিজের রাইফেলটা। একটু পিছিয়ে গিয়ে কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুললো সে। অমনি একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো। লৌহমানবের হাতের লেসারগানটার মুখ উঠলো লোকটার পেট লক্ষ্য করে। এক ঝলক তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল সকলের। চোখ ভালো করে মেলে সকলে দেখলো লোকটির বুক থেকে কোমর পর্যন্ত নেই। মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে লোকটা। খানিকটা নিম্নাংশ এবং খানিকটা ঊর্ধ্বাংশ পড়ে আছে শুধু মাটিতে।

'এবার টুমি Dr. Kotze-কে লক্ষ্য করে রাইফেল টোলো!'

গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার লৌহমানবের। Dr. Kotze-এর আঙুলে যে লোকটা সুচ ঢোকাচ্ছিল তার উদ্দেশ্যে কথাটা বললো সে। ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো লোকটা। দেখতে দেখতে চোখ দু'টো বন্ধ করে অজ্ঞান হয়ে গেল সে। কিন্তু জ্ঞানহীন শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই লেসারগানের নল দিয়ে মারণরশ্মি বের হলো এক ঝলক। মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল

অচেতন লোকটার। ধড়টা পড়লো হলঘরের মেঝেতে ধপ্ করে।

'রাইফেল ফেলে দাও সকলে।'

শহীদের কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল হলঘরের দরজায়। রিভলভার হাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে দাঁড়িয়েছে সে হলঘরের ভিতরে। কুয়াশা এতক্ষণে খেয়াল করলো হলঘরের বাইরে আর কোনো গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

'প্রাণে মারবো না তোমাদেরকে।'

সন্ত্রকটা শয়তানকে তাদের রাইফেল মাটিতে ফেলে দিয়ে মাথার উপর হাত তুলতে বললো শহীদ, 'বন্দী করা হলো তোমাদেরকে। ঐ দু'জন লোককে মরতে হলো ওদের নিষ্ঠুরতার জন্যে। তোমরাও ওদের চেয়ে কম পাপী নও। কিন্তু আমি নিজের চোখে তোমাদেরকে কোনো নিষ্ঠুরতা করতে দেখিনি বলে মৃত্যুদণ্ড দিলাম না।'

'আর সবাই কোথায়, শহীদ!' শহীদকে একা দেখে প্রশ্ন করলো কুয়াশা।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে Dr. Kotze-এর বাঁধন খুলে দিলো শহীদ। তারপর কুয়াশার বাঁধন খুলে দিতে দিতে ধরা গলায় সে বললো, 'মহুয়া মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, কুয়াশা। '

'কি বললে! আহত হয়েছে মহুয়া! কোথায়, কোথায় রেখে এলে তাকে? কোথায় আঘাত লেগেছে? বাঁচবে তো?'

দাঁতে দাঁত চেপে কোনো রকমে বললো শহীদ, 'গুলি লেগেছে তার ডান পাশের পেটে। অপারেশন করা সম্ভব না হলে কি হয় বলা যায় না।'

'কোথায় আছে সে?'

'কামাল আর গফুরের কাছে রেখে এসেছি তাকে উঠানের একপাশে।'

বাঁধনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। এমন সময় দ্বিতীয় লৌহমানবটি প্রবেশ করলো হলঘরে। 'চলো দেখি কি অবস্থা।'

চিন্তিত কণ্ঠে কথাটা বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো কুয়াশা। Dr. Kotze ওদের দু'জনের কথা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। তিনিও কুয়াশার পাশাপাশি বের হয়ে গেলেন হলঘর থেকে।

শহীদও দু'টো লৌহমানবকে বন্দী লোকগুলোর ভার দিয়ে বের হয়ে এলো হলঘর থেকে।

জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে না মহুয়া। রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখনও। কাঁদো কাঁদো মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে গফুর। কামাল মহুয়ার মাথা কোলে নিয়ে চোখের জল মুছছে। এমন সময় কুয়াশা, Dr. Kotze এবং শহীদ এলো।

Dr. Kotze মহুয়ার পাশে বসে পড়ে একটা হাত তুলে নিয়ে পাল্স দেখলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। একমিনিট পরই চিন্তিত মুখে তাকালেন তিনি কুয়াশার

দিকে। 'কেস খুব একটা সিরিয়াস নয়। তবে অপারেশন করতে হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। তা না হলে···।'

'কিন্তু এই অপারেশন তো আমাদের কারো দ্বারা সম্ভব হবে না,' শহীদের নিরাশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কি করবো তাহলে, কি করা যায়···' কুয়াশা উত্তেজিত হয়ে উঠলো কোনো উপায় বের করতে না পেরে।

হঠাৎ Dr. Kotze বললেন, 'চমৎকার একটা উপায় করতে পারি আমি। আমার সমস্যা বলতে এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সূত্রগুলো তৈরি করে দিয়েছো তুমি, বন্ধু। এ উপকার সারাজীবন স্মরণ থাকবে আমার। এখন আমি তোমাদের জন্যে সামান্য একটা উপকার করার সুযোগ পেলে ধন্য হবো। আমার মহাশূন্যে রওনা হবার সব যোগাড়-যন্ত্র অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে আছে। চলো তোমাদেরকে যাবার পথে পাকিস্তানের যে কোনো জায়গায় নামিয়ে দিই। মাত্র এক মিনিট সময় লাগবে পৌছুতে। একমাত্র এই উপায়েই তোমাদের রোগীকে কোনো নার্সিং হোমে পৌছানো সম্ভব।'

'ধন্যবাদ, Dr. Kotze! ধন্যবাদ! আপনার মহানুভবতার কথা কোনো দিন ভুলতে পারবো না আমরা,' কণ্ঠে আবেগ ঢেলে কথাটা বললো শহীদ।

'তাহলে দেরি করার দরকার নেই। চলুন আপনারা।' Dr. Kotze কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন কুয়াশাকে, 'অনেক আলাপ করার ছিলো তোমার সঙ্গে। কিন্তু এবার আর হলো না। আমি মহাশূন্যে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করবো ঠিক করেছি অনেকদিন আগেই। এই পৃথিবীর মানুষের নীচতাকে ঘৃণা করি আমি। আমি মানুষকে ভালবাসতে পারবো না সামগ্রিক ভাবে। মানুষের চেয়ে উন্নত প্রাণীর সন্ধান করে কাটিয়ে দেবো আমি আমার জীবন। যদি তাদের সন্ধান পাই তবে তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাতে চেষ্টা করবো। আমার মনে হয় মানুষের কাছ থেকে মানুষের কিছুই শিখবার নেই। উন্নত কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলে যদি এরা সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়—তা না হলে আর কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।'

কুয়াশা বললো, 'আমরা আপনার সাফল্য কামনা করি। আপনার মতো জ্ঞানী পুরুষের পক্ষেই এতবড় পরিকল্পনা করা সম্ভব। আপনাকে আমি বুঝতে পারছি।'

মহুয়ার অচেতন দেহ নিয়ে শহীদ এবং গফুরের সঙ্গে সবাই হলঘরে প্রবেশ করলো। বন্দীরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও তেমনি। Dr. Kotze গুপ্ত দরজাটা খুলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন সকলকে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই রকেট নিক্ষেপক মঞ্চের উপর এসে পৌছুলো ওরা। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে Dr. Kotze বললেন, 'ওঠো আগে তোমরা, আমি সবশেষে উঠবো।'

কুয়াশা বললো, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, Dr. Kotze. আমি এদের সঙ্গে দেশে ফিরছি না এখন। কয়েকটা কাজ আছে আমার অন্যত্র। আমি পরে ফিরবো দেশে। আপনি এদেরকে পৌঁছে দিলে যথেষ্ট হবে।'

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে বেশি কিছু কথা বললেন না Dr. Kotze.

মি. সিম্পসন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে, আমিও বরং চলে যাই শহীদের সঙ্গে।'

'নিশ্চয়,' কুয়াশা বললো।

'গফুর এবং কামাল?' মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন গফুর আর কামালের দিকে তাকিয়ে।

'ওরা আমার সঙ্গেই থাক,' কুয়াশা বললো।

শহীদ মহুয়াকে নিয়ে লিফটে করে উঠে গেছে বিরাটাকৃতি রকেটের ভিতর। মি. সিম্পসনও উঠে গেলেন। Dr. Kotze কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলি, বন্ধু! আবার দেখা হতে পারে আমাদের। বারো বছর পর আমি একবার পৃথিবীতে ফিরে আসবো।'

হেসে ফেললো কুয়াশা। হাসতে হাসতে বললো, 'আপনি বারো বছর মহাশূন্যে কাটিয়ে যখন আমাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন আমি থাকবো না, আপনার চিরশত্রু ড.হারাফেলো থাকবে না, এই পৃথিবীতে এখন যারা বেঁচে আছে তাদের একটি প্রাণীও সেদিন বেঁচে থাকবে না।'

'কেন?' শিউরে উঠে প্রশ্ন করলেন Dr. Kotze.

'মহাশূন্যে বারো বছর মানে পৃথিবীতে প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ বছর। আপনি মহাশূন্যে বারো বছর কাটিয়ে ফিরে আসবেন যখন আমাদের এই পৃথিবীতে তখন কেটে গেছে প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ বছর।'

'বুঝেছি!' Dr. Kotze অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বলে সিঁড়ি বেয়ে রকেটের উপর দিকে উঠতে লাগলেন। সিঁড়ির মাথায় উঠে কুয়াশার দিকে আবার তাকিয়ে বললেন তিনি, 'চলি, বন্ধু! আমাদের তাহলে আর কোনো দিন দেখা হবে না।'

কুয়াশা বললো, 'দেখা হবে না সে কথাও জোর করে বলা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে আমিই একদিন আপনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবো।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো সেখানে।'

কথাটা বলে রকেটের ভিতর অদৃশ্য হলেন Dr.Kotze.

ভলিউম-৫

কুয়াশা

১৩. ১৪. ১৫

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এবই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০